সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭৬

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৫৬—১৮৯৭

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

জন্ম : শৈশব-শিক্ষা : বিবাহ

১৮৫৬ সনের ১৫ই মার্চ (১২৬২, ৩রা চৈত্র) খিদিরপুরে ঈশানচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ। ঈশানচন্দ্র শৈশবে পরিবারবর্গের অতিরিক্ত আদরের পাত্র ছিলেন ; বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাঁহাকে তেমন মনোযোগী হইতে দেখা যায় নাই। তিনি সংস্কৃত কলেজসংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও হিন্দু স্কুলে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

ঈশানচন্দ্রের বিবাহ হয় উত্তরপাড়ার জমিদার-পরিবারে। তাঁহার পত্নী কুসুমকুমারী ছিলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা।

সরকারী চাকুরী

কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়সেই ঈশানচন্দ্র সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বোর্ড-অব-রেভিনিউয়ের আপিসে সামান্য বেতনে একটি অস্থায়ী পদ লাভ করেন। ১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসেও তিনি যে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন, একখানি পত্রে* তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৮২ সনের মে মাসে তাঁহার ভাগ্যে হুগলী জজ-কোর্টের সেরেস্তাদারের পদ জুটিয়া যায়।* তিনি দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৫-৯৬ সনে তিনি অগ্রজের চেষ্টায় কলিকাতা হাইকোর্টের ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টে একটি চাকুরী সংগ্রহ করিয়া চুঁচুড়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ : "ঈশানচন্দ্র," 'বঙ্গশ্রী,' আষাঢ় ও ভাদ্র ১৩৪৩ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যানুরাগ

শৈশব হইতেই কবিতা-রচনায় ঈশানচ... অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন —"কবিতা-রচনায় গ্রন্থকারের আশৈশব আমোদ; বাল্যাবস্থা হইতেই বনের ফুল, জলের ঢেউ, আকাশের দামিনী ইত্যাদি বস্তু দেখিয়া গ্রন্থকারের হৃদয় নাচিয়া উঠিত এবং অবসর পাইলেই সেই হৃদয়-উচ্ছ্বাসগুলি, শুধু তাহাই কেন— স্নেহ, আশা, নৈরাশ্য, ক্ষোভ ও ভয় প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলি, কবিতায় প্রকটিত করিয়া নিজেই আমোদ অনুভব করিত" ('চিত্ত-মুকুর')। ঈশানচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলি প্রধানতঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত 'বান্ধবে' স্থান পাইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন তাঁহার রচনার কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে তাহার নজীর মিলিবে :—

> প্রিয় ঈশানবাবু! যদি অপাত্রে অনুগ্রহ করিয়া পরিক্লান্ত হন, তবে আমায় আর স্মরণ করিবেন না; আর যদি এই অহেতুকী শ্রদ্ধাই আপনার প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি হয়, তবে আশা করিতে পারি চিরদিনই এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।...আপনার লেখায় কেমন একটু তান আছে, তাহা আমি বড় ভালবাসি। আপনি একবার কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন পূর্ব্বক বান্ধবে একটি দীর্ঘ কবিতা দিবেন। ঐরূপ কবিতা না হইলে আপনার সমুচিত বিকাশ হইবে না।...(২০ জুলাই ১৮৭৬)
>
> আপনি শিবজীর বিষয় আপাততঃ লিখিবেন না।...পৃথুরাজের স্বস্থপতি বীরচূড়ামণি সমরশায়ীকে অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ একটি কবিতা লিখুন; দুই তিন বারে প্রকাশ করিব।...সমরশায়ীর প্রেম, সমরশায়ীর স্বদেশ-বাৎসল্য, উগ্রতেজঃ, রণনৈপুণ্য ইত্যাদি কথা

ঐতিহাসিকের লেখনীতেই কবিতার কমনীয় কান্তি লাভ করিয়াছে ; কবির তুলিকায় উহা কিরূপ চিত্রিত হইবে তা স্মরণ করিতেই আমার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠে।

গদ্য-রচনাতেও ঈশানচন্দ্রের তুল্য পারদর্শিতা ছিল। ১ম-২য় বর্ষের 'নবজীবনে' (চৈত্র ১২৯১ ; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৯২) প্রকাশিত "ভারত-ভ্রমণ" ও ১৩০০ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'পূর্ণিমা'য় মুদ্রিত "সাহেবি বাঙ্গালি" প্রবন্ধ দুইটি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাবলী : ঈশানচন্দ্রের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **চিত্ত-মুকুর** (কাব্য)। ১২৮৫ সাল, ইং ১৮৭৮। পৃ. ১৪৭।

১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত।

২। **বাসন্তী** (গীতিকাব্য)। ১২৮৭ সাল (৩০ জুলাই ১৮৮০)। পৃ. ১৩২।

৩। **যোগেশ কাব্য**। ১২৮৭ সাল (২৫ মার্চ ১৮৮১)। পৃ. ১৪২।

"যোগেশ কাল্পনিক উপন্যাস নহে ; যোগেশ অধিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার আজীবন সুহৃদ্—আমার সংসারের সান্ত্বনা—আমার অন্তরের অন্তর—আমার কাব্যে সহায় ছিলেন।...যোগেশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিলাম,...। পদ্মপুকুর, খিদিরপুর। ২৫এ ফাল্গুন ১২৮৭ সাল।"

সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত (৩০ চৈত্র ১২৮৭) "বাঙ্গালা সাহিত্য" প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই কাব্যোপন্যাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—"বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...সম্প্রতি যোগেশ নামক অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালির কৃতজ্ঞতা লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মন্দা ও নর্ম্মদা স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ।"

৪। **বাঙ্গালী চীফ জাষ্টিস** (কবিতা)। (২৬ জুলাই ১৮৮২)। পৃ. ৮।

৫। **চিন্তা** (গীতিকাব্য)। ১২৯৪ সাল (১৬ মে ১৮৮৭)। পৃ. ১৭২।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : ঈশানচন্দ্রের দুইখানি কাব্য এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এগুলি—

(১) 'অনন্ত' (খণ্ডকাব্য)—৯ সর্গে সমাপ্ত। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ইহা 'বঙ্গশ্রী'তে (মাঘ-চৈত্র ১৩৪২) মুদ্রিত করিয়াছেন। "তাঁহার শোচনীয় অকালবিয়োগের পরে···কবির অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় উহা স্বরচিত ভূমিকা-সহ সম্পাদিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই'।···কবিবর নবীনচন্দ্রও স্থানে স্থানে শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র নবম সর্গের শেষ অংশটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার সংকল্প অনুসারে নবীনচন্দ্র উহা সমাপ্ত করেন।"

(২) 'দেবীতীর্থ'—১০ সর্গে সম্পূর্ণ। ইহা এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। (বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ : "কবি ঈশান-চন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা," 'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১৩১৮ দ্রষ্টব্য)।

'পূর্ণিমা' : ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে ঈশানচন্দ্রের "উৎসাহে ও উদ্যোগে" হুগলী সাবিত্রী যন্ত্র হইতে 'পূর্ণিমা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার "সূচনা"য় ঈশানচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

সকলেরি জীবনে এমন অবসর অনেক থাকে যাহা অতিবাহিত করিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। বালকে খেলা করে, প্রৌঢ়ে শাস্ত্র আলোচনা করেন, বৃদ্ধে হরিনাম করেন, কিন্তু

যুবার কি করিবেন ভাবিতে হয়। উপন্যাস বা নভেল পাঠ যুবকের পক্ষে সুখকর বটে ; সাধারণে তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ইংরেজী ভাষায়। দেশীয় ভাষায় সুখপাঠ্য উপন্যাস অতি অল্প, নভেল নাই বলিলেই হয়। ইংরাজীতে এরূপ পুস্তক বিস্তর আছে— এত আছে যে, সমস্ত জীবন পাঠ করিলেও নভেল বা উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত হয় না। ইংরাজের নভেল বা উপন্যাস পাঠে ইংরাজের সমাজিক গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের স্বজাতির এ সকল কথাও ত অবশ্য জ্ঞাতব্য ; তাহার আলোচনার উপায় কি ? পুরাণে অতি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও অতি সুন্দর আদর্শ চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকের চক্ষে সে সকল অত্যদ্ভুত, অলৌকিক "আজগুবি" ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাহার শিক্ষার উপযোগী শ্রদ্ধা হয় না, সুতরাং সে সকল পাঠে স্পৃহাও হয় না। যদি বা কখন স্পৃহা হয়, তবে শ্রদ্ধার অভাবে তাহার যথোচিত মর্ম্মগ্রহ হয় না। এরূপ প্রকৃতির পাঠকেরা অগত্যা হয় অবসর অপব্যয় করেন, নয় ইরেজী নভেল বা উপন্যাস পাঠ করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। স্বদেশের জ্ঞাতব্য কথা তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। যাঁহাদের গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কেহ কেহ ইংরাজী ভাষায় সাময়িক পত্রিকাদি বা বিজ্ঞান দর্শন পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতেও সময়ের সদ্ব্যয় হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ কঠিন অধ্যয়নে কয় জনের অনুরাগ দেখা যায় ? পাঠাবস্থায় যুবকদিগের স্বাধীন চিন্তা বা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার অবসর থাকে না। কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য

যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহাতে সখ করিয়া বা জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য গুরুতর অধ্যয়নে তাঁহারা মনোনিবেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ কলেজের সংকীর্ণ শিক্ষাবশতঃ দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ দূরে থাকুক, Nineteenth century, Fortnightly বা Saturday Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত গুরুতর বিষয়গুলি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি কুলাইয়া উঠে না। আমরা অবশ্য সকল শিক্ষিত যুবকের কথা বলিতেছি না। সাধারণের কথাই বলিতেছি। যাঁহাদের প্রতিভা আছে, তাঁহারা অল্প বয়সেই বিস্তর গুরুতর কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রতিভা কিন্তু অতি বিরল। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি প্রতিভাসম্পন্ন কোন যুবক থাকেন, তাঁহাদের উপরোক্ত কথায় অভিমান করিবার কারণ নাই। আমরা সাধারণের একজন— সাধারণের কথাই বলিতেছি। বস্তুত শিক্ষিত সাধারণ যুবকবর্গের জন্যই দেশীয় ভাষায় মাসিক পত্রিকার প্রচার হওয়া আবশ্যক। পত্রিকার উদ্দেশ্য যে কেবল শিক্ষাপ্রদান, তাহা নহে। লেখক মাত্রেই কিছু অমন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন নহেন যে, তিনি পাঠক মাত্রেরই গুরুস্থানীয় হইবার উপযুক্ত পাত্র। লেখক তাঁহার নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিবেন, পাঠক তাহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকে গ্রহণ করিবেন, ভুল ভ্রান্তি থাকে তাহার আলোচনা করিবেন। অধিকন্তু যদি পাঠক সহৃদয় হয়েন, তবে লেখকের সে ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিবেন। ফলতঃ আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য তাহাই। আমরা সকল বিষয়েরই অনুশীলন করিব, সে অনুশীলনে লেখকের আত্মোন্নতি ত আছেই, পক্ষান্তরে যদি অন্যের সেরূপ অনুশীলন বৃত্তি

তাহার দ্বারায় কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচালিত হয় তাহাতেও ব্যক্তিগত ও সমাজগত মঙ্গল আছে। আমরা জানি এবং যাঁহারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান পরিপুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারাও জানেন যে প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে আধুনিক নব্য ভারত ও সাহিত্য পর্য্যন্ত পত্রিকার প্রচারে কত শত ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের জাতীয় বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও বঙ্গভাষার প্রতি মতি গতি ফিরিয়াছে—বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠে স্পৃহা হইতেছে—বঙ্গভাষায় রচনা করিতে সাধ হইতেছে—সর্ব্বাধিক সুখের কথা—বঙ্গভাষাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে অভ্যাস হইতেছে। পত্রিকার সৌভাগ্য যত হউক না হউক, বঙ্গভাষার প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইতেছে। সুতরাং স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল বই আর কি বলিব। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে পূর্বগামী পত্রিকার সম্পাদকেরা কিছু আর লোকের হাতে ধরিয়া তাঁহাদের মতি গতি পরিবর্ত্তন করেন নাই বা তাঁহাদের হাত ধরিয়া তাঁদের লেখক করিয়া দেন নাই। সম্পাদকেরা আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও যত্নে যতদূর সম্ভব ভাষার উন্নতি পক্ষে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, দশটা ভাল কথা—দশটা উচ্চ ভাব বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহা দেখিয়া শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি বঙ্গভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকে বুঝিল যে চেষ্টা করিলে নির্জ্জীব অসার বঙ্গভাষায়ও, মহৎ চিন্তা বা মধুর ভাব প্রকাশ করা যায়। মাতৃভাষা সহজেই বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাষা। ইংরাজী ভাষায় যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, পরভাষা অপেক্ষা আপন ভাষায় হৃদয়ের ভাবগুলি প্রকাশ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সুখবোধ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষার স্ফূর্ত্তির অভাবেই লোক ইংরাজিতে মনোভাব প্রকাশ

করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং এরূপ ঘটনায় বঙ্গ ভাষায় তাঁহাদের অনুরাগ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? দিন দিন মহৎ ভাবগুলি দেশীয় ভাষায় সজ্জিত হইয়া পরিচিত মূর্ত্তিতে পাঠকের চক্ষে পতিত হওয়ায়, ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও পৌরাণিক কথা শিক্ষিত যুবকেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় জটিল ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবহেলা না করিয়া সেইগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে লাগিলেন। বিষয়গুলি ইংরাজী ধরনে পরিলক্ষিত পরিচালিত ও পরিব্যক্ত হওয়ায় দেশীয় মূর্ত্তি হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেও, ইংরাজী শিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহাদের মূল অবয়ব নিতান্ত অপরিচিত থাকিল না। তখন পাঠক স্বদেশের স্বজাতির মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে উৎসুক হইলেন। এইরূপে ভাষার বর্ত্তমান উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। ইহাতে কতদূর শুভ ফল ফলিয়াছে তাহা পরলোকগত মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা রচনার সঙ্গে আধুনিক রচনার একবার তুলনা করিয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। অপর দেশের ভাষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না, গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকা প্রচারে যেরূপ শুভ ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও লিপিশক্তি সকলি অপ্রচুর। আমরা কার্য্যে ব্রতী হইলাম তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কতক অবসর ক্ষেপণ করা, কতক বা স্বাধীন চিন্তার চালনা করা এবং গৌণ উদ্দেশ্য যাঁহারা আভাঙা কালেজি গোরা তাঁহাদের মাতৃভাষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা। আমরা উন্মুক্ত হৃদয়ে বলিতেছি যে এরূপ কালেজি গোরাদের নিকটেই আমাদের আশা

ভরসা বিস্তর। তাঁহাদের যে বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অধ্যবসায় আছে, তাহার পরিচয় তাঁহারা সেনেট গৃহে দ্বারস্বার দিয়াছেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদিগকেই চিহ্নিত বা (covenanted) শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের গুরুতর রাজকার্য্যের ভার যেরূপ চিহ্নিত (covenanted) কর্ম্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে—আমাদের ভাষার গুরুতর কার্য্য সেইরূপ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকবর্গের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমাদের আশা ভরসা। এক্ষণে তাঁহাদিগকে এ কার্য্যক্ষেত্রে সৌখিন সৈন্যরূপে (volunteer) পরিণত করিতে পারিলেই আমাদের আশা ফলবতী হয়। আমরা তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব চেষ্টা ও যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা তাঁহারা যেন আমাদিগকে "দেশীয়" বলিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ না করেন।

পূর্ণিমায় সকল বিষয়েরই আলোচনা হইবে। যে কোন বিষয়ের রচনা উপাদেয় হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে। তবে সাধারণের অশুভকর ও অরুচিজনক বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হইবে না। রচনাদি নির্ব্বাচনের জন্য ইহার সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেই সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। খ্যাত-নামা লেখকদের রচনা সমিতি কর্ত্তৃক পরম সাদরে গৃহীত হইবে। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণিমায় প্রকাশ করিবার জন্য রচনাদি প্রেরণ করিলে সমিতির অভিলাষ ও উদ্যম সকলি সফল হইবে।

'পূর্ণিমা'র প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই ঈশানচন্দ্রের লিখিত "পূর্ণিমা" নামে একটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পূর্ণিমা

১

(আমি) পারি না বহিতে, এ রূপের ভার,
(আমার) আকুল হইল দেহ।
(আমি) খুঁজিয়া বেড়াই, প্রণয়ী আমার,
দেখা যে দিল না কেহ!
(আমার) বুকের ভিতরে, সুখের পাথারে,
ছুটিছে প্রেমের বান।
(দেখ) দু কূল ভাসায়ে, উঠিছে উথলি,
আমার আকুল প্রাণ।
(আমি) বলি বলি করি, বলা যে গেল না,
সাধের মরম কথা!
(আমি) পারি না ভাসিতে, এ রূপরাশিতে,
লইয়া সুখের ব্যথা।
(আমি) ভেসে ভেসে যাই, কূল নাহি পাই,
তবু যে হ'ল না দেখা!
(আমি) এমন করিয়া, অকূলে পড়িয়া,
ভাসিতে পারি না একা।

২

(ওহে) কে আছ ভুবনে, প্রণয়ী তেমন,
কর হে হৃদয় দান!
(আমার) রূপের সাগর, মথিত করিয়া,
কর হে পীযূষ পান।

(আমি) নয়ন ভরিয়া, যৌবন ঢালিব,
ঢালিব রূপের বান।
(আমি) শ্রবণ ভরিয়া, ঢালিব সঙ্গীত,
হৃদয় ভরিয়া প্রাণ।
(আমি) জগত ঘুরিয়া, হৃদয় ভরিয়া,
রেখেছি প্রকৃতি শোভা।
নিতি নব নব, সুষমা দেখাব,
প্রেমিক-মানস-লোভা।
নিশির নির্জ্জনে, বিশ্ব কার সনে,
কহে কি নিগূঢ় কথা।
(আমি) পেয়েছি সন্ধান, হৃদয়ে করিয়া,
লইয়া যাইব তথা।

৩

(আমি) আপনার তরে, আপনা সঁপিব,
চাহি না হে প্রতিদান।
(আমি) তোমাতে মজিয়া, তোমারে ভজিয়া,
জুড়া'ব আমার প্রাণ।
(তুমি) বলিবে কেবলি, সুখের কামনা,
সরা'য়ে মনের বাধ।
(আমি) নয়নে বদনে, হৃদয়ে পড়িয়া,
মিটা'ব মনের সাধ।
(যদি) নাহি মিটে ক্ষুধা, বলিবে সে কথা,
ক্ষোভ না রাখিবে বুকে।

(আমি) গলিয়া গলিয়া, যাইব মিশিয়া,
তোমার সাধের সুখে।
এ রূপ যৌবন, এই দেহ মন,
প্রণয় পূরিত প্রাণ।
এস প্রাণবঁধু, হৃদয়ে ধরিয়া,
কর হে বারেক ত্রাণ।

৪

দিবসের কাযে, সাজে নানা সাজে,
বিচিত্র মানব মতি।
(আমি) চিনিতে পারিনে, হৃদয় তাহার,
দিবসে কুটিল গতি।
নিরজন বুকে, প্রাণ একা থাকে,
সরূপ দেখিতে পাই।
তাই নিশি হ'লে, আসি ধীরে
প্রণয়ী খুঁজিয়া যাই।
মনের মতন, মেলে না যে জ
ভাঙা চোরা সবি প্রাণ।
এ রূপ যৌবন, এত আকিঞ্চন,
তাহে কি কুলায় স্থান!
(আমি) আধ আধ সাধ, পারি না মিটাতে,
খুঁজিয়া বেড়াই ভরা।
ওহে পরিপূর্ণ, লুকা'য়ে কোথায়,
আইস নিকটে ত্বরা।

'পূর্ণিমা'য় ঈশানচন্দ্রের অনেকগুলি পদ্য-গদ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কয়েকটি গদ্য রচনার উল্লেখ করিতেছি :—

১।	সম্বন্ধ নির্ণয়	...	১৩০০ সাল
২।	কুরুক্ষেত্র (সমালোচনা)	...	১৩০০-০১ সাল
৩।	শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী	...	১৩০০ সাল
৪।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১৩০১ সাল
৫।	বোম্বাই ভ্রমণ	...	১৩০২ সাল
৬।	মানব-জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি ?		১৩০৪ সাল

ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত "সুধাময়ী" নামে একটি উপন্যাসও ১৩০১, ১৩০২ ও ১৩০৪ সালে আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা 'পূর্ণিমা'য় মুদ্রিত হয়।

মৃত্যু

ঈশানচন্দ্র ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে 'পূর্ণিমা' এই শোক-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

> কবিবর হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি ঈশানচন্দ্র ইহজগতে আর নাই। সেই ভীষণ ভূমিকম্পের রাত্রিতে ঈশান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, শুক্রবার, ঈশান ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার বেয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঈশানের অকালমৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত। তাঁহারই উৎসাহে এবং উদ্যোগে আমাদের পূর্ণিমা প্রকাশিত হয়, তিনি সেই অবধি পূর্ণিমার প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার

আকস্মিক বিয়োগে অবসন্ন। তাঁহার প্রতিকৃতি এই সংখ্যার পূর্ণিমায় দেওয়া হইল।—'পূর্ণিমা,' আষাঢ় ১৩০৪, পৃ. ১২৪

ঈশানচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা কাব্য-জগতে যখন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব, ঈশানচন্দ্র তখনই সাহিত্যিক-সমাজে কবিখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে খ্যাতি এক দিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের চাপে স্থায়ী হইবার অবকাশ পায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা-সাহিত্যের দরবারে তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ পেশ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি হইতেই তাঁহার প্রতিভা ও কবি-কীর্ত্তি সম্বন্ধে পুনর্বিচার করা সম্ভব। ঈশানচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর কবি ছিলেন না। যে কারণে তিনি মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে নিজ হাতে নিজের জীবনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের মূলে সেই কারণই ছিল; অধিকাংশ কবিতাই, বিশেষ করিয়া 'যোগেশ কাব্য'খানি একটা অন্তর্গূঢ় জ্বালায় জর্জ্জরিত। সক্ষম রচনা বলিয়াই সেগুলি পাঠকের মনেও জ্বালা ধরাইয়া দেয়। সেই বেদনা ও জ্বালা পরিমাণে অধিক বলিয়াই ঈশানচন্দ্রের কবি-প্রতিভা চরম সার্থকতা লাভ করে নাই; যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত 'বাংলার কবি ও কাব্য' গ্রন্থমালায় ঈশানচন্দ্রের কবিতার একটি সঙ্কলন বাহির হইয়াছে, তাহা হইতেই অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। আমরা এখানে দুই একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন দিতেছি।

অকস্মাৎ সে তারাটী ডুবিল কোথায়

১

জীবন সিন্ধুর তীরে বসি নিরন্তর
হেরিতাম যে তারাটি অনন্য-মানসে,
অকস্মাৎ কোথা গেল আঁধারি অম্বর!
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ চাহিয়া আকাশে।
নহে কি সে নভঃ ইহা—সে নিশি কি নয়?
কিম্বা ইহা নহে সেই জীবনের তীর?
সে আকাশে সে তারাটি সতত উদয়,
সে তীরে কিরণময় সতত যে নীর!
এ যে শূন্য নভস্তল, যামিনী আঁধার!
এ তীরে যে সিন্ধু-নীর ভীষণ আকার!

২

না না—সেই নভঃ ইহা, ওই চিহ্ন তার—
বজ্র ভাঙ্গা ঝুলিতেছে নীরদের গায়;
সেই নিশি বটে ইহা—তেমতি আঁধার,
তীরো সেই,—ভগ্ন কূল এই যে হেথায়।
এই যে সে ছিন্ন লতা জীর্ণ তরুমূলে
শুষ্ক পল্লবের রাশি এই যে এখানে,
ভগ্ন তরীখানি সেই ওই মগ্ন কূলে,
সে ভাঙ্গা পিঞ্জরখানি পাড় এইখানে,
সেই নভঃ সেই নিশি, সিন্ধুতীরো সেই।
কেন রে সে জ্যোতির্ম্ময় তারকাটি নেই!

৩

নির্ম্মম সংসারে একা নিভৃত প্রান্তরে
জীবন-সিন্ধুর তীরে ছিলাম বসিয়া,
মগ্ন ছিল চতুর্দ্দিক্ নিবিড় আঁধারে,
ছিল সেই এক তারা নিশি উজলিয়া,
তখন জীবন-নীর ছিল না অধীর,
শান্ত সাগরের মত আছিল নিথর,
আজি অকস্মাৎ কেন এ বাত্যা গভীর
কাঁদিয়া উঠিছে কেন প্রাণের ভিতর ?
ও কি চিত্র ? সর্ব্বনাশ—এ কি ভয়ঙ্কর !
সে সুখ-তারাটি ঐ গ্রাসিল পামর !

৪

চাহি না দেখিতে আর লুকাও ত্বরায়
হা বিধাতঃ ! কি দেখালে নিবিড় আঁধারে ?
প্রকৃত এ চিত্র যদি, কেন অভাগায়—
দেখাইলে, ছিল ভাল নিহিত অন্তরে
ছিল ভাল সে নিবিড় আঁধার অম্বর
ক্ষীণালোকে থাকিতাম পড়ি তরুতলে
জড়াইয়া ছিন্ন লতা বক্ষের উপর ;
হেরিতাম আজীবন আকাশের তলে।
কি দেখিনু—কি হইল প্রাণের ভিতর,
ফাটে না অথচ যেন ফাটিছে অন্তর !

৫

জীবন আত্মার স্বপ্ন, প্রপঞ্চ বিধির
অনিত্য, অসার শুধু ভ্রান্ত লীলাময়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গতি যাহার অস্থির
আবর্ত্তে আবর্ত্তে যার বিষম প্রলয় ;
কেমনে বলিব তাহা সুখের জীবন,
কেমনে বলিব নহে ভ্রান্তমতি নর !
কোন্ তর্কে বুঝাইব হৃদয় আপন,
কি যুক্তিতে এ বিশ্বাস করিব অন্তর ?
নিত্য, সার, সত্য, যার মুহূর্ত্তও নয়
সে জীবনে নর-ভাগ্যে কিবা ফলোদয় ?

৬

"বৃথা জন্ম এ সংসারে" বলে না যে জন,
বিপুল প্রয়াস তাঁর বাসনা গভীর,
কীর্ত্তি যশ লালসায় আকুলিত মন,
চঞ্চল জগতে তাঁর আত্মাও অধীর।
সুখী সেই—কিন্তু যার আঁধার জীবন,
কিরণের রেখামাত্র নাহি যে জীবনে,
প্রতি পদে নিরাশায় দগ্ধ যার মন
"মানব জনম সার" সে বলে কেমনে !
"উদ্দেশ্য সাধন কর" সুখীর বচন,
দুখীর আজন্ম শুধু করিতে রোদন।

৭

উদ্দেশ্য—তাও কি এত সুখদ জীবনে ?
কি উদ্দেশ্য ?   নরচিত্তে কি [illegible] গভীর ?
কীর্ত্তি ?—গৌরব নিজ,—সে কীর্ত্তি ঘোষণে
কেন ক্ষুদ্রমতি নর সতত অধীর ?
ধর্ম্ম মোক্ষ কল্পনার সমষ্টি কেবল।
কিবা ধর্ম্ম কোথা স্বর্গ কিবা দেহান্তর,
অনিশ্চিতে কিসে এত বিশ্বাস প্রবল !
অসম্ভব সত্যে কিসে এতই নির্ভর !
কি বিচিত্র মানবের কুহক আশার !
ধন্য মানবের মোহ—ধন্য ভ্রান্তি তার !

৮

ভ্রান্তি !—এ ভ্রান্তিতে জীব আচ্ছন্ন কে[illegible] ।
কেন এ ভ্রান্তিতে চিত্ত হইল ম[illegible]
বিষাদের চিত্র কেন এত সমুজ্জ্বল,
যন্ত্রণার রেখা কেন গভীর এমন।
ডুবিল—ডুবুক তারা, কেন কাঁদে মন ?
শোক-দুখ-ক্ষীণ-বৃত্তি কেন এ হৃদয়ে ?
পুত্তলিকা রঙ্গভূমে জনম যখন
নিয়মিত অত্যাচার লঙ্ঘনীয় নহে,
আত্মায় শরীরে যদি ক্ষণিক মিলন
পার্থিব বিষাদে আত্মা কেন উচাটন !

৯

এই ত যন্ত্রণা—চিত্ত সহজে দুর্ব্বল।
মানস বুঝিলে তবু বুঝে না হৃদয়,
শোকপ্রবণতা চিত্তে কেমনি প্রবল
বিষাদে প্রবৃত্তিগুলি সব(ই) চিত্তময়।
যে দিকে ফিরাও মন চিত্ত সেইখানে।
শিক্ষার কঠিন জ্ঞান সেখানে নিষ্ফল,
জাগ্রতে স্বপনে সেই ব্যথা বাজে প্রাণে।
প্রকাশিত পরিবর্ত্তে হয় না শীতল।
কালের মন্থর গতি করি নিরীক্ষণ
দগ্ধচিত্তে বহ্নিশিখা কররহ গোপন।

১০

অনিত্য জীবনে কেন গভীর প্রণয়?
কেন এত স্নেহ মায়া নশ্বর জীবনে
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যদি এতই প্রলয়
প্রণয়ের স্মৃতি কেন গভীর স্মরণে?
স্মৃতি—কেন রহে চিত্তে এত দীর্ঘকাল!
ঘটনার সঙ্গে ধ্বংস কেন নাহি হয়!
সুখের ভাবনা হৃদে জাগে ক্ষণকাল,
দুখের ভাবনা কিন্তু ভুলিবার নয়,
যে অনলে দগ্ধ হয় পাষাণ হৃদয়
সে অনলে স্মৃতি কেন ভস্ম নাহি হয়! ('চিত্ত-মুকুর')

সন্তান দর্শনে

১

এই জীবনের ওই প্রথম বিকাশ !
ওই কান্না ওই হাসি, ওই আনন্দের রাশি,
অমিয়া মাখান ওই আধ আধ ভাষ,
এ জীবনে একদিন হইত প্রকাশ !
শৈশবে সবাই হায়, ওই সন্তানের প্রায়
এ ভীষণ জীবনের সুন্দর মঞ্জরি !
ভাসে রে কালের তটে আপনা পাসরি !

২

ওই কি জীবন ? হায় কতই বিভেদ !
ভাবিলে কাঁদে রে মন, মানবের কি জীবন,
কোথা ফুটে—কোথা টুটে—কতই প্রভেদ !
কি যে হয় ওই মুখ, কি যে হয় ওই বুক,
কোথা থাকে ওই সুখ যৌবন বিকাশে !
কি লয়ে সংসারে পশি কি থাকে বয়সে !

... ...

৭

বৃথা ক্ষোভ ! এ সংসারে এমনি জীবন !
প্রকৃত সুখের যাহা, স্বপ্ন কিম্বা মোহ তাহা,
সংসারীর সে কামনা দুখের কারণ।
নিকৃষ্ট অবোধ জন, কিম্বা শ্রেষ্ঠ কবি মন
সে কল্পিত সুখ সুধু করে অন্বেষণ !
নহে এ সংসার কিন্তু তাদের কারণ।

৮

সুখশূন্য মরুপ্রায় তবে কি সংসার ?
জীবন কি কিছু নয়, সুধু কি যন্ত্রণাময়,
এত ক্লেশ এত শ্রম সব কি মিছার ?
এই দেহপিণ্ড লয়ে, এ অনন্ত দুখ সয়ে,
পার্থিব জীবন কি রে বিড়ম্বনা সার ?
নরভাগ্যে জীবনে কি নাহি পুরস্কার ? ('বাসন্তী')

এক দিন

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণ তলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
ধূলায় প'ড়েছে ঢলি
পাষাণে ললাট পড়ি
স্বেদ ঝরে ঘন॥
কাতর বদনখানি
মুদিত নয়ন দুটি
গেছে কিছু খুলে'॥

দুই প্রান্তে অশ্রু-জল
ধারা দিয়ে পড়িতেছে
দেবী-পদমূলে ॥
দেবীর প্রতিমাখানি
বিরাজিত সিংহাসনে
পাষাণ-মূরতি।
এক করে সুধাভাণ্ড,
আর করে বরাভয়,
ওষ্ঠে ঝরে প্রীতি ॥
সুগোল উন্নত গ্রীবা,
ঈষদ্ বঙ্কিমে নত
তাহে দু'নয়ন।
পল্লবে আবৃত আধ,
আধ বিকশিত মৃদু
স্নেহে অচেতন ॥
সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে।
পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিশিয়া, শুষ্ক
সরসীর নীরে ॥
অনাবৃত নেত্র-পথে
পশিয়া সে ভাতি, মম
প্রাণের অন্তরে।

স্বপনের চন্দ্র মত
উজলিয়া অন্তঃস্থল,
স্বপন বিতরে ॥
অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ?
একে তার ক্ষীণ দেহ,
তাহে ঘোর তপস্যায়
সদা নিমগন!
কি জানি কি হ'ল ভাবি,
মন্দিরের দ্বার ঠেলি,
হেরিনু গোপনে।
দেখিনু নিদ্রিত প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে ॥
অস্থির হইনু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।
'প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ' বলি
বিষম-কাতর-স্বরে
করিনু চীৎকার ॥
শিহরি উঠিয়া বসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।

শিহরি উঠিলা দেবী,
পাষাণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল ॥ ('চিন্তা')

স্তোত্র

দেবি !
আবৃত শরীরে তুমি চক্ষুর কণিকা জালে
বিরাজ আমার।
স্পর্শশক্তিরূপে তুমি এই শরীরের ত্বকে
সতত প্রচার ॥
শব্দশক্তিরূপে তুমি শ্রবণের মূলে মম
কর অবস্থান।
জ্ঞানরূপে চিত্তে মম ঢালিয়া অমৃতধারা
তুমি বিদ্যমান ॥
দর্পণ বিহীনে যথা আপন আকৃতি কিবা,
নহে অনুমান।
তোমা বিনা সেইরূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড মম
নহে বিদ্যমান ॥
তুমি মম—আমি তব, যেই তুমি, সেই আমি,
নহি ভিন্নাকার।
তব অপার্থিব রূপে আমারো তদ্গত প্রাণে
করি নমস্কার ॥ ('চিন্তা')

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৭

নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর

১৮৫৩—১৯১৪

নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

জন্ম

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারি* নবীনচন্দ্র দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত আলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাগন দাস। নবীনচন্দ্র তিব্বত-প্রত্যাগত শরচ্চন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ছাত্র-জীবন

নবীনচন্দ্রের ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি চট্টগ্রাম হাই-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া, উচ্চশিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ক্যালেণ্ডার হইতে নবীনচন্দ্র কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

১।	এন্ট্রান্স পরীক্ষা	...	চট্টগ্রাম-হাই-স্কুল	...	১ম বিভাগ	ইং ১৮৬৯
২।	ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা	...	প্রেসিডেন্সী কলেজ	...	১ম বিভাগ (.৪র্থ)	১৮৭১
৩।	বি-এ পরীক্ষা	...	ঐ	...	১ম বিভাগ	১৮৭৪
৪।	এম-এ পরীক্ষা (আর্টসে অনার)		ঐ	...		১৮৭৫
৫।	বি-এল (১ম বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান)		ঐ	...		১৮৭৭

চাকুরী-জীবন

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর নবীনচন্দ্র ২ অক্টোবর ১৮৭৭ তারিখে চট্টগ্রাম কলেজের আইনাধ্যাপকের (Law Lecturer) পদ

---

* শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস তদীয় পিতৃব্য নবীনচন্দ্রের জন্মতারিখ আমাকে জানাইয়াছেন ; উহা—বঙ্গাব্দ ১২৫৯। শকাব্দ ১৭৭৪।১০।১৭।৩২ দণ্ড, ফাল্গুন মাস, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষ, ষষ্ঠী।

প্রাপ্ত হন। এই পদে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১[illegible] এপ্রিল পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর, তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই এপ্রিল রংপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ৩১ বৎসর যোগ্যতার সহিত সরকারী কর্ম্ম করিয়া নবীনচন্দ্র ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিবার প্রয়োজন নাই, কৌতূহলী পাঠক উহা *History of Services of Gazetted and other Officers Serving under the Government of Eastern Bengal & Assam* Corrected to 1st July 1909 গ্রন্থে* দেখিতে পাইবেন।

সাহিত্য-সেবা

গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকিলেও নবীনচন্দ্র অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতেন। তিনি কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন ; সংস্কৃত-সাহিত্যের রত্নরাজি পদ্যে বঙ্গানুব[illegible] করিয়া বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া[illegible]ছেন। এই গুণের জন্য নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর পণ্ডিতবর্গ ১৭ এপ্রিল ১৯০৬ তারিখে তাঁহাকে "কবি-গুণাকর" উপাধি, এবং চট্টল ধর্ম্মমণ্ডলী ২৭ মে ১৯১০ তারিখে "বিদ্যাপতি" উপাধি প্রদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি "কাব্য-রত্নকর" উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন।

---

* ইহাতে নবীনচন্দ্রের জন্মতারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ দেওয়া আছে। সালটি ভুল ; উহা ১৮৫৪ না হইয়া ১৮৫৩ হইবে।

গ্রন্থাবলী

নবীনচন্দ্র বাংলায় যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

১। **আকাশ-কুসুম কাব্য**। ১২৯০ সাল (৮ জুন, ১৮৮৩)। পৃ. ৫২।

'আকাশ-কুসুম কাব্য' মৌলিক রচনা; ইহার কিয়দংশ প্রথমে ১২৭৯ সালের 'হালিশহর পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। "কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া" ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আকাশ-কুসুম কাব্য' পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের "গ্রন্থসূচনা"য় কবি লিখিতেছেন :—

তৃতীয় স্তবকে "কুমুদশশীর" পত্রের ৪র্থ কবিতা পাঠে এ ক্ষুদ্র কাব্যের প্রস্তাবিত বিষয় অনুভূত হইবে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রেমের উদ্যানে, প্রিয়, আশার ছলনে
আশৈশব যে কুসুমে করিলে যতন,
নিদারুণ বিধি হায়, কহিব কেমনে,
বজ্রাঘাতে হৃদি তব করি বিদারণ,
আমূল সে ফুলবৃন্ত করিয়া ছেদন,
অপর-অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে করিল ক্ষেপণ।"

২। **রঘুবংশ**। (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)।

১ম ভাগ, ১-৮ম সর্গ। ইং ১৮৯১। পৃ. ১০১ + ১ শুদ্ধিপত্র।
২য় ভাগ, ৯-১৫শ সর্গ। ইং ১৮৯৭। পৃ. ১৫৭।
৩য় ভাগ, ১৬-১৯শ সর্গ। ইং ১৮৯৫। পৃ. ৫৮।

ইহার নির্ব্বাচিত অংশ এবং কখন ৮-১৫ সর্গ, কখন বা ১৩-১৫ সর্গ বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকরূপে স্বতন্ত্রভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৯৬

খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ড 'রঘুবংশ' একত্র প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে **'রঘুবংশ—সরল সঙ্কলন'** (পৃ. ৭৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। **শোক-গীতি**। জুন ১৯০০। পৃ. ২৮।

সূচী :—পরলোক-গতা **মা'র ছবি** দর্শনে (মহাকবি Cowper কুপার-কৃত "On the Receipt of my Mother's Picture" অবলম্বনে); গ্রাম্য-দেবালয়-সন্নিহিত **শ্মশান** দর্শনে (প্রসিদ্ধ কবি গ্রে Grey প্রণীত Elegy অবলম্বনে); পিতৃবিয়োগ ; কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরলোক-প্রাপ্তি শুনিয়া ; মোহিনীর মৃত্যু শ্রবণে (মহাকবি বায়রণ-কৃত Elegy on Thyrza অবলম্বনে)।

৪। **শিশুপাল বধ**। (বাংলা পদ্যে অনুবাদ)।

প্রথম ভাগ, ১-২ সর্গ। ইং ১৯০৩। পৃ. ৩৭।

দ্বিতীয় ভাগ, ৩-৫ সর্গ। ইং ১৯১৫। পৃ. ৯৩।

টীকা ও "মহাকবি মাঘের জীবনী" সম্বলিত।

৫। **কিরাতার্জ্জুন**। (পদ্যানুবাদ)।

প্রথম ভাগ, ১-৫ সর্গ। ইং ১৯০৬। পৃ. ৯২।

দ্বিতীয় ভাগ, ৬-১০ সর্গ। ইং ১৯১৪। পৃ. ৮২+২৮ ১১শ সর্গ।

টীকা ও "মহাকবি ভারবির জীবনী" সম্বলিত।

৬। **চারুচর্য্যা-শতক**। চৈত্র ১৩১৯ (ইং ১৯১৩)। পৃ. ৪৮।

ব্যাস-দাস ক্ষেমেন্দ্র-কৃত চারুচর্য্যা-শতকের পদ্যানুবাদ, মূল ও টীকা সম্বলিত।

"ক্ষেমেন্দ্র-কৃত 'চারুচর্য্যা' নামক এই গ্রন্থ মাত্র ১০০ শ্লোকে পূর্ণ। এই গ্রন্থটি এত সারবান্ যে ইহার গুরুত্ব আকার অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক। ক্ষেমেন্দ্র এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে মহাভারত রামায়ণের প্রায় সমস্ত

সারগর্ভ উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এক একটী শ্লোকে এক একটী করিয়া উপদেশ এবং তাহার পৌরাণিক উদাহরণ সন্নিবিষ্ট করায় এই গ্রন্থ একপ্রকার সনাতন ধর্ম্মোপদেশের সার-সংগ্রহরূপই হইয়াছে। এতাদৃশ সারগর্ভ ও স্বল্পাকার গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যেও অতি বিরল।"—শরচ্চন্দ্র দাস।

নবীনচন্দ্র ইংরেজিতেও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, সেগুলি :—

Miracles of Buddha. 1895.

Ancient Geography of Asia. 1896.

A Note on the Antiquity of the Ramayana. 1899 pp.14

সাময়িক-পত্র : 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' সম্পাদন

"কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে…পঠদ্দশায় উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া 'বিভাকর' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কাগজখানি প্রায় এক বৎসরকাল চলিয়াছিল।" 'জন্মভূমি', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৪।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (মাঘ ১৩১৯) মাস হইতে নবীনচন্দ্রের সম্পাদনায় 'প্রভাত' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত শেষ-পর্য্যন্ত ইহার সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'প্রভাত' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখার মুখপত্র-স্বরূপ ছিল। নবীনচন্দ্র ১৩১৮ সালে শাখা-পরিষদের জন্মাবধি উহার সভাপতি ছিলেন। 'প্রভাত' দুই বৎসর চলিয়াছিল ; ইহাতে নবীনচন্দ্রের অনেক রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।

মৃত্যু

২১ ডিসেম্বর ১৯১৪ (৬ পৌষ ১৩২১) তারিখে, ৬২ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র দাস ও বাংলা-সাহিত্য

সংস্কৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া বঙ্গবীণাপাণিকে যাঁহারা সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কবি নবীনচন্দ্র দাস তাঁহাদের এক জন। তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত পাঠযোগ্য মৌলিক কবিতা ও কাব্য অনেক রচনা করিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্য-সংগ্রহেই মিলিবে। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া রঘুবংশ, শিশুপাল বধ, কিরাতার্জ্জুন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যগুলিকে ভাষান্তরিত করিয়া বাঙালী পাঠকের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ইংরেজী কাব্যসাহিত্য হইতেও তিনি অনেক রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছেন। অতুলনীয় নিষ্ঠার সহিত তিনি মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহার উপরি-উক্ত কাব্য তিনখানি বাংলা-সাহিত্যে সম্পদ্‌রূপে চিরদিন গণ্য হইবে। রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার পুস্তকগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইল, ইহা হইতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় মিলিবে।—

রঘুবংশ

পুষ্পরথে বিষ্ণুরূপী রাম রঘুবর
উঠিলা আকাশ পথে মনোরথ-গতি ;

অধোদেশে নিরখিয়া অতল সাগর
হিলা বিরলে প্রভু জানকীর প্রতি।

"হের, প্রিয়ে, সেতু মম মলয় শিখরী
স্পর্শি দূরে, বিভাগিল ফেনিল সাগর
শাভে যথা ছায়াপথ দ্বিখণ্ডিত করি
তারকামণ্ডিত চারু শারদ অম্বর।

"কপিল যজ্ঞের অশ্ব লইল পাতালে—
এ ভাবিয়া সগরের অসংখ্য কুমার
অশ্ব অন্বেষণে ধরা খনে পুরাকালে,
হ'ল তাহে সাগরের অসীম বিস্তার।

"সূর্য্যরশ্মি গর্ভবতী এ সিন্ধুর জলে,
পোষেন রতনজাল এই রত্নাকর,
ধরেন হৃদয় মাঝে বাড়ব অনলে ;
প্রসূত ইহাঁর জলে চারু শশধর।

"শান্ত ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অসীম সাগর
বিরাজিছে মহিমায় ব্যাপি দিগন্তর,
সত্ত্বরজঃতম গুণে কেশব যেমতি,
নিরূপে স্বরূপ তাঁর কাহার শকতি ?

"নাশি বিশ্ব যোগ-নিদ্রাবশে হৃষীকেশ
যুগান্তে এ সিন্ধুজলে করেন শয়ন,

নাভিপদ্মে পদ্মযোনি করি উপবেশ
করেন তাঁহার স্তুতি সৃষ্টির কারণ।

"গিরিকুল-পক্ষ ইন্দ্র কাটিলা যখন
কত গিরি এ সাগরে লইল আশ্রয়,
যথা শত্রু-উপদ্রুত নৃপতিনিচয়
রাজচক্রবর্ত্তি-পদে লভে হে শরণ।

"রসাতল হ'তে বিষ্ণু সৃজন প্রয়াসে
উদ্ধরিলা নববধূ-ধরারে যখন,
এ স্বচ্ছ সাগরজল প্রলয়-উচ্ছ্বাসে
হ'য়েছিল ক্ষণ তাঁর মুখাবগুণ্ঠন।

"অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলেন সাগর—
শতমুখে নদীকুল চুম্বিছে তাঁহারে,
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ-অধর
চতুর সরিত-পতি তোষেন সবারে।

"ভীমকায় তিসি মৎস্য জলযন্ত্রাকারে
নদীমুখে মেলি মুখ করিছে গ্রহণ
মৎস্য সহ জলরাশি, মুদিয়া বদন
শির-রন্ধ্রে উর্দ্ধে জল ফেলিছে ফুৎকারে!

"উঠিছে কুমীরকুল যেন মত্ত করী
দ্বিভাগিয়া ফেনরাশি, সলিল উপরি;

ক্ষণতরে শ্বেত ফেনা লাগিয়া কপোলে
ধবল চামর প্রায় কর্ণ-মূলে দোলে।

"তরঙ্গের রেখা প্রায় ভুজঙ্গনিকর
বিচরিছে তীরদেশে বায়ুপানআশে,
সর্প বলি চেনা যায় মণির প্রকাশে
ঝলে যবে রবি-কর ফণার উপর।

"তব রক্তাধরনিভ প্রবাল উপরে
পড়িছে তরঙ্গাঘাতে শ্বেত শঙ্খকুল,
প্রবাল-কণ্টক মুখে ফুটিয়া আকুল;
ক্লেশে মুক্ত হ'য়ে শঙ্খ পলাইছে ধীরে।

"নভ হ'তে গিরি সম ওই মেঘবর
লম্বমান সিন্ধুবক্ষে জল পান তরে,
ঘুরিছে আবর্ত্তবেগে; ধরিয়া মন্দরে
পুন যেন দেবাসুরে মথিছে সাগরে!

"শোভিছে লবণসিন্ধু শ্যামকলেবর
লৌহচক্র প্রায়, দেখ, ব্যাপি দিগন্তর;
সুদূর গগনপ্রান্তে সূক্ষ্ম নীলিমায়
শোভে তীর-বনরাজি পরিধির প্রায়।

"তব বিম্বাধর-সুধা-পিপাসু এ মন
রঞ্জন-বিলম্ব, প্রিয়ে, সহিবে কেমনে?

বুঝি যেন তট-বায়ু বহিয়া সঘন
মাখিছে কেতকীরেণু ও চারু বদনে।

"মুহূর্ত্তে বিমানবেগে আমরা সকলে
উতরিনু সিন্ধু-তীরে ; দেখ, বরাননে,
ফলভরে অবনত পূগ তরুদলে ;
শুক্তিমুক্ত মুক্তাফল শোভিছে পুলিনে।

"দেখ লো পশ্চাতে এবে, কুরঙ্গনয়নে,
যেন দূরে মহার্ণব করিছে গমন ;
সিন্ধু হ'তে দূরে এবে শিরউত্তোলনে
বনরাজি সহ ভূমি দিল দরশন।

"চলিছে পুষ্পক মম মনোরথ প্রায় ;
কভু বা ত্রিদিবপথে করিছে গমন,
কভু বিজলীর বেগে মেঘ মাঝে ধায়
খগ-পথে কভু রথ করে বিচরণ।

"বিহরিছে ঐরাবত মন্দাকিনী-জলে
মধ্যাহ্নে, সে মদগন্ধ বহিয়া যতনে
ঊর্ম্মি-স্পর্শ-শীত বায়ু, ইন্দুনিভাননে,
শুকাইছে স্বেদবিন্দু ও মুখ-কমলে।

"যবে তুমি কুতূহলে রথ-বাতায়নে
প্রসারিছ কর, দেবি, পরশিতে ঘনে,

বারিদ আনিয়া নিজ বিজলী-বলয়
পরাইছে করে যেন, ক্ষণ তেজোময়।

"ওই দেখ চীর-বাস তাপসনিকরে
রাক্ষসরহিত এবে জানি জনস্থান
চিরত্যক্ত আশ্রমেতে নিঃশঙ্ক অন্তরে
ফিরি এবে পর্ণগৃহ করিছে নির্ম্মাণ।

"তব অন্বেষণে, প্রিয়ে, ভ্রমি বহুদূর
দেখিনু নূপুর এক আসি এই স্থলে;
ও পদ-কমলচ্যুত হ'য়ে সে নূপুর
বিষাদে নীরবে যেন আছিল ভূতলে।

"যে পথে, হে ভীরু, তোমা হরিল রাবণ
কৃপারসে গলি ওই তরুলতাগুলি
নীরবে সে পথ মোরে কৈল প্রদর্শন,
নত করি শাখা-ভুজে পল্লব-অঙ্গুলি।

"না জানিনু কোথা তুমি করিলে গমন,
কুশাঙ্কুর ত্যজি তাই মৃগবধূগণে
দাঁড়ায়ে করিল দৃষ্টি দক্ষিণে ক্ষেপণ,
ঊর্দ্ধরেখ-পক্ষ-রাজি-শোভিত নয়নে।

"ওই মাল্যবান্ গিরি পরশি গগন
তুলিয়াছে উচ্চ শির শোভার আধার,

যথা মেঘে নব বারি হ'ল বরষণ—
তা সব বর্ষিনু অশ্রু বিরহে তোমার।

"পল্বলের চারু ঘ্রাণ নবাম্বুবর্ষণে,
অর্দ্ধ বিস্ফারিত কিম্বা কদম্বের ফুল,
ময়ূরের কেকারব, তোমার বিহনে
অসহ্য হইল, মোরে করিল আকুল।

"মেঘের গর্জ্জনে গুহা হয়ে ধ্বনিময়
জাগাইত পূর্ব্বস্মৃতি ব্যথিয়া হৃদয়,
বারিদ-নিনাদে পূর্ব্বে যবে, সুবদনি,
কাঁপি ভয়ে অঙ্কে মম পড়িতে আপনি।

"বারিসিক্ত ভূমি হ'তে উঠিত নীহার
আরক্ত কন্দলীফুল আবরি সঘন,—
মনে হ'ত, যেন চারু নয়ন তোমার
বিবাহের হোম-ধূমে আরক্তবরণ।

"দূর হ'তে হেরি ওই পম্পা সরোবর
পথশ্রমে যেন নেত্র পিপাসু আমার,
মঞ্জুল বঞ্জুলপুঞ্জে পূর্ণ চারি ধার,
ঈষৎ নড়িছে মাঝে সারসনিকর।

"তোমার বিয়োগে, প্রিয়ে, মুনিমনোহর
পম্পাফুলে নিরখিনু সতৃষ্ণ নয়নে

বিহরিছে চক্রবাক চক্রবাকী সনে,
এ উহার মুখে দিয়ে কমলকেশর।

"পম্পাতটে ওই ক্ষুদ্র অশোকলতায়
কুসুমস্তবক-স্তন-নমিত শরীর,
আলিঙ্গিতে গিয়াছিনু ভাবিয়া তোমায়,
কাঁদি নিবারিল মোরে লক্ষ্মণ সুধীর।

"কনককিঙ্কিনী-রব শুনি এ বিমানে
যূথ-কলরব-ভ্রমে সারসনিকরে
উড়ি গোদাবরী হ'তে আসিছে এখানে,
আগ বাড়াইয়া যেন লইতে তোমারে।

"ওই পঞ্চবটী, হোর বহুদিনে যারে
পুলকে হৃদয়, যথা বাল সহকারে
পোষিলে কোমল কক্ষে ঢালি জলধার;
ঊর্দ্ধমুখে চাহে সেই পোষা কৃষ্ণসার।

"হেথা গোদাবরী-তীরে বেতসকুটীরে
মৃগয়ান্তে কোলে তব কভু বা নির্জ্জনে
রাখি শির শুইতাম; তরঙ্গ-সমীরে
জুড়াইত শ্রম মম, পড়িতেছে মনে।

"ভ্রূভঙ্গে যাঁহার কোপে নহুষ নৃপতি
হারাইলা ইন্দ্রপদ, অন্তে বরিষার

সুপ্রসন্ন হয় জল উদয়ে যাঁহার,
এই সেই অগস্ত্যের পার্থিব বসতি।

"মহাযশা অগস্ত্যের অগ্নিত্রয় হ'তে
হোমের সুরভি ধূম উঠে ব্যোমপথে,
মনের মালিন্যরাশি আঘ্রাণে তাহার
হ'ল দূর ; ঘুচিল এ হৃদয়ের ভার।

"পঞ্চাপ্সর নামে দূরে ওই সরোবর,
শাতকর্ণি মুনি যথা করেন বিহার,
নিবিড় নিকুঞ্জে তাহা শোভে মনোহর—
যেমতি শশাঙ্করেখা মেঘের মাঝার।

"এই মুনি মৃগ সহ কুশতৃণাহারে
করিলা কঠোর তপ বনে পুরাকালে,
তপস্যায় ভীত ইন্দ্র বাঁধিলা তাঁহারে
পঞ্চ অপ্সরার রম্য যৌবনের জালে।

"জলমধ্যস্থিত ওই মুনির ভবনে
মৃদঙ্গের রবে মিশি সঙ্গীতলহরী
থেকে থেকে উথলিয়া উঠিছে গগনে,
পুষ্পকের চূড়াগৃহে প্রতিধ্বনি করি।

"সুতীক্ষ্ণ নামেতে ওই শান্ত মুনিবর
চারি পাশে কাষ্ঠচয়ে জালি হুতাশন

করেন তপস্যা, তাঁর ললাটে ভাস্কর
ঢালিছেন অগ্নিসম প্রখর কিরণ।

"এ হেন কঠোর তপে ভীত পুরন্দর;
কুটিল কটাক্ষপাতে বিলাসস্মিহাসে
কটির ঈষত মুক্ত মেখলাপ্রকাশে
নারিল ভাঙ্গিতে তপ অপ্সরানিকর।

"উর্দ্ধবাহু এই ঋষি আশিসি আমারে
তুলিলা দক্ষিণ কর অক্ষমালা সনে,
মৃগদেহ কণ্ডূয়ন করেন যে করে,
সতত কুশল যাহা কুশাগ্র-ছেদনে।

"ঈষত সঞ্চালি শির প্রণাম আমার
গ্রহিছেন মৌনব্রত এই মুনিবর;
রথ-অন্তরালমুক্ত হইল ভাস্কর,
সূর্য্যোপরি দৃষ্টি মুনি স্থাপিলা আবার।

"অতিথির হিত ওই পুণ্যতপোবনে
আহিতাগ্নি শরভঙ্গ তাপস সুমতি
যজ্ঞকাষ্ঠে বহুকাল সেবি হুতাশনে,
মন্ত্রপূত নিজ দেহ দিলেন আহুতি।

"সুপুত্ররূপেতে তাঁর ওই তরুগণ
আতিথিসেবার ভাব বহিছে এখন,

ছায়াদানে পথশ্রম করিতেছে দূর
দিতেছে ক্ষুধিত জনে ফল সুমধুর।

"ওই চিত্রকূটগিরি পড়িছে নয়নে,—
শৃঙ্গে মেঘ, গুহামুখে নির্ঝরঝঙ্কার,
শৃঙ্গে পুলিনের পঙ্ক তুলি, বরাঙ্গনে,
উন্মত্ত বৃষভ যেন ছাড়িছে হুঙ্কার!

"চিত্রকূট-উপকণ্ঠে প্রসন্নসলিলা
শুভ্রধারা ওই নদী নামে মন্দাকিনী,
ক্ষীণ রেখা প্রায় দূরে শোভে প্রবাহিণী,
বনভূমি-কণ্ঠে যেন মুকুতার মালা।

"প্রফুল্ল তমাল ওই দেখ গিরি-তলে,
সুরভি পল্লবে যার গড়ি অলঙ্কার
পরাইনু কর্ণে, দোলাইয়া কুতূহলে
যবাঙ্কুর সম শুভ্র কপোলে তোমার।

"মহর্ষি অত্রির এই পুণ্যতপোবন
জীবন্ত প্রভাবে যাঁর হেথা জন্তুগণ
নিবাসে, বিনীত সবে বিনা দণ্ডভয়,
বিনা পুষ্পে দেয় ফল পাদপনিচয়।

"এই বনে অনসূয়া নিজ তপস্যায়
মুনিগণ-স্নান হেতু আনিলা গঙ্গায়,

হর-শিরে ছিলা যিনি যেন পুষ্পহার,
সপ্তর্ষি তোলেন করে হেমপদ্ম যাঁর।

"বীরাসনে ঋষিগণ যোগে নিমগন,
আসনবেদির মাঝে ওই তরুগণ
স্থিরভাবে রহিয়াছে নিশ্চল পবনে,
তারাও যোগেতে মগ্ন হেন লয় মনে।

"ওই শ্যাম বটবৃক্ষ, পূর্ব্বে তুমি যার
করেছিলে উপাসনা বনবাসকালে,
পদ্মরাগ-সুলোহিত ফলরাশি তার
শোভে এবে মরকত-শ্যাম পত্রজালে।

"সুনীল যমুনাজলে মিলি কুতূহলে
বহিছেন ওই শ্বেত সুর তরঙ্গিণী—
মুক্তাহারে গাঁথা যেন ইন্দ্রনীলমণি,
শ্বেত-পদ্মমালা কিম্বা নীল উতপলে!

"মানসের হংসরাজি ধবলবরণা
নীলহংসদলে যেন হয়েছে মিলিত,
ভূতলে চিত্রিত শ্বেত চন্দনরচনা
শোভে যেন কৃষ্ণপত্রে অগুরু-অঙ্কিত!

"কোথাও জোছনাজাল যেন রে চিত্রিত
স্থানে স্থানে ছায়া-লীন তিমিরপটলে,

কোথাও বা শরদের শুভ্র অভ্রদলে
ভেদি যেন নীলাকাশ হ'তেছে লক্ষিত !

"ধবল ভবেশ-অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত
রহিয়াছে যেন কৃষ্ণভুজঙ্গে বেষ্টিত—
এ রূপে কতই রূপ হের, বরাননে,
ধরেন জাহ্নবী মিলি যমুনার সনে।

"এ হেন সঙ্গমস্থলে গঙ্গা-যমুনার,
তত্ত্বজ্ঞান অভাবেও যদি কোন জন
অবগাহি দেহ, হয় সুপবিত্র-মন,
মরণে না হয় তার জন্ম পুনর্ব্বার।

"ওই গুহকের পুরী, ত্যজি শিরোমণি
যথায় বাঁধিয়াছিনু শিরে জটাভার ;
সুমন্ত্র কহিয়াছিল কাঁদিয়া তখনি—
'কৈকেয়ি, মনের সাধ মিটিল তোমার !'

"যে সরের হেমপদ্ম-পরাগ উরসে
ধরে যক্ষনারী, সেই মানস সরসে
জন্মিলা সরযূ নদী বেদে পরকাশ,
পরমাত্মা হ'তে যথা বুদ্ধির বিকাশ।

"এই যে সরযূ নদী বহিছেন ধীরে
অযোধ্যায়, যূপরাজি শোভে তাঁর তীরে ;

অশ্বমেধ-অন্তে স্নানে রঘুরাজগণ
করিলা পবিত্রতর ইহার জীবন।

"এ নদীর পয়ঃপানে বর্দ্ধিত শরীর
রঘুকুলরাজগণ খেলিতেন সুখে।
ইহার পুলিনে, যেন কোলে জননীর ;
মাতৃজ্ঞানে মানি তাঁরে মনের কৌতুকে।

"সুলোহিত ধূলিরাশি গোধূলি বরণ
উঠিতে সম্মুখে ভূমে, মম আগমন
শুনিয়া হহুর মুখে লইতে আমায়
সসৈন্যে ভরত বুঝি আসিছে হেথায়।" (১৩শ সর্গ)

শোক-গীতিঃ—

গ্রাম্য-দেবালয়-সন্নিহিত

শ্মশান দর্শনে।*

দিবসের অবসান ঘোষিছে আরতি, †
হম্বারবে ধীরে গাভী ফিরিছে প্রান্তরে,
কৃষক আবাস মুখে যায় শ্রান্তগতি
সমর্পিয়া এ জগত মোরে ও আঁধারে।

---

* প্রসিদ্ধ কবি গ্রে (Grey) প্রণীত Elegy অবলম্বনে।

† মূল অনুসারে—

ঘোষিছে ঘটিকাধ্বনি দিবার বিদায়,
হম্বারবে ধীরে গাভী ফিরিছে প্রান্তরে,
কৃষক শ্রমেতে ক্লান্ত গৃহ পানে যায়,
সমর্পিয়া এ জগৎ মোরে ও আঁধারে।

প্রকৃতির ম্লান দৃশ্য পাইতেছে লয়,
রয়েছে সমীর শান্ত সুগভীর ভাবে,
কেবল ঘুরিছে উড়ি বেগে ঝিল্লীচয়,
বিরামিছে দূর গোষ্ঠ কিঙ্কিণীর রবে।

বসি লতা-পরিবৃত দেউল-চূড়ায়,
উলুকী বিরস মুখে কহে শশধরে,
কেহ যদি আসি কুঞ্জে বিঘ্ন জনমায়
নির্জ্জন রাজত্বে তার বহুকাল পরে!

ও রুক্ষ বটের তলে, তমাল-ছায়ায়,
যথা জীর্ণ তৃণ-স্তূপে বন্ধুর ভূতল,
রয়েছে বিলীন সবে সংকীর্ণ শয্যায়
এ পল্লীর পিতৃগণ স্বভাব-সরল।

উষার সুরভি মুখে বায়ুর সুস্বরে,
চাতকের কলরবে তৃণময় নীড়ে,
প্রতিধ্বনিময় শিঙ্গা, কুক্কুটের রবে,
দীনশয্যা হ'তে আর জাগাবে না সবে!

গৃহাগ্নি তাদের তরে জ্বলিবে না আর,
গৃহিণী হবে না ব্যস্ত কাজেতে সন্ধ্যার,
শিশু না আসিবে ছুটি "বাবা এল" ব'লে,
সাধের চুম্বন লোভে উঠিবে না কোলে!

কাটিয়াছে শস্য তারা বহুকাল তরে,
সুকঠিন কত মাটি ভাঙ্গিয়াছে হলে,
তাড়াইত যুগ-পশু হরষে প্রান্তরে,
কঠোর আঘাতে তরু ফেলিত ভূতলে।

হে উন্নতি-অভিমানি, হাসিও না হেরি
তাদের সামান্য সুখ, শ্রমহিত-কারী—
কিম্বা ভাগ্য অকিঞ্চন ; হাসিও না, ধনি,
শুনি দরিদ্রের স্বল্প সরল জীবনী।

বংশের গরিমা কিম্বা দম্ভ ক্ষমতার—
রূপে বা ধনেতে যাহা দেয় এ জগতে—
আপেক্ষিছে সবে শেষ দিন দুর্ণিবার—
মৃত্যুই চরম গতি গৌরবের পথে!

হে গর্ব্বিত, দোষিও না তাহাদের তরে
নাহি যদি কীর্ত্তিস্তম্ভ দেউল প্রাঙ্গণে,
বিচিত্র খিলানে কিম্বা মণ্ডপ ভিতরে
নহে যদি যশোগান উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে।

জীবনী-অঙ্কিত স্তম্ভ, জীবন্ত মূরতি
ফিরাতে কি পারে দেহে বিগত জীবন?
জাগে কি নির্জীব ধূলি শুনিয়া সুখ্যাতি?
স্তবেতে দ্রবে কি হিম মৃতের শ্রবণ?

দেব-তেজে তেজীয়ান্ কোন মহাজন
হ'তে পারে, অনাদরে নিহিত হেথায়,
সক্ষম যে রাজ্য ভার করিতে বহন
কিম্বা জাগাইতে রাগে জীবন্ত বীণায়।

চির সুসঞ্চিত নিজ রতন-ভাণ্ডার
ভারতী তাদের তরে না খুলিলা হায়,
সে উষ্ণ প্রতিভা আর আবেগ আত্মার
বিষম দারিদ্র্য-হিমে হ'ল মৃতপ্রায়।

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জল
অগাধ সাগর-গর্ভে রয়েছে তিমিরে
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে।

শিশুপাল বধ :—

অজস্র সহস্র মেঘ ভীষণ মূরতি
তুঙ্গ শিলা-তট হ'তে উঠিছে সঘন,
রোধিবারে পুন যেন তপনের গতি
বাড়াইছে ঊর্দ্ধে শির বিন্ধ্যের মতন।

অসংখ্য রতনরাজি নব প্রভা-জালে
সুবর্ণের সানুদেশে করে ঝলমল;
ব্যাপ্ত মনোহর দেহ শ্যামল উপলে,
সুরভি লতিকাচয়ে শোভে অলিদল।

সহস্র শিখরে গিরি ব্যাপিলা আকাশ
সহস্র চরণে পুনঃ ঘেরিলা ধরায়,
রবি শশী যেন আঁখিরূপে পরকাশ,
শোভিলা সহস্র-শির বিধাতার প্রায় !

কোথাও সলিল-শূন্য শুভ্র মেঘদল
শোভে গিরি-দেহে ধৌত উত্তরীয় প্রায় ;
যেন অর্দ্ধ শিব-দেহ ভস্মেতে ধবল,
অন্য অর্দ্ধ উমা-অঙ্গ যোগে শোভা পায়।

প্রেয়সীর কল-কণ্ঠ-স্বর-লালসায়
অলস সারসকুলে সরসীর জলে
দেয় ছায়া শতপত্র আতপত্র প্রায়,
প্রসারি বিমুক্তপত্র এ গিরি অঞ্চলে।

লতা-ভুজ দোলাইয়া শোভে তরুগণ
সে চারু পর্ব্বতে, যেন রুদ্র অগণন ;
রাজে নীলকণ্ঠ রাজি স্কন্ধে মনোহর
বেষ্টিয়াছে দীর্ঘদেহ ভুজঙ্গনিকর।

শোভিছে বিমল স্রোতঃ শ্যামল শৈবালে
নব উলু তৃণাবৃত সৈকত-আভায়,
লোধ্র-রেণুজালে শ্বেত বামা-গণ্ড প্রায়
দোলে যাহে কর্ণফুল নীল উতপলে।

বিরাজে বাজীররাজি চপল ভ্রমরে
নিবারে তপন-তাপ পাদপের দল,
সুকেশা অপ্সরা সুখে বিহরে শিখরে,
রক্ষোভয়ে বিক্ষোভিত নহে বক্ষঃস্থল (৪র্থ সর্গ)

কিরাতার্জ্জুন :—

সর্ব্বজন-প্রিয় পার্থ গিয়া জন মাঝে
দেখিলা সুপক্ক শস্যে বিশদা ধরণী,
যেমতি প্রেয়সী পূর্ণ যৌবনের সাজে
কটি-তটে কলহংস মেখলার ধ্বনি।

হরষে হেরিলা বীর গ্রামের সীমায়
অবনত শালি ধান্যে পূর্ণ বনস্থলী ;
নাহি পঙ্ক ; শোভে সরে পঙ্কজ আবলী—
এ সব শরত-শোভা উপহার প্রায়।

মেলি পদ্মরূপ আঁখি যেন সরোবর
দেখে সফরীর খেলা, বিস্ময়ে মগন ;
প্রিয়ার বিলাসদৃষ্টি শোভা মনোহর
হরিয়া মোহিল পুঁটী কিরীটীর মন।

কলমের চারু শোভা কমলের সনে
হেরি জলে, হরষিত পার্থ বীরবর—
সুদুর্ল্লভ অনুরূপ বস্তুর মিলনে
জনমে অপূর্ব্ব শোভা, সদা প্রীতিকর।

সরোবরে পাঠীনের উচ্চ বিলোড়নে
ভাসমান পদ্ম-রেণু করে বিতাড়িত,
ফেনরাশি সহ তাহে জল দরশনে
স্থলকমলের ভ্রম হ'ল বিদূরিত।

শরতে সরিৎকুল ক্ষীণবেগে যায়,
তরঙ্গের রেখাঙ্কিত সৈকতনিচয়
শোভে শ্বেত ক্ষৌম প্রায় তটিনীর গায়,
নিরখি অর্জ্জুন বীর প্রফুল্লহৃদয়।

রক্ষিতেছে শালি ধান্য কৃষক-ললনা,
পরিয়া বন্ধক, সূক্ষ্ম কেশরে শোভিত,
চারু ভুরু মাঝে, যেন করিছে তুলনা
তা সহ অধর-শোভা অলক্তে রঞ্জিত।

পদ্মের কেশর বাল-অরুণ-লোহিত
নিক্ষেপিছে মুহুর্ম্মুহু পীন পয়োধরে,
ঘর্ম্মের পুলকে রেণু হ'য়ে প্রসারিত
বাড়ায় স্বভাব-শোভা তাদের শরীরে।

কপোলে লাগিয়া দোলে কর্ণ-উতপল
আকর্ণ নয়নপ্রভা পড়ে তদুপরে,
হেরি ক্ষেত্রে হেন শালি গোপিকার দল
কৃতার্থ গণিলা পার্থ শরৎ ঋতুরে।

শেষ রাত্রে গাভীকুল ছাড়ি গোচারণ
যাইতেছে বৎসের তরে উৎসুক অন্তরে
অক্ষম ধাইতে বেগে, পয়ঃধারা ঝরে,
কৌতুকে দেখেন তাহা ইন্দ্রের নন্দন।

দেখিলা—শরতে এক সবলশরীর
বৃষভ অপর বৃষে করি পরাজিত,
ভাঙ্গিছে নদীর তীর গর্জ্জিছে গভীর,
যেন দর্প মূর্ত্তিমান্ জয়-শ্রী-শোভিত।

শরতে তটিনী-তীর ছাড়ি মন্দগতি
চলিছে গাভীর দল, তুষার-ধবল,
খসিছে কটিতে শ্বেত দুকুল যেমতি,
উপজিয়া অর্জ্জুনের মনে কুতূহল।

দেখিলা ধেনুর কাছে যত গোপগণে
স্নেহে তারা পশুদের সহোদর প্রায়,
গৃহ-প্রেমে হয় তারা প্রেমিক কাননে
নিজ সরলতা যেন পশুরে শিখায়।

গোপিনীর মুখ, চল কুণ্ডল-প্রভায়
রঞ্জিত অরুণরাগে কমলের প্রায়,
উড়িছে অলক শিরে যেমতি ভ্রমর,
মৃদু হাসে পরকাশ দশন কেশর।

মন্থনের রজ্জু চারু ভুজ বিক্ষেপণে
টানিছে গোপিনী, শ্বাস রোধেতে তাহার
কাঁপিছে অধর যেন পল্লব লতার ;
নড়িছে জঘন ঘন পার্শ্ব-বিবর্ত্তনে।

মথনদণ্ডের বেগে গোষ্ঠের প্রাঙ্গণে
কাঁপিছে কলশী, মৃদু মৃদঙ্গের ধ্বনি
উঠিতেছে মুহুর্মুহু, প্রেমানন্দ মনে
মেঘের গর্জ্জনে ভ্রমে নাচিছে শিখিনী।

দেখিলা অর্জ্জুন হেন গোপিনীর দল,
মন্থনে পীবর স্তন ঈষৎ কম্পিত ;
শ্রমভরে সুমলিন নয়নকমল,
নৃত্যে রত বার-বধূ সম বিরাজিত।

নাহি পথে বক্রভাব এবে বর্ষা-শেষে
যান পার্থ ; বৃষে শস্য খাইছে দু পাশে,
ঘন পঙ্কে সীমন্তিত চক্রের রেখায়
সতত সঞ্চারে পথ পৃথক্ দেখায়

আশ্রম-মণ্ডপ সম কুসুম-সুহাসে
গ্রামে গৃহ-লতাকুঞ্জ দেখিলা হরষে,
সুবৃত্তি পুরুষগণ বেষ্টিয়াছে তায়,
একাগ্র যাহারা কর্ম বেশ বাসনায়। (৪র্থ সর্গ)

নামিছে কামিনী-সেনা স্মর-নদী প্রায়
গিরি-শিরে সুগম্ভীর বাদ্য-কোলাহলে,
উর্দ্ধে ধৃত শ্বেতচ্ছত্র ফেনরাশি তায়,
ব্যাপ্ত তাহা বামা-মুখরূপ শতদলে।

বেগভরে ধায় রথ সেতুরূপী ঘনে,
ক্লেশে সম্বরিয়া তাহা আনিছে ধরায়
অশ্বগণ, নিয়ন্ত্রিত রশ্মি-আকর্ষণে,
আকুঞ্চিত নাসা আর নত পূর্ব্বকায়।

নভঃ হ'তে গিরি-মুখে মহাকায় করী
নামিছে, চৌদিকে ব্যাপ্ত বারিদমণ্ডলে,
যেমতি মৈনাক আদি পলায়িত গিরি
রয়েছে নিশ্চল-পক্ষে শুয়ে সিন্ধু-জলে।

আকাশ গমনে অশ্ব সমগামী অতি,
উচ্চ নীচ গিরিশৃঙ্গে চলিছে তেমতি,
নীচে না লাগিছে খুর ; সিকতে নদীর
সমগ্র ক্ষুরের চিহ্ন পড়িছে রুচির।

সশব্দে নির্ঝর পড়ে অধিত্যকাপরে,
প্রতিধ্বনি-সুবর্দ্ধিত গভীর ঘর্ঘরে
ধায় রথ ; মেঘধ্বনি ভাবি উর্দ্ধমুখে
শুনিছে ময়ূরকুল মনের কৌতুকে।

ধরিছে নির্ঝর স্রোত সুনীলবরণ
গিরিতটে অবিরল নীলমণিতেজে,
নভঃ অন্তরালে যেন বিচ্ছিন্ন বিরাজে
ধবল প্রবাহ হ'তে, দেখে বামাগণ।

বন্যগজ-পথ হ'তে মদনদগ্ধ ঘ্রাণে
ক্রুদ্ধ সুর-গজগণ না মানে শাসন
অগ্রে স্থিত নিষাদীর ; করিছে গমন
কোন মতে করিণীর ছলে আকর্ষণে।

পথে রথ-সমুত্থিত ঘন রেণুজালে
আবৃত অপ্সরা সেনা ব্যাপিল কাননে,
বহেন জাহ্নবী যথা বরিষার কালে
আরক্ত মলিন নব সলিল প্লাবনে। (৭ম সর্গ)

মধ্যমণি প্রায় রশ্মি করিয়া বিস্তার
এক দিকে অধোগামী দেব দিনমণি,
বক্রভাবে দিন-লক্ষ্মী পড়িলা তখনি
হেলি আকাশের গলে যেন মুক্তাহার।

সহস্র কিরণ-করে ভুঞ্জিয়া তপন
অসীম কমলমধু বিষম তৃষায়,
মত্ততা লভিয়া তাহে আরক্ত বরণ,
গড়াইতে এবে যেন পড়িলা ধরায়।

লোহিত বরণ ধরি আপনি তপন
হইলা দর্শন-যোগ্য নেত্রে এ সময় ;
তাপিতা ধরারে তাপ ত্যজিয়া তখন
চক্রবাক-হৃদয়েতে লইল আশ্রয় ।

অর্দ্ধ অস্তমিত রবি, সে মূল-আশ্রয়
ত্যজি পূর্ব্ব হ'তে ক্ষীণ রশ্মি সমুদয়
যাইছে পশ্চিমে ঘন ম্লান অতিশয়,
প্রভুরে হারা'য়ে ক্ষুণ্ণ পরিজন প্রায় ।

পশিছে কিরণমালা কুঙ্কুম লোহিত
হর্ম্ম্যের গবাক্ষে প্রিয়-প্রেরিতার প্রায়,
সাদরে তাদেরে হেরি হরষে সন্ধ্যায়
বেশ ভূষা বামাগণ পরিছে ত্বরিত ।

সম্মুখে পাদপরাজি সানুর উপরে
অবলম্বি মৃদু করে লোহিত বরণ
ভূগর্ভে পশিলা রবি, অথবা সাগরে,
অথবা সে অস্তাচলে বিজন কানন ।

কুলায়ে বিহগকুল চলিছে সুরবে,
আকুল সে কলরবে গোধূলি সন্ধ্যার
শোভিছে প্রভাত প্রায় রবির অভাবে,
নাহি সে অরুণ রাগ, নাহি অন্ধকার ।

সন্ধ্যার আরক্ত প্রভা পশ্চিমগগনে
আবরিল মেঘজালে বিচিত্র বরণে—
শোভিল যেমতি সিন্ধু তরঙ্গমালায়
সুরঞ্জিত যবে রক্ত প্রবাল-আভায়।

কৃতাঞ্জলি কত জন নমিছে সন্ধ্যারে
মনে প্রাণে, তাদিগেও ত্যজি অকাতরে
চলিয়া যাইছে সন্ধ্যা, চাপল্যে আপন
দেখাইয়া দুর্জ্জনের মিত্রতা কেমন।

প্রভাত-আতপ ভয়ে ঘন তমোরাশি
আছিল গোপনে, এবে দিবা অবসানে
প্রবল প্রতাপে যেন অধঃ হ'তে আসি
ব্যাপিলেক সব স্থল ক্রম সঞ্চারণে।

অন্ধকারে একাকার সকলি দেখায়,
কীটাণু মহৎ হ'তে প্রভেদ-বিহীন ;
গুরু লঘু বিভিন্নতা যেন এ ধরায়
অস্তমিত রবি সহ হইল বিলীন।

বধূ সহ চক্রবাক মিলন আশায়
থাকে বসি, নিশিযোগে তাদের মিলন
না ঘটে নিয়তিবশে, বিরহ-ব্যথায়
কাঁদে তারা [illegible] মিলন।

নিজ পাশে চক্রবাকী, তবু প্রিয় তারে—
সম্ভাষে করুণ রবে বিনা আলিঙ্গন।
সরোজিনী করি হেন দুর্দ্দশা দর্শন
অস্ফুট কমলমুখ দুখে নত করে।

গিরি তরু সকলি কি রঞ্জিত তিমিরে,
নামিত কি আচ্ছাদিত তাহে নভঃস্থল,
লুপ্ত কিম্বা দশ দিক নিবিড় আঁধারে
উচ্চ নীচ নাহি, ধরা হ'ল সমতল! (৯ম সর্গ)

সাহিত্য সাধক-চরিতমালা—৪৮

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৫—১৮৮৬

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকতা-৬

জন্ম

৩১ অক্টোবর ১৮৪৫ তারিখে নদীয়ার অন্তর্গত গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে রাজকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ৪৬ বৎসর বয়সে দুই পুত্রকে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় রাখিয়া তিনি পরলোক-গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্নের বয়স তখন ১৫ এবং রাজকৃষ্ণের ৯।

ছাত্র-জীবন

রাজকৃষ্ণের ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি কিরূপ স্থান অধিকার [illegible], কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ক্যালেণ্ডার হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৮৬১	প্রবেশিকা পরীক্ষা, ১ম বিভাগ	...	কৃষ্ণনগর কলেজ
১৮৬৩	এফ. এ.	১ম বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান···	ঐ
১৮৬৬	বি. এ.	১ম বিভাগে ২য় স্থান···	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৬৭	এম. এ.	দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান···	ঐ
১৮৬৮	বি. এল.	১ম বিভাগে ২য় স্থান ···	ঐ

বিবাহ

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রাজকৃষ্ণ বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম ক্ষান্তমণি।

চাকুরী

রাজকৃষ্ণের চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ইং ১৮৬৭ এম. এ. পরীক্ষার পর জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিয়োগ।

১৮৬৮ বি এল. পরীক্ষার পর ১৬ই মার্চ হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হইয়া বহরমপুরে ওকালতী করিতে গমন।

১৮৬৯ ২২এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৫০৲ বেতনে কটক-ল-কলেজে অধ্যাপক।

১৮৭১ সার্ গুরুদাসের শূন্য পদে ১৫ই জানুয়ারি ২০০৲ বেতনে বহরমপুরে আইন-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ ও অবসরকালে ওকালতী করিবার অনুমতি লাভ।

১৮৭১ ৪ জুলাই হইতে ৩০০৲ বেতনে পাটনা-কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক।

১৮৭২ কলিকাতা প্রত্যাগমন এবং হাইকোর্টে ওকালতী করিবার মানসে জুন মাসে লাইসেন্স গ্রহণ।

১৮৭২-৩ কটক-ল-কলেজের আইন-অধ্যাপক ও ২৪এ জানুয়ারি ঐ পদ ত্যাগ।

১৮৭৭-৭৮ (?) 'বেঙ্গলী' পত্র সম্পাদন।

১৮৭৫ এপ্রিল হইতে ১৮৭৮ এপ্রিল ৪০০৲ বেতনে পাইকপাড়া-রাজ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পুত্র ইন্দ্রচন্দ্রের গৃহশিক্ষক।

১৮৭৮ ২৩এ আগষ্ট হইতে ১৩ জানুয়ারি ১৮৭৯ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী-কলেজে দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক।

১৮৭৯-৮৬ ১৪ জানুয়ারি হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গবর্মেন্টের বাংলা অনুবাদক।

জনহিতকর সভা-সমিতির সহিত যোগ

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা (The Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠা করেন। ৭ নবেম্বর ১৮৭৫ তারিখে রাজকৃষ্ণ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য এককালীন ১০০৲ টাকা দান করেন, ইহা ছাড়া তিনি মাসিক ৫৲ টাকা চাঁদা দিতেন। তিনি প্রথমাবধি এই সভার পরিচালক-সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন।

পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ তারিখে সার্ আলফ্রেড ক্রফ্‌ট রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্রনাথ বসুকে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন।

গ্রন্থাবলী

রাজকৃষ্ণ বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল; তিনি বাংলাতেই লিখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকের আখ্যাপত্রে মুদ্রিত থাকিত :—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর, কিবা বল চাতকীর ?
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা ?

নিধু।

রাজকৃষ্ণ যে-সকল পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে-গুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল।—

বাংলা

১। **যৌবনোদ্যান** (রূপক কাব্য)। [২১ আগষ্ট ১৮৬৮]। পৃ. ৬২।

ইহা "বঙ্গকবিকুল-শিরোমণি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়"কে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্রে রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—

"আপনার প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাগ্‌দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হই। যৌবনোদ্যান হইতে কতকগুলি পুষ্পোত্তোলন করিয়া মালা গাঁথিয়া অর্চ্চনারম্ভ করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।···অত্যল্প দিন হইল কাব্য-কারের যৌবনোদ্যানে প্রবেশ ঘটিয়াছে, এমন কি মধ্য দেশ পর্য্যন্ত যাইতে অনেক বিলম্ব আছে।···বহরমপুর, ২৯ জুন ১৮৬৮।"

মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' (৫ম পর্ব্ব, ৫৬ খণ্ড) ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

"···ইহা কোনমতে নিন্দনীয় হয় নাই।···ইহাতে অলঙ্কারবিশেষের আড়ম্বর অনেক আছে, এবং রচনা-চাতুর্য্যও স্থানে স্থানে প্রদীপ্ত বোধ হয়। অধিকন্তু পদ্যের সারল্যও লক্ষ্য হয়; উদাহরণ-স্বরূপ একটি পদ প্রদর্শিত হইতেছে।—

হেরিলা দ্বারের মাঝে, রতন আসনে,
চিন্তাকুলা মৌনভাবে বসিয়া রূপসী;
খরতর রবিকর জ্বলে সে বদনে;
নয়নের তেজে যায় নয়ন ঝলসী;

সৌদামিনী রাশি নাকি পড়িয়াছে খসি ?
কপাল কিঞ্চিৎ উচ্চ, প্রশস্ত, অঙ্কিত,
ভাবনা লাঙ্গলে ভাল গেছে যেন চসি ;
বক্রাগ্র নাসিকা ; ওষ্ঠ কি জন্য কম্পিত ;
দৃঢ়গ্রীবা ; অন্য অঙ্গ অলঙ্কার বাসে আচ্ছাদিত।” [২৯ পৃষ্ঠা]

২। **মিত্রবিলাপ** ও অন্যান্য কবিতাবলী। মে ১৮৬৯। পৃ. ৭৮।

সূচী :—মিত্রবিলাপ কাব্য। অন্যান্য কবিতাবলী :—বুদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ, নিশাকালে বিহঙ্গম রব, চিন্তা, নিদ্রা, সংসার, কাল, বসুমতী, বালকের মুখ, নিজদোষে বিপন্নের প্রতি, মনের প্রতি উপদেশ, প্রতিধ্বনি, স্বভাবের শোভা, কাব্যের বাগান, উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি, বন্ধুহীন কবি।

এই পুস্তকের অন্যান্য সংস্করণে “অন্যান্য কবিতাবলী”-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছিল। ষষ্ঠ সংস্করণের (ইং ১৮৮৮) পুস্তকে এই কয়টি কবিতা আছে :—জন্মাষ্টমী, বৌদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ, নিশাকালে বিহঙ্গমরব, চিন্তা, সংসার, বালকের মুখ, বন্ধুহীন কবি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ‘রহস্য-সন্দর্ভে’ ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি লেখেন :—

“যে সময়ে পৃথিবীতে আহার্য্য শোভার প্রতি বিশেষ সমাদর না হইয়া উঠে তত দিন কাব্য রচনায় স্বভাবোক্তিই সুচারুরক্ষিত হইতে পারে। পর্ব্বতাদি স্বাভাবিক বিষয় সকল যেরূপে বর্ণিত হয়, সুচারুকারুনির্ম্মিত প্রাসাদাদির বর্ণনাপ্রণালী কদাপি তাদৃশ শ্লাঘ্য হইতে পারে না। যে সকল কবিবর সামাজিক আহার্য্য শোভার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বভাবের কৌশল লিখিয়া কীর্ত্তিলাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয় শ্লাঘ্য এবং

কীর্ত্তনীয়। আমাদিগের সমালোচ্য-গ্রন্থপ্রণেতা [illegible]পাধ্যায় মহাশয় উক্তরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তনীয় হইবার যোগ্য হইয়াছেন। ইহাঁর রচনাপ্রণালী স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। গ্রন্থখানি মিত্রবিলাপ আখ্যায় অভিহিত সুতরাং বন্ধুবিরহ বর্ণনই উদ্দেশ্য। বিরহাবস্থায় মানাবের প্রকৃতির চারুতা দর্শন অভিলষণীয় হওয়াতে প্রকৃতির বর্ণনাদিও লক্ষিত হয়। ফলতঃ ইনি যেরূপ ভাবে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ইহাঁকে বিরহাবস্থার লোক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ইহাঁর বিরহভোগিত্ব ও কবিত্বের প্রামাণ্য রক্ষার্থ কতিপয় কবিতা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

দেখিলাম স্বপনে

মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি, কুমুদে কৌমুদীরাশি
হেরি সুখ নাহি ধরে মনে।
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সু[illegible]র,
শিহরে পুলকে কায়া সে কর স্পর্শনে
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার।
একি উষা দিনে তুমি আবার আঁধার? [[illegible] পৃষ্ঠা]

নিম্নস্থ চারি পংক্তি স্বপ্নাবস্থায় বন্ধু-দর্শনে চিত্তের [illegible] কার্য্যই প্রকাশ করিতেছে।

প্রণয়ের পাত্র-সনে হইলে মিলন,
উথলে আহ্লাদ চিতে, সুধা বর্ষে চারি ভিতে,
বিজলির সম হাসি উজলে আনন;
মানস সরস মাঝে, আশা কমলিনী সাজে,
হেরিয়া নয়নে পুনঃ সুখের তপন;

রোগ শোক দূরে যায়, ইচ্ছা হয় পুনরায়,
সংসার তরঙ্গে রঙ্গে চালাই জীবন।
প্রণয় বিষয় আজি বুঝি আমি ভালো ;
বন্ধু সনে যে সকল, দেখিতাম নিরমল,
আজি সে সকল আমি দেখি যেন কালো ;
সে কালে শীতল কর, দিতে তুমি সুধাকর,
তুমিও এখন মম মনাগুন জ্বালো ;
তোমারো মলয়ানিল, শীতলতা গুণ ছিল,
এখন কেবল তুমি শোক শিখা পালো ! [১৮-১৯ পৃষ্ঠা]

প্রথমোদ্ধৃত কবিতার নিম্নে পংক্তিচতুষ্টয় রূপকালঙ্কারে লক্ষিত হইয়া মানসি প্রকৃত বৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছে। মিলনাবস্থায় সুরম্য বস্তু দর্শনে মনোমধ্যে যেরূপ আনন্দলহরী বহিতে থাকে, বন্ধুবিচ্ছেদে ঐ সমস্ত রম্য বস্তু দর্শনেও সেইরূপ মনের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে ; গ্রন্থকর্ত্তা ইহা শেষোক্ত কবিতায় সুনিশ্চিত করিয়া শব্দ নিবদ্ধ করি[য়া]ছেন। ফলে ইনি পুস্তকখানি রচনা করিয়া যে কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে এরূপ স্থল অনেক আছে, যাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে সুখি করিতে পারি, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে তদ্‌বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।”—৫ম পর্ব্ব, ৫৬ খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮।

৩। **কাব্য-কলাপ**। ১২৭৭ সাল (২৩ মে ১৮৭০)। পৃ. ৮১।

সূচী :—আশার প্রভাব (১ম কাণ্ড), সন্তোষ সাধন, হর্ষ, মনোবৃত্তিগণের নৃত্য, গঙ্গাবতরণ কাব্য (১ম সর্গ)।

৪। **রাজবালা** (ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা)। আশ্বিন, ১২৭৭ সাল (২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০)। পৃ. ১৮০।

ইহাই রাজকৃষ্ণের প্রথম গদ্য-রচনা।

৫। **প্রথম শিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ** (১০ জানুয়ারি ১৮৭২)।

পৃ. ২৮।

৬। **প্রথম শিক্ষা বীজগণিত** (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭: পৃ. ২০।

রাজকৃষ্ণ একখানি 'পরিমিতি'ও রচনা করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—"তাঁহার পরিমিতি ও বীজগণিত এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্ক বলিয়া গণ্য

৭। **প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস** (২৮ ডিসেম্বর ১৮৭৪)।

পৃ. ৯০।

১২৮১ সালের মাঘ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

"রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

* মুষ্টিভিক্ষা হউক কিন্তু স্বর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালক শিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় নিত্য২ প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প।"

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে।

---

* "রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী," 'প্রচার' ৩য় খণ্ড (১২৯৩), পৃ. ২৬৫।

৮। **কবিতামালা**। এপ্রিল ১৮৭৭। পৃ. ১২৪।

সূচী :—সূর্য্য, শান্তিহীন, সৃষ্টি, কাল, জন্মাষ্টমী, অকালে বিজয়া, ব্রহ্মসংবাদ, কুঞ্জবনে কমলিনী, প্রভাতে যামিনী, ঊষা, বিষ্ণু, ভারতমাতা, যৌবনোদ্যান। পরিশিষ্ট।

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"এই গ্রন্থে যে সকল কবিতা সংগৃহীত হইল, তন্মধ্যে অধিকাংশই 'এডুকেশন গেজেট', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনকালে কোন কোন কবিতা স্থলবিশেষে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মৎপ্রণীত 'যৌবনোদ্যান' নামক কাব্যের যত খণ্ড ছাপা হইয়াছিল, বহুদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। এজন্য উক্ত কাব্যখানিও এতৎ সঙ্গে পুনর্ম্মুদ্রিত হইল।"

৯। **মেঘদূত** (পদ্যানুবাদ)। কার্ত্তিক ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। পৃ. ৬০।

"আমি যখন বাঙ্গালা পদ্যে মেঘদূতের অনুবাদ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় ইহার যে অন্য কোন পদ্যানুবাদ আছে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ব-মেঘের প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইলে, জানিতে পারিলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং আরও কেহ কেহ বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে মেঘদূতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম যে তাঁহারা যে প্রণালীতে অনুবাদ করিয়াছেন, আমার অনুবাদ সে প্রণালীর হইতেছে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের যত স্বতন্ত্র অনুবাদ বঙ্গ-ভাষায় থাকে, মূল বুঝিবার পক্ষে তত সুবিধা হইবে, বিবেচনা করিয়া আমার অনুবাদও শেষ করিলাম। অনুবাদকালে শ্রীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্যদিবিবেক ও মল্লিনাথের টীকা সহিত মেঘদূতের যে সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অনুবাদ পুস্তক লিখিত হইল। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ দুইটী শ্লোক উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের পর রাখিয়া দিয়াছি। ঐ দুইটী অনেকে মেঘদূত হইতে উদ্ধৃত করেন বলিয়া রাখিলাম। সংস্কৃত মেঘদূত আদ্যোপান্ত একই ছন্দে লিখিত। এ নিমিত্ত সমুদয় শ্লোকই একবিধ বাঙ্গালা মিত্রাক্ষর কবিতায় অনুবাদ করিলাম। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা করিবার নিমিত্ত মূল ও অনুবাদ একত্রে দেওয়া গেল।”—ভূমিকা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘বঙ্গদর্শনে’ (‘অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৯) ‘মেঘদূতে’র এক সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে :—

“মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতি বাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণ বাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রাহী ; আমরা তাঁহার অনুবাদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘদূতের আর দুই-একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদ যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক।”

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ মেঘদূতের একটি শ্লোক ও রাজকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥
কৃশাঙ্গী, যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণীতুল্য-ললিত-লোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনতকলেবরা,
শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে,
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতী-সমাজে ; (পৃ. ৪৩)

১০। **নানা প্রবন্ধ**। নবেম্বর ১৮৮৫। পৃ. ২০৬।

সূচী :—ভারতমহিমা, বিদ্যাপতি, দেবতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ভ্রম, চার্ব্বাক দর্শন, শ্রীহর্ষ, প্রাচীন ভারতবর্ষ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, প্রতিভা, কোম্‌ত দর্শন, সভ্যতা, সমাজবিজ্ঞান, মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ এবং জ্ঞান ও নীতি।

"এই প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে [১২৭৯-৮২ ও ১২৮৪ সালে] 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল।...পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে কোন কোন প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে সামান্য পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।"

* * *

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' পুস্তকের ৯৪-১০১ পৃষ্ঠায়, ১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রশংসিত 'মানস বিকাশ' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থকে রাজকৃষ্ণের রচনাবোধে উহার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। 'মানস বিকাশ' আমরা দেখিয়াছি, উহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই ; কিন্তু উহা যে রাজকৃষ্ণের রচনা নহে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ,—উহার লেখক পূর্ব্ববঙ্গের কবি দীনেশচরণ বসু। এ সম্বন্ধে এই চরিতমালার ৪২ সংখ্যক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ইংরেজী ঃ—

1. Hindu Philosophy. A Lecture delivered in the Bethune Society. On 14th March 1867. The Proceedings and Transactions of the Bethune Society, from Nov. 10th 1859, to April 20th 1869. pp. 227-58.
2. A Lecture on Hindu Philosophy delivered...at the Cuttack Debating Club on the 24th March 1869. [19th Sep. 1870] Calcutta 1870. pp. 33.
3. Hindoo Mythology, a lecture delivered at the Cuttack Young Men's Literary Assocn, on the 31st July 1870. 30th Nov. 1870. pp. 24.
4. Theory of Morals and Origin of Language.* Calcutta 1871. pp. 20.
5. Hints to the study of the Bengali Language, for the use of European and Bengali students. Calcutta 1883. pp. 102. *Beng.* and *Engl.*

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরির বাংলা পুস্তক-তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে।

মৃত্যু

২৫ আশ্বিন ১২৯৩ (১০ অক্টোবর ১৮৮৬) তারিখে রাজকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। পরবর্ত্তী ২রা ফাল্গুন তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থে বাংলার সাহিত্যিকবর্গ সাবিত্রী লাইব্রেরিতে সমবেত হন।

* প্রথমটি পাটনায় ছাত্রগণের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা। দ্বিতীয়টি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কটক ডিবেটিং ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা।

এই শোকসভায় কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী রাজকৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাহার শেষ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

হায় !
—শত আঁখি অশ্রুবারি,
—ঝরিবে তোমারে স্মরি,
—আদর্শ সে গুণ যেন সবাকারি হয় !
যশের মন্দির মাঝে,
উজ্জ্বল পবিত্র সাজে,
সদা অমর হইয়া থাক সাধু সদাশয় !! ('প্রচার', ১২৯৩, পৃ. ২৬৩)

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বাংলা-সাহিত্য

বঙ্কিম-সুহৃৎ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বন্ধুর মতই বাংলা গদ্যে ও পদ্যে সব্যসাচী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনার পরিধি কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি কবিতার অধিক ছিল না বলিয়া তিনি বিস্মৃতির গর্ভে তলাইতে বসিয়াছেন। বন্ধুর বিপুল সাহিত্য-মহিমাও ইহার অন্যতম কারণ বটে। রাজকৃষ্ণ যুগোপযোগী কবিতা লিখিলেও আজ তাঁহার কবিতা বাছাই করিতে বসিয়া তাঁহার ভাবের ও ছন্দের প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। নিম্নে যে নির্ব্বাচন সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেই তাহার পরিচয় মিলিবে। রাজকৃষ্ণ তাঁহার কালে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ছিলেন। বঙ্কিম ও ভূদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা চলে না। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে তাঁহার 'নানা প্রবন্ধ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য থাকাতে তাঁহার এই শক্তির পরিচয় পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা পাইয়া থাকেন। সাহিত্য-রসিকেরা

তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি পড়িলে গদ্যরচনায় তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা উপলব্ধি করিবেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গদর্শনে' গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলা দেশে বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। গদ্যরচনার সামান্য নমুনাও এখানে প্রদত্ত হইল।

যৌবনোদ্যান :—

হের বসি পুষ্পাসনে যেন দুলিচায়,
খচিত প্রবাল-মুক্তা-হীরক-কাঞ্চনে,
প্রশান্ত বসন্ত দেব, রূপের আভায়,
ভাল করি আলো করি সে নিকুঞ্জবনে ;
শীত-শান্ত-সৌদামিনী-শোভা সে আননে,
সন্ধ্যার কপালে জলে যে তারারতন,
লজ্জা পায় মিলাইলে সে নয়ন-সনে ;
সে ভুরুভঙ্গিমা দেখি করিলা গঠন
ফুলধনু ফুল-ধনু জগতের মানসমোহন।

কৌস্তুভরতন জিনি ওষ্ঠের বরণ,
দন্তগুলি মুক্তাবলী সিন্দূরে মাজ্জিত ;
গলায় ফুলের হার লোচনরঞ্জন,
নবনীর বাতি নিন্দি কর সুশোভিত ;
বৃষস্কন্ধ, মধ্য ক্ষীণ মৃগেন্দ্র-বাঞ্ছিত।
শিরীষ-কুসুম-স্তম্ভে করিয়া লাঞ্ছনা
সুকোমল মনোহর উরু সুবলিত ;
সুন্দর দর্পণ দিয়া নখের রচনা,
পাড়ি তাহে দেহকান্তি শোভে কিবা গোলাপগঞ্জনা।

কুসুমতরুর স্তম্ভ চারি দিকে সাজে ;
আলিঙ্গিয়া শাখাদল, মাথার উপর
পুষ্পের ভূষণ অঙ্গে ঢাকে ঋতুরাজে,
যেন লতাফলকাটা ছাদ মনোহর,
কিম্বা যথা চন্দ্রতপ দেখিতে সুন্দর,
বুটকাটা, ফুলতোলা, রক্ত, নীল, পীত,
চারি পাশে ঝোলে হাসি বিচিত্র ঝালর,
মলয় পবন যাহা করিয়া কম্পিত,
পরিমল-ধন হরি, দশ দিকে করে বিতরিত।

মিত্রবিলাপ :--

গীতধ্বনি

৩

এখনও শুনি যেন সে মধুর স্বর।
যেন সে কণ্ঠের গীত, পূরিল রে আচম্বিত,
শ্রবণ-কুহর !
শোকাকুল মিত্রে পড়ি মনে,
এসেছ কি অবনী-ভবনে,
সান্ত্বনা করিতে তারে, জীবনদোসর ?

৪

কত দিন দুই জনে একত্রে বসিয়া,
আমোদ প্রমোদে রত, থাকিতাম অবিরত,
সঙ্গীত লইয়া ;

এসেছ কি পুনঃ ধরাতলে,
সঙ্গে করি রাগিণীর দলে,
শান্তি দিতে বন্ধু-চিতে গীত বরষিয়া ?

৫

তোমার প্রণয় কথা পড়ে যবে মনে,
ছাড়ি গেছ একেবারে চিত্ত না বলিতে পারে,
পারিবে কেমনে ?
তোমার যে কোমল হৃদয়,
তারে ভুলা সম্ভব কি হয়,
ভুলিতে নারিতে যারে নিশার স্বপনে ?

৬

দিব্য চক্ষে যেন আমি দেখি কত বার,
বিদ্যুতের আভা প্রায়, দেখিতে দেখিতে যায়,
তোমার আকার।
যেখানে সেখানে আমি যাই,
তোমারে দেখিতে যেন পাই,
বোধ হয় সঙ্গে তুমি থাক অনিবার।

৭

করাল কৃতান্ত ছিঁড়ে জীবন-বন্ধন ;
প্রাণ আর কলেবর, ভিন্ন করে নিরন্তর,
তপন-নন্দন।
কিন্তু প্রণয়ের সূত্র দিয়া,
বাঁধা যবে থাকে দুই হিয়া,
পারে না কি কাল তাহা ছিঁড়িতে কখন ?

৮

কখন্ আসিবে বন্ধু সে সুখের দিন,
ছাড়ি দুঃখময় ভবে, তোমায় হেরিব যবে,
পাশে সমাসীন ?
যে অবধি থাকিব দুজনে,
উভয়ের নয়নে নয়নে,
উপস্থিত মুখে করি অতীত বিলীন ?

সংসার

এ সংসার দুঃখের আগার।
বিদ্যুতের আভা প্রায়, কভু সুখ দেখা যায়,
গাঢ়তর পুনরায়—হয় অন্ধকার,
যথা মেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে,
সৌদামিনী হাসিয়া লুকালে,
পথ হারা পথিকের ঘটে অনিবার।

এই শিশু প্রফুল্ল কমল,
মুখে আধ আধ ভাষ, কিবা মৃদু মৃদু হাস ;
দেখ রোগে আসি গ্রাস করিল সকল।
শুকাইল সে শরীরকান্তি,
সে আনন ছাড়ি গেল শান্তি ;
সেই শিশু কিনা ভ্রান্তি হইল প্রবল।

কেন ফুল এমন সুন্দর,
বিকশিত ধরাতলে, যদি রোগ কীট ছলে,
প্রবেশি আপন বলে পুষ্পের ভিতর,

সে সৌন্দর্য্য বরণ বিমল,
অন্তরিত সুধা পরিমল,
হরিবে বিকটাকার দুষ্ট কালচর ?

ম্লান-মুখ শোক দুর্নিবার,
হৃদয় অনল তোর, সুখ আশা শান্তি চোর,
তোর স্পর্শে বিশ্ব ঘোরতর অন্ধকার।
তোর দীর্ঘশ্বাসে ভবতলে,
বিষম আগুন সদা জ্বলে,
আমোদ প্রমোদ ফেলে করি ভস্মাকার।

পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পতি,
দুহিতা ভগিনী নারী, বন্ধু আর উপকারী,
কালবশে ক্লেশকারী, সংসারের গতি।
মায়াবলে একের বিরহে,
অন্যের হৃদয় শোকে দহে,
যবে কোন জনে যম হরে দুষ্টমতি।

পতিশোকে কাঁদিছে কামিনী।
বহে চক্ষে নীরধারা, নিরাহারা নিরাধারা.
ধূলিসারা জ্ঞানহারা, দিবস যামিনী।
নাহি অন্ধকার আলো জ্ঞান,
ভেদাভেদ বোধ অবসান,
শূন্যে বাস শূন্যহিয়া বিকলা ভামিনী।

বাড়িতেছে ক্রমশঃ আঁধার ;
নবভীম বেশ ধরি, যন্ত্রণার বিভাবরী,
যেন কাল সহচরী গ্রাসিছে সংসার।
দৃষ্ট নহে স্মৃতি সুখতারা,
হৃদয়-গগন-শশী-হারা ;
উষা আসি এ তিমির বিনাশে না আর।

নাহি হাসে আশা-কমলিনী ;
মানস সরস-জলে, সরোজিনী যেন জ্বলে,
বিরহ বাড়বানলে, হইয়া মলিন।
প্রণয়ের ছবি প্রভাকর,
দৈববলে আজি মীনকর,
অস্তাচলে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন তিনি।

দেখ চাহি এদিকে আবার ;
গৃহ-লক্ষ্মী হারাইয়া, সুখে জলাঞ্জলি দিয়া,
ধরাতলে লোটাইয়া, করে হাহাকার ;
বিসর্জ্জিয়া প্রেমের প্রতিমা,
দুঃখের নাহিক আর সীমা,
চারি দিকে দেখিতেছে অকূল পাথার।

শোক-মেঘে ঢেকেছে আনন ;
কভু চক্ষু মেলি চায়, ক্ষণপ্রভা-প্রভাপ্রায়,
কভু শুন হায় হায় বজ্রের গর্জ্জন,

ঘন ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস,
বরিষার যেমন বাতাস,
নয়নে নিয়ত করে বারি বরিষণ।

রে মায়া কেমন তোর ছল।
সদা প্রাণ যারে চায়, কেন আনি দিয়া তায়,
হরি নিস্ পুনরায়, করিয়া কৌশল ?
কি কারণ এমন বন্ধন,
ত্বরা যার হইবে ছেদন ?
করি হেন ভোজবাজি হয় কিবা ফল ?

জীবন কি জাগিয়া স্বপন ?
আমার আমার বলি, এদিকে ওদিকে চলি।
কেহ যেন লয় ছলি, যা বলি আপন।
যার পানে চাহি একবার,
পরক্ষণে চিহ্ন নাহি তার,
পলকে কালের জলে লুকায় কেমন।

এই লতা নব কুসুমিতা,
নব যৌবনের ভরে, পরকাশে সমাদরে,
প্রেমে প্রিয় তরুবরে, ধরিল ললিতা ;
কে সহসা মূল কাটি দিল,
মোহিনী বল্লরী শুকাইল,
শ্রীহীন হইল তরু, হারায়ে বনিতা।

ওই শুন কে কাঁদিছে আর।
কি করি ভাবি না পায়, কাঁদে পুত্র নিরুপায়
"এত দিনে হৈল হায় সংসার আঁধার ;
যে পিতা পালিলা এত দিন,
পঞ্চ ভূতে হইলা বিলীন,
কে আর রাখিবে সুখে এত পরিবার ?

"জগতের নিয়ম কেমন ?
লোকে যারে চাহে যত, তাহারি বিপদ তত,
পদে পদে তার কত, ফিরে শত্রুগণ ;
মেঘ-রাহু ঘুরে অনিবার,
আক্রোশে গ্রাসিতে বারম্বার,
রবি চন্দ্র, লোকানন্দ, ভুবন-রঞ্জন।

"জরা আসি যৌবন বিনাশে ;
পশিয়া সৌন্দর্য্য বনে, রোগ শোক একমনে,
অগ্নি-সম প্রতি ক্ষণে, বিক্রম প্রকাশে ;
কালমুখী চিন্তা ভুজঙ্গিনী,
বল হরে দিবস যামিনী,
সংসার গরলময় করি দীর্ঘশ্বাসে।

"যে প্রকাণ্ড তরুর শাখায়
শত শত পক্ষিগণ, বাস করে অনুক্ষণ ;
পান্থ-দল অগণন, যাহার ছায়ায়,

সন্তাপিত তপনের করে,
আশ্রয় গ্রহণ আসি করে ;
অশনি কি পড়িবেই তাহারি মাথায় ?”

কাব্য-কলাপ :—

আশার প্রভাব

হে আশা, দুরূহ কাজে তোমার মতন
ভিজাইতে কেবা পারে মানবের মন ?
টসঙ্কুল সিন্ধু, অকূল, অতল
পড়িলে তাহার মাঝে দৃষ্ট নহে স্থল ;
কেবল উপরে শোভে অনন্ত আকাশ,
যথা রবি চন্দ্র তারা ভাসে বার মাস।
কিছু দূরে চারি দিক্ কুজ্ঝটিকাময়,
অসহায়ে নেত্রে তাহা ভেদ্য কভু নয়।
টলমল নিরন্তর তরঙ্গে তরণী,
ঘোরতর ভূমিকম্পে যেমতি ধরণী।
কোথাও হরিত ক্ষেত্র না পায় নয়ন ;
কোথা বন্য পাখি গান শুনে না শ্রবণ ;
কুসুমজনিত গন্ধ ভাগ্যে নাহি মিলে ,
ভাবে মন, লোকালয় কোথায় রহিলে !
যবে ভয়ঙ্কর বেশে জলদনিকর
অন্ধকার আবরণে ঢাকে নীলাম্বর ;
কোন পাশে কার আর নাহি চলে দৃষ্টি,
আগত প্রলয় যেন সংহারিতে সৃষ্টি ;

হুঙ্কারি প্রচণ্ড বেগে ধায় প্রভঞ্জন,
উলট পালট করি অর্ণব গগন ;
ক্ষিপ্তপ্রায় অম্বুনিধি বিশাল বিক্রমে
আক্রমে যা বক্ষোপরি জোর করি ভ্রমে ;
মাঝে মাঝে সৌদামিনী যেমন ঝলকে,
অমনি ক্ষণেক দৃষ্ট চোকের পলকে,
ফেনিল তরঙ্গমালা ধাবিত ত্বরিতে
ধবল শৃঙ্গের সম আকাশ স্পর্শিতে ;
বহিত্র বিষম বাতে, ঊর্ম্মির পীড়নে,
কখন উঠিছে স্বর্গে হেন লয় মনে ;
কভু বোধ হয় যেন পাতালে পশিল,
অথবা নরকপুরে যাইয়া জুটিল ;
বৃষ্টিধারা লাগে অঙ্গে যেন তীক্ষ্ণ তীর
সহসা আসিয়া ভেদ করিল শরীর ;
ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ে অশনি আকাশে,
শ্রবণ বধির শব্দে, হিয়া কাঁপে ত্রাসে।
এমন বিপদময় দুস্তর সাগরে,
যাহার কল্লোলে বলে সশঙ্কিত নরে,
তব প্রলোভনে, আশা, কত লোক চলে,
সাহসে ভাসায়ে তরী সতরঙ্গ জলে,
সিন্ধু পানে চিরদিন উড়ি তব কেতু,
জ্ঞানার্জ্জনে, অর্থোপায়ে, রাজ্য লাভ হেতু,
বিদ্বানে, বণিকে, বীরে পথপ্রদর্শক,
উড়াইয়া অবিরত বর্ত্মের কণ্টক।

মনোবৃত্তিগণের নৃত্য

(পয়ার)

একদা বাজায়ে বীণা নন্দন কাননে,
বিরিঞ্চিনন্দন গীত গান হৃষ্টমনে।
তাল মান লয় রাগ রাগিণীর সঙ্গে
মোহিত দেবতাকুল সঙ্গীতের রঙ্গে।
মনের প্রকৃতিপুঞ্জ নাচিতে মাতিল ;
দেবসভা মাঝে শোভা আশ্চর্য্য ভাতিল।
নাচিল চঞ্চল ভাবে কল্পনা সুন্দরী,
রতনরঞ্জিত সাজে অঙ্গসজ্জা করি ;
আকাশ পাতাল মর্ত্ত চৌদিকে কেবল
উৎসাহে আনন্দে নেত্র ঘুরে অবিরল ;
পড়ে কি না পড়ে পদ মৃত্তিকা উপরে ;
অপূর্ব্ব কৌশলে নৃত্য কত ভঙ্গিভরে।
সংসার কানন ফুলমালা দোলে গলে
তত্ত্বজ্ঞান মণি ভালে নিরন্তর জলে ;
অন্তরের নীল আভা অম্বরে প্রকাশে ;
তাহে যেন কোটি কোটি তারাগণ হাসে ;
অঙ্কিত অঞ্চলে তার রবি শশধর,
গিরি, নদ, বন, হ্রদ পরম সুন্দর।
শান্ত সৌদামিনী বিভা আননে ঝলকে
হৃদয় হরিয়া লয় চোকের পলকে।

(একাবলী মিশ্রিত ত্রিপদী)

সৌন্দর্য্যে আঁধার নাশি, বদনে হাস্যের রাশি,
পুলকিত কায়ে নাচিল আশা,

নয়ন যুগলে, প্রফুল্লতা জ্বলে,
দূর পানে দেখি সুখের বাসা ;
যেন সরোবর জলে, কমলিনী কুতূহলে,
নৃত্য করে রঙ্গে মলয়ানিলে,
দূরস্থ গগন, শোভিয়া তপন,
হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিলে।
মধুর বচন মুখে, নিয়ত নিঃসরে সুখে,
কিছুতে উৎসাহ নাহিক যায় ;
তালভঙ্গ ভয়, জানে না হৃদয়,
ভাঙ্গে যদি পুনঃ রত চেষ্টায়।
হেরিয়া রূপের ছটা, যন্ত্রণার ঘনঘটা,
মলিনতা ছাড়ি সুবর্ণে সাজে ;
অচলা চপলা, জিনিয়া উজলা,
পোষাকে সাহস বিভা বিরাজে।

(একাবলী)

হৃদয়ে বাসনা, নয়নে ভীতি,
নানাবিধ রঙ্গে নাচিল প্রীতি।
এক দিক্ পানে সতত দৃষ্টি,
করিয়া সেখানে সুধার বৃষ্টি।
নিয়ত লোচন থাকে সে স্থলে,
তালে তালে পদ যে দিকে চলে।
সে স্থল ঘেরিয়া নৃত্যের ঝাঁক,
অন্য দিকে দেখ কেবল ফাঁক ;

যেমতি সলিল প্রপাত জল
এক স্থল ঘেরি নাচে কেবল।
সেখানে জলের কতই রঙ্গ,
সেখানে জলের কত তরঙ্গ।
সেখানে বিবিধ বর্ণালঙ্কারে
সাজে সে সলিল সৌন্দর্য্যভারে।

(মিশ্রত্রিপদী)

মন্দ সমীরণে, আন্দোলিত বনে,
তরুতলে চন্দ্রিকা যেমতি
নাচে অন্ধকারে, ভয়ের মাঝারে,
সহিষ্ণুতা সুমতি তেমতি।
মৃদু পদ চলে, লোচন যুগলে,
মাঝে মাঝে বারি করে ভর।
বিমল বরণ, না যায় কখন;
হতাশ্বাস না হয় অন্তর।
যা ঘটে ভয়াল, নাহি কাটে তাল,
সমভাবে চিত্ত স্থির থাকে।
দেখিতে দুর্ব্বল, অথচ সবল,
নিরন্তর ঘোরতর পাকে।

(পজ্ঝটিকা)

নাচিল করুণা মোহন মূরতি
আকাশ দেশ উজ্জ্বলি কিরণে;

বিভাকর বিভা উষার যেমতি
তিমিরে হরিয়া নাচে গগনে।
উপরের দিকে সজল লোচনে
কভু চায় দুখে কেন না জানি;
উৎসাহ কথন উদ্দিত আননে;
মুখে সরে কভু বেদন বাণী।
দীন হীন জন উপরে সতত
কৃপাবলোকন বাসনা মনে;
পরের যাতন হরিবারে রত
এমন নাহি এ বিশ্ব-ভবনে।

(ঝালঝাঁপ)

হৃষ্টান্তরে, নীলাম্বরে, শশধরে, হেরিয়া,
সিন্ধুজল, অবিরল, কল কল করিয়া,
যথা ধায়, নৃত্যতায়, মগ্নকায়, হইয়া,
রৌপ্যাঞ্চল, ঝলমল, ঢল ঢল গলিয়া;
যথা শক্তি, নাচে ভক্তি, অনুরক্তি দর্শিয়া,
কৃপালোকে, সর্ব্বলোকে, রোগ শোকে নাশিয়া;
থমণ্ডলে, চক্ষু চলে, প্রতি পলে, কেবল;
পুলকিয়া, প্রফুল্লিয়া, ঝম্পে হিয়া চঞ্চল।
নীলোৎপল, নেত্রদল, কভু জল—শোভিত
কভু আস্য, তড়িল্লাস্য জিনি হাস্য—রঞ্জিত।

(তূণক)

ক্রোধ ধায়, মত্ততায়, নৃত্য রঙ্গ, সাধিতে;
লম্ফ ঝম্ফ, হেরি কম্প, সর্ব্বলোক বুদ্ধিতে।

রক্ত আঁখি, রক্ত মাখি, রক্তজন্য বাসনা ;
মার মার, শব্দভার, আননের, তর্জ্জনা।
নাহি তাল, বোধ ভাল, নিত্য ধ্বংসকারক,
চিত্তবর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্ম, মর্ম্মবোধ জারক।
পাদঘায়, মাটি যায়, ঊর্দ্ধদেশ ছাইয়া,
ভীমবেশ, এল শেষ, অন্ধকার ধাইয়া ;
বায়ুরাজ, যেন আজ, মেঘবেশ পিন্ধিয়া,
নৃত্যমত্ত, শূন্য মর্ত্ত্য, সর্ব্বনাশ বাঞ্ছিয়া।

(দ্বাদশাক্ষর বৃত্তি)

বিহঙ্গের গান শুনিয়া মোহিত,
প্রফুল্ল প্রসূন প্রত্যুষে যেমন,
রসভরে তনু হইলে গলিত,
নাচে তালে তালে নয়নরঞ্জন ;
নাচিল তেমনি মনোহর সুখ,
টল টল রসে, বিকসিত মুখ,
নেত্রে জয়োল্লাস, অহংকার মনে,
মত্ত আত্মপ্রীতি সতত যতনে ;
মধুময় কথা বদনে নিঃসরে ;
রূপের ছটায় দিক্ আলো করে।

রাজবালা :—

আলামডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ দুই ক্রোশের কিঞ্চিদধিক গমন করিলে গোস্বামী দুর্গাপুর নামক গ্রামে উপস্থিত

হওয়া যায়। গ্রামটি কুমার নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, গ্রামবাসী গোস্বামীদিগের জমিদারির অন্তর্গত। এখানে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বসতি আছে। নীলের হাঙ্গামায় বিখ্যাত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানকার এক জন দলপতি ছিলেন। এখানে একটি ইংরাজি স্কুল, একটি বালিকাবিদ্যালয়, ও দুইটি বাঙ্গলা পাঠশালা আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক; কায়স্থদের মধ্যে অনেকে উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে গিয়া থাকে। গোস্বামীরাই পূর্ব্বে এখানকার প্রধান লোক ছিলেন; কিন্তু বংশবৃদ্ধি ও তন্নিবন্ধন বিষয় বিভাগে তাঁহাদের অবস্থা অনেক দূর মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। বেগবতী অর্থ-লালসাও তাঁহাদের মানের অনেক হানি করিয়াছে। গুণবিলোপিনী অজ্ঞানতাও বংশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্বসৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে। গোস্বামীদের বাটীতে রাধারমণ নামে একটি ত্রিভঙ্গ মুরলীধরের মূর্ত্তি আছে। এই বিগ্রহের প্রভাবে অদ্যাপি গোস্বামীদের অনেকের অন্ন চলিতেছে। গ্রামের পুরাতন কীর্ত্তির মধ্যে রাধারমণের একটি ভগ্ন মন্দির আছে। মন্দিরটি ইষ্টকনির্ম্মিত, এবং যদিও অনেকখানি মাটির নীচে বসিয়া গিয়াছে, তথাপিও অতি উচ্চ দেখায়। মন্দিরের ইষ্টকে বিবিধ প্রকার শিল্পচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়। কোথায় লতাকাটা, কোথায় ফুলকাটা, কোথায় বা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত খোদিত রহিয়াছে। কোন দিকে দেখ, ধরাসনে দণ্ডায়মান কৌশল্যা-নন্দন ও সৌমিত্রি গজবাজি রথারোহী রাক্ষসগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতেছেন; হনূমান্ এক হস্তে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, ও অন্য হস্তে পর্ব্বতখণ্ড ধারণ করিয়া, বিপক্ষদল প্রতি নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত। কোন স্থলে বা কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে ক্ষত্রকুলগর্ব্ব বীররাজদিগের সমরকুশলতা প্রকাশ করিতেছে। কোথায় বা ভীষণ মহিষাসুর বিশাল বিক্রম সহকারে দশভুজা দেবীর সহিত

যুদ্ধ করিয়া কাল শূলাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে; ঘূর্ণিত চক্ষু এখনও নিমীলিত হয় নাই, ক্রোধে দন্তোষ্ঠ মুখভঙ্গি এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই, নিম্নে ছিন্নমুণ্ড মহিষ দৃষ্ট হইতেছে, সিংহ আস্ফালন করিতেছে। কোন স্থানে রক্তবীজ বধ বাসনায় খড়্গ হস্তে ভীমা চামুণ্ডা লোলজিহ্বা বিস্তার করিতেছেন। কোথায় বা তমালতলে গোকুলের রাখালরাজ গোপিনী-দলে বংশীবাদন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। সময়ের করঘর্ষণে খোদিত প্রতিমূর্ত্তিদিগের মধ্যে কাহার কাহার কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্ষয় ধরিয়াছে, কোন কোন অঙ্গ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। মন্দিরটি পূর্ব্বমুখ; দক্ষিণ পার্শ্বে এই সংস্কৃত কবিতাটি খোদিত আছে।

"কালাঙ্কবাণেন্দু-মিতে শকাব্দকে
জ্যৈষ্ঠে শুভে মাসি সুনির্ম্মলাশয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণরায়ঃ শুভ সৌধমন্দিরং
শ্রীযুক্ত রাধারমণায় সন্দদৌ॥"

এতদ্দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে, ১৫৯৬ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীকৃষ্ণ রায় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ রায় রাজা রায়মুকুটের পুত্র, কেহ বলেন রাজা রায়মুকুটের পৌত্র। জয়দিয়া গ্রাম রাজা রায়মুকুটের রাজধানী ছিল। জয়দিয়া গোস্বামী-দুর্গাপুরের প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখনও সেখানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজবংশের অনেক লোক সেখানে বাস করেন। কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী কোথায় গিয়াছে? রাজা রায়মুকুট শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার দত্ত ব্রহ্মত্র অনেকে নয় দশ পুরুষ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তিনি এক প্রকার গোস্বামী-দুর্গাপুরের সংস্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার কন্যা দুর্গাবতী হইতে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। দুর্গাপুরের গোস্বামীরাও দুর্গাবতীর বংশসম্ভূত।

এক্ষণকার গোস্বামীদের মধ্যে কেহ রাজা রায়মুকুট হইতে নয় পুরুষ, কেহ বা দশ পুরুষ অন্তর। কেন রাজা রায়মুকুট রাজধানী হইতে এত দূরে গ্রাম পত্তন করিলেন? কেন বা রাজবালা দুর্গাবতী এই নব সংস্থাপিত গ্রামে বাস করিলেন? গ্রামের নামই বা কেন গোস্বামী দুর্গাপুর হইল? পাঠক, যদি এই সকল প্রশ্নের উত্তর আকাঙ্ক্ষা কর, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার সঙ্গে চল, সকলই জানিতে পারিবে। —উপক্রমণিকা।

কবিতামালা ঃ—

শান্তিহীন

এ কি দেখি সহসা আকাশে
তিমির ঠেলিয়া চারি পাশে
দূর হতে আলো যেন হাসে !
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল প্রলয় ;
শব্দ শুনি ভয়ঙ্কর, হৃদে লাগে ভয়।
এ ত নয় সামান্য বাতাস,
যেন দীর্ঘ রুদ্রের নিশ্বাস।
মেঘরাশি রোষে যেন গ্রাসিছে গগন ;
পালাইল ভীমভাব হেরি তারাগণ।
সৌদামিনী-রাশির সমান
দেখিতেছি জ্যোতি স্থানে স্থান ;
যেন শরীরের আভাপ্রায়
জ্যোতি মাঝে কোথা দেখা যায় ;
আমার নিকটে সবে উতরিল প্রায়।

অস্তাচলগামী চন্দ্র

ওই দেখ দাঁড়াইয়া আকাশের পাশে য[illegible]বলাসী ;
পাণ্ডুবর্ণ কলেবর, কাঁ[illegible]ছে থর থর,
কপোল নয়নজলে যাইতেছে ভাসি ;
ছাড়িতে প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া ;
প্রেম বিনা এ সংসার অন্ধকাররাশি ;
কেন রে গোকুলচাঁদ ভুলিল আমারে ?
বিষের জ্বলনে জ্বলি ভব-কারাগারে ।

বিরহরাহুর ভয়ে শশীর এ দশা গগনমণ্ডলে ;
দেবতার বুদ্ধি হত, মানুষের সহে কত,
দুর্ব্বল মানবকুল সকলেই বলে ;
অবলা মনুজে নারী ; যন্ত্রণা সহিতে নারি ;
জীবন জ্বলিছে যেন বাড়ব অনলে ;
বল স্বজনি লো বল বাঁচিব কেমনে ?
অথবা মরণ ভাল শ্যামের বিহনে ।

প্রেমের কমল, হায়, মানসসরসে ফুটিবে কি আর ?
হৃদয়গগনরবি, সংসাররঞ্জন-ছবি,
উষার সহিত দেখা দিবে কি আবার ?

লোকে মোরে কমলিনী, বলে কেন নিতম্বিনি ?
আমারে ঘেরিয়া আছে চির অন্ধকার।
এ নিশার অবসান হবে কি লো সই ?
আর কার কাছে মোর মনকথা কই।

কেন সই তোর আঁখি করে ছল ছল বল্ না আমারে ?
কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণা ঘোর ?
কিসে তোর ফুল্লমুখ গ্রাসিল আঁধারে ?
বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ,
সুখ সুখ, দুখ দুখ, চৌদিকে বিস্তারে।
যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে ফুলকুল ;
যথায় শীতের গতি, সৌন্দর্য্য নির্ম্মূল।

স্বজনি লো সরোবরে দেখ না কাঁপিছে ভয়ে কুমুদিনী,
নয়ন মুদিত প্রায়, যেন অবসন্ন কায়,
নাথ যায়, বলি হায়, এমন মলিনী।
না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ,
যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী।
নিশা তো হইল গত, বিরহ না যায়।
কেন হরি নিদারুণ হইলে আমায় ?

বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস, বৃন্দাবনধন।
কত প্রেমকথা কয়ে, আমায় হৃদয়ে লয়ে,
করিতে পুলককায়ে সাদরে চুম্বন।

একেবারে স্বপ্নবৎ, হইল কি সে তাবৎ ?
অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন ?
অথবা কপালগুণে—আমি অভাগিনী—
অমৃত হইল বিষ, লো প্রিয় ভগিনি !

ভারতমাতা

"ম্লান মুখচন্দ্র ভারতি তোমারি,
হেরি দিবানিশি ঝরে নেত্রবারি,
নিয়ত যে কান্তি, বরষিত শান্তি,
আজি তা কেমনে এমন নেহারি ;
দুখ-পারাবারে, নিরখি তোমারে ;
হৃদয়ে ধৈরজ ধরিতে না পারি।"

মধুর বচন করিয়া শ্রবণ
চকিতা দুঃখিনী ফিরায় নয়ন
অমৃতভাষিণী তরুণী পানে ;
অদৃষ্টের ফের, হায়, দৃষ্টিহারা
পূর্ব্বতেজস্বিনী নয়নের তারা ;
কিছু না হইল জ্ঞানের উদয় ;
পুনঃ কমলিনী ভাষ সুধাময়
বষিলা মধুর মধুর তানে।

"দেখ গো ভারতি তোমারি সন্তান
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হতজ্ঞান ;

বলবীর্য-হীন, অন্ন বিনা ক্ষীণ,
দেখিয়া দুর্দ্দশা, বিদরয়ে প্রাণ ;
হেরিতে না পারি এ দশা তোমার,
দেশের সুখের মুখে দিয়া ছার,
হইয়া অপার জলনিধি পার,
চলিলাম আজি ত্যজি এই স্থান।"

দুখিনী আবার চাহিলা চকিতে,
কিন্তু সংজ্ঞা তাহে না হইল চিতে ;
দেখিয়া চপলা অদৃশ্য হইল ;
অমনি আলোকমালিকা নিভিল।

কতক্ষণ পরে আর্ত্তনাদ করি
উঠিলা দুখিনী, যেন চোরে হরি
লয়ে গেছে তাঁর মাথার মণি ;
সন্তানগণেরে চান জাগাইতে
আলস্যে কেহই না চাহে উঠিতে,
যে জাগে সে পুনঃ যায় ঘুমাইতে,
করেন জননী রোদনধ্বনি।

অবশেষে জাগি উঠিল সকলে,
"কি খাব মা, খাব" ক্ষুধাভরে বলে,
কহেন জননী "কি বলিব, হায়,
গিয়াছেন লক্ষ্মী ছাড়িয়া আমায় ;

অন্ন আর কোথা পাইব এবে ;
কমলা এখন সাগরের পারে,
বিরাজেন মহারাণীর আকারে,
অন্ন কর বাছা তাঁহায় সেবে।"

"জয় মহারাণী জয় জয় জয়,
বিপদ্‌সময় দেহ মা আশ্রয়,"
হৃদয় ভরিয়া, উৎসাহ করিয়া,
কহিল কাতরে তনয়চয়।

হেন কালে শ্বেতকান্তি মহাবীর,
জলদগ্নি কোপে কম্পিতশরীর,
বিদ্রোহী বলিয়া, ভর্ৎসিয়া গর্জ্জিয়া,
পদাঘাত করে, নিষ্ঠুর অন্তরে,
সন্তানগণের গায়।
দেখিয়া দুঃখিনী জাম্বুদ্বীপভূমি,
বলে "অহে বিধি, কোথা আছ তুমি?
ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে,
কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে?
কোথায় হরিষ, কোথায় গিরিশ,
কোথা ফেলি গেলি মায়।"

নানা প্রবন্ধ ঃ—

ভারতমহিমা

ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্য জনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে শতাধিক

বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্রব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যানচেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটিগণিত, বীজগণিত ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটা ফোঁটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন। যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সেই দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কত কাল এইরূপ চলিবে? ভারতসন্তানগণ, ভারতের পূর্ব্বমহিমা স্মরণপূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্যকাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতাকুসুমের বাসন্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুল আনন্দানিলহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। যখন অমৃতময় স্বর-লহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতুরাজের আগমনবার্ত্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি, না বুঝি, তাহাতে মন

মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তন্তু পর্য্যন্ত বাজিয়া উঠে। এই কলকণ্ঠ ভাবুক পিকবরের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

কার্য্যকারণসম্বন্ধ

সমুদায় বিশ্বব্যাপারই কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত। সূর্য্য তাপ দিতেছে; মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে; অগ্নি দহিতেছে; মারুতহিল্লোলে লতাপল্লব সঞ্চালিত হইতেছে; ইত্যাদি যাহা কিছু জগন্মণ্ডলে ঘটিতেছে, সে সকলই কার্য্যকারণের দৃষ্টান্তস্থল। তাপ, বৃষ্টি, দাহন, লতাপল্লব-সঞ্চালন প্রভৃতিকে কার্য্য, এবং সূর্য, মেঘ, অগ্নি, মারুতহিল্লোল প্রভৃতিকে যথাক্রমে তাহাদিগের কারণ বলিলে কি বুঝায়, এই প্রবন্ধে তাহাই বিবেচ্য।

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাকেই কার্য্য বলা যায়। অনেক পদার্থ রাত্রিকালে শীতল থাকিয়া দিবসে সূর্য্যকিরণসংযোগে তাপযুক্ত হয়। বৃষ্টি এক সময়ে নাই, অপর সময়ে হইতেছে। কোন বস্তুতে অগ্নি সংস্পর্শ না হইলে, তাহা দগ্ধ হয় না। লতাপল্লব এক সময়ে স্থির হইয়া আছে, অপর সময়ে মারুতহিল্লোলে দুলিতেছে। অতএব তাপ, বৃষ্টি, দাহন, লতাপল্লবসঞ্চালন, ইহাদিগের উৎপত্তি আছে; এ জন্যই ইহারা কার্য্যপদ-বাচ্য। এইরূপ দিবারাত্রি, জীবোদ্ভিদ্, সুখদুঃখ ইহাদিগের উদয় আছে বলিয়া, ইহারাও কার্য্য। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কাল কখন ছিল না ইহা কেহ কল্পনা করিতেও পারে না; সুতরাং ইহাদিগকে কার্য্য জ্ঞান করিতে বুদ্ধিমান্ মনুষ্যমাত্রেই অশক্ত। যাহা অনাদি, অথবা যাহার আদি আছে এরূপ প্রমাণ নাই, তাহাকে কার্য্য বিবেচনা করিতে আমাদিগের অধিকার নাই; যাঁহারা জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি মনে করিয়া রাখেন।

যাহা ব্যতিরেকে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তাহাকে সেই কার্য্যের কারণ বলে। সূর্য্য ব্যতিরেকে দিবাভাগের তাপ জন্মে না। বিনা মেঘে বৃষ্টি হয় না। অগ্নি বিনা দাহন ঘটে না। মারুতহিল্লোল ব্যতিরেকে লতাপল্লব সঞ্চালিত হয় না। এই নিমিত্তই সূর্য্যকে তাপের কারণ, মেঘকে বৃষ্টির কারণ, অগ্নিকে দাহনের কারণ, এবং মারুত-হিল্লোলকে লতাপল্লবসঞ্চালনের কারণ বলা যায়।

যে সমুদায় ঘটনা, অবস্থা বা বস্তু সমবেত না হইলে কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয় না, কারণ বলিলে বিজ্ঞানানুসারে সে সমুদায়ের সমষ্টিকে বুঝায়; কিন্তু চলিত কথায় তন্মধ্যস্থ যে কোন একটিকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যখন আমরা মেঘকে বৃষ্টির কারণ বলি, তখন যে আমরা কারণাংশমাত্রের প্রতি লক্ষ্য করি, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই অনুভূত হইবে। যে বাষ্পরাশি মেঘরূপে গগনমণ্ডলে ভাসমান হয়, তাহা শীতলবায়ুসংস্পৃষ্ট বা কিয়ৎপরিমাণে তাড়িতভ্রষ্ট না হইলে জলরূপে পরিণত হয় না। সুতরাং মেঘের শীতলসমীরণসংস্পর্শ বা তাড়িতত্যাগ বৃষ্টির অন্যতর কারণ। আবার ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে, জলদ রূপান্তরিত হইয়া যে বারি জন্মে, তাহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারিত না। সুতরাং ভূমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ বৃষ্টির আর একটি কারণ। অতএব প্রকৃতরূপে বৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে মেঘ, তৎসঙ্গে শীতল বায়ুর সংস্পর্শ বা তৎকর্ত্তৃক তাড়িতত্যাগ, এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, এই কয়েকটীর উল্লেখ করিতে হয়।

কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি। সুতরাং কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। অগ্রে মেঘ হইবে, পরে বৃষ্টি হইবে। অগ্রে সূর্য্যোদয় হইবে, পরে পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ পদার্থচয় উত্তপ্ত হইবে। কিন্তু যাহা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষিত হয়, তাহাই কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে সময়ে

কুম্ভকার ঘট গড়িতেছে, তৎপূর্ব্বক্ষণে কত জীবের জন্ম বা মৃত্যু, কত বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম বা বিনাশসাধন, কত রাজ্যের উদয় বা বিলয়, কত লোকের সম্পদ্ বা বিপদ্, কত গ্রহনক্ষত্র ধূমকেতুর আবির্ভাব বা তিরোভাব হইতেছে। কিন্তু এ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সহিত ঘটের কোন সম্বন্ধ নাই। এ সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও মৃত্তিকা, চক্র, দণ্ড ও কুম্ভকারের অভাবে ঘটের উৎপত্তি হইবে না; এবং এ সমুদায়ের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও মৃত্তিকা, চক্র, দণ্ড ও কুম্ভকার থাকিলে, ঘটোৎপত্তি হইতে পারিবে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৯*

রাজনারায়ণ বসু

১৮২৬—১৮৯৯

রাজনারায়ণ বসু

যোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীমদনমোহন কুমার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— পৌষ ১৩৫২

মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রক :

অশোক ভট্টাচার্য

শোভনা প্রেস

১/১ জ্ঞাননগর রোড, কলিকাতা-১৭

উপক্রমণিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে-সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও রাজনারায়ণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "আমার ধাতু বরাবর বাঙ্গালীতর; আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।"* পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় বিভ্রান্ত বাঙালী সমাজকে রাজনারায়ণ বরাবর আত্মস্থ হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং আজীবন জাতির সত্যকার উন্নতির পথ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাতৃভাষার অনুশীলনে রাজনারায়ণের প্রযত্ন সর্ব্বজনবিদিত। বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয়তা একটি স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তা-সৌধ গড়িতে হইলে স্বদেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সম্পদ্ প্রভৃতির মূল ঠিক রাখিয়া প্রত্যেকটিরই উৎকর্ষ সাধন যে আবশ্যক, তাহা তিনি প্রতিনিয়ত স্বদেশবাসীর কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিয়াছেন। এই সকল উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক স্থলে সমবেত হইয়া কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনের কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে কংগ্রেসের পিতামহ বলা সত্য সত্যই সার্থক।

---

* আত্ম-চরিত, ২, ৬৯।

জন্ম ও পিতৃ-পরিচয়

রাজনারায়ণ আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন :—

"১৭৪৮ শকের ২৩এ ভাদ্র দিবসে (ইং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬) বঙ্গ দেশের চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুরা পরগণায় বোড়াল গ্রামে আমার জন্ম হয়। চাপড়া ষষ্ঠীর দিন জন্ম হয়। আমার স্মরণ হয়, যে পর্য্যন্ত না ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করি, প্রতি জন্মতিথি দিবসে মাতাঠাকুরাণী আমাকে পীতবস্ত্র পরাইতেন ও আমা দ্বারা একটি মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়াইতেন।

"আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস গড় গোবিন্দপুর ছিল। ইংরাজেরা যখন ঐ স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তখন তাহার এওজি জমি কলিকাতার বাহির সিমলা পল্লীতে আমার পিতৃপুরুষদিগকে দেন। বাহির সিমলার প্রাণকৃষ্ণ বসু আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞাতি ছিলেন।

"বাহির সিমলা পল্লীস্থিত মতিলাল শীলের পুষ্করিণীর নিকট প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাটী হইতে আমার প্রপিতামহ শুকদেব বসু কোন কারণবশতঃ বোড়াল গ্রামে বসতি করিতে বাধ্য হয়েন।...

"শুকদেব বসুর দুই পুত্র, রামপ্রসাদ বসু ও রামসুন্দর বসু। রামপ্রসাদ বসু চাকরী করিতেন, তাঁহার অনুজ রামসুন্দর বসু বাটীতে বসিয়া গৃহ কার্য্য দেখিতেন।...

"রামসুন্দর বসুর তিন পুত্র। তাঁহার বড় স্ত্রী দ্বারা এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার নাম মধুসুদন বসু। তাঁহার ছোট স্ত্রী দ্বারা দুই পুত্র হয়। তাঁহাদিগের নাম নন্দকিশোর বসু ও হরিহর বসু। নন্দকিশোর বসুর জন্ম ১৮০২ সালে এবং হরিহর বসুর জন্ম ১৮০৪ সালে হয়। নন্দকিশোর বসু আমার পিতা।

"আমার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। পিতাঠাকুর ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু ঐ ভাষাতে বিশুদ্ধরূপে পত্রাদি ও বিষয়কর্ম্মের কাগজপত্র লিখিতে পারিতেন।

"পিতাঠাকুর স্কুল ছাড়িয়া দিন কতক রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। ...আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে।

"পিতাঠাকুর প্রথমে দিন কতক হরকরা আফিসে কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন। তখন হরকরার মালিক Samuel Smith সাহেব ছিলেন। স্মিথ সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে বড় ভালবাসিতেন। পিতাঠাকুর হরকরা আফিস ছাড়িয়া অন্য দুই এক জায়গায় কেরাণীগিরি করিয়া একুশ বৎসর বয়সে গাজিপুর Opium Agency Office-এ নিযুক্ত হয়েন। বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন কোন আফিসে কর্ম্ম করিয়া ট্রেজারীতে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত জন্য স্থাপিত Special Commission Office এর হেড কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়েন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৭ই ডিসেম্বর ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

"পিতাঠাকুর অতিশয় খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি যদি মনে করিতেন, তাহা হইলে Special Commission Officeএ যখন নিযুক্ত

ছিলেন, তখন অন্যায়রূপে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইত নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য অনেক লোক তাঁহাকে ধরিত। তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ লইলে অনেক টাকা রোজগার কারিতে পারিতেন, কিন্তু এক পয়সা লইতেন না। যেরূপ আয় ছিল, সেরূপ ব্যয় করিতেন, তাঁহাকে বড় মানুষি করিতে কেহ দেখে নাই। তাঁহার মৃত্যুসময়ে আমি কোন সঞ্চিত অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বরূপে পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কৃত কতকগুলি ঋণ পরিশোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।...

"আমার বাল্যকালে আমার স্মরণ হয় যে, আমি শিবপূজা করিতে ভালবাসিতাম। খেলার মধ্যে তাহা প্রধান খেলা ছিল। শিব গড়িয়া পূজা করিতাম ও তাহার সম্মুখে কুমড়া ইত্যাদি বলি দিতাম। শিবকে বলি দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত নহে, মুরুব্বিরা বলিলেও তাহা শুনিতাম না।"

ছাত্র-জীবন

পাঁঠশালা, হেয়ার স্কুল ও কলেজে শিক্ষার কথাও রাজনারায়ণ পর পর এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আমার স্মরণ হয়, আমার জেঠা মহাশয় মধুসূদন বসু আমাকে তাঁহার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমাকে 'গাড ঈশ্বর, লাড ঈশ্বর' মুখস্থ করাইতেন।...আমি গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতাম, তিনি বর্দ্ধমানের একজন উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তিনি উগ্রস্বভাব ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যদি 'রাজনারায়ণ' বলিয়া আমাকে ডাকিতেন, তখনই আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাইত। সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতাঠাকুর আমাকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় আনেন। আনিয়া প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আমাকে ভর্ত্তি

করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখিবার জন্য শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। স্কুল বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত।...

"শম্ভু মাষ্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম School Society's School ছিল। স্কুলের প্রকৃত নাম "School Society's School" হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্ত্তা ছিলেন। সাধারণ লোক হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া ডাকিত।

"আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি। হেয়ার সাহেব আমাদিগের বক্তৃতাশক্তি ও রচনাশক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্কসভা (Debating Club) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে "Whether Science is preferable to Literature" এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত (mathematics) ভাল লাগিত না, তথাপি আমার প্রবন্ধে আমি তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনা-শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহপূর্ব্বক আমাকে বলিতেন যে, 'কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ' (how fast you are growing)।

"হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি, তখন আমাদিগের তিন জন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার

হইয়াছিলেন।...উমাচরণ হেড মাষ্টার ছিলেন। [illegible]চরণের নিকট আমরা কত উপকৃত, তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা ও অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন।...উমাচরণ আমাদিগের নিকট Scott's Ivanhoe, Pope's Poems, Henry to Emma এবং অন্যান্য গদ্য পদ্য কাব্য উত্তমরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ঐ সকল কাব্য পড়িতেন, তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া।...

"রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত-বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ...গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি।...

"হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সম্বাদ-পত্র প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সম্বাদপত্রে যেমন সম্বাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালানোতে আমার সহাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিত। ঐ সম্বাদপত্রের নাম Club Magazine ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লাবের নামে রাখিয়াছিলাম। নামটি পুরাতন ইংরাজী অক্ষরে (old English character) কাগজের শিরোদেশে জাজ্বল্যমানরূপে লেখা হইত। এই কাগজ দেখিয়া দুর্গাচরণ বলিয়াছিলেন যে, উহা যেন নেপোলিয়নের বাল্যকালের তুষারদুর্গ নির্ম্মাণের ন্যায়।...হেয়ার স্কুলের

প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি ইংরাজীতে একটি শ্লেষাত্মক কবিতা (satire) রচনা করিয়া তাহাতে আমার প্রধান প্রধান সঙ্গীদিগকে বিশেষঃ একজন সুবর্ণবণিকজাতীয় সঙ্গীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম।...

"হেয়ার সাহেবের স্কুলে থাকিতে ক্লাসের পড়া ছাড়া আমার প্রথম অতিরিক্ত পাঠের বিষয় Robinson Crusoe। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনা সকল এমনি মনে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, সেগুলি আমার সম্মুখে ঘটিতেছে দেখিতাম।...ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনকে যে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয়, তাহার নাম Tarvels of Cyrus by Chevalier Ramsay। উহা ফরাসিস্ ভাষা হইতে অতি সহজ ইংরাজীতে অনুবাদিত। বইটি কিন্তু মস্ত। যেখানে মিশর দেশের পুরোহিতেরা সাইরস্ রাজাকে বুঝাইতেছে যে, মিসরিক পুরাণ কেবল রূপকমাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে, হিন্দুধর্ম্মও ঐরূপ। মন এইরূপে খুলিয়া গেলে আমি পুত্তলিকাপূজা হইতে বিরত হই। সরস্বতী পূজা সম্মুখে উপস্থিত, তাহা করিলাম না। ইহাতে আমার মনে হয় আমার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; যেহেতু তাঁহার মত ছিল, 'তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ' ; কিন্তু সেই অবধি পৌত্তলিকাচার না করিলে আমাকে আর কিছু বলিতেন না।

"ইং ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হই।...

"আমি প্রথমে হিন্দু কলেজের থার্ড ক্লাসে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ দুই শ্রেণী কলেজ বিভাগ ধরিতে গেলে, তাহার স্কুল বিভাগের প্রথম ক্লাসে ভর্ত্তি হই। সেই বৎসরই অনেক পুস্তক প্রাইজ পাই। সেই বৎসর Government সংস্থাপিত General Committee of Public Instruction-এর সেক্রেটরী ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) আমাদিগকে মিল্টনের

পরীক্ষা করেন।* তাহার পর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলার্ষিপ (সেই বৎসরই উচ্চ শ্রেণীর জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রথম নির্দ্ধারিত হয়) পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠি। দুই বৎসর উক্ত স্কলার্ষিপ ভোগ করি। তাহার পর ৪০ টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করি। তখন সর্ব্বোত্তম ছাত্রদিগের প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইত এবং টাউন হলে গবর্ণর জেনারেল আসিয়া স্বহস্তে অতি নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগকে পর্য্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। দুই এক বার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্ম্মনীতিতে আমার প্রদত্ত উত্তর সম্বাদপত্রে ছাপা হয় ও ধর্ম্মনীতিতে একটি রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত হই।†···

* সরকারি শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে এইরূপ উল্লিখিত আছে ঃ

Dr. Wise examined the Literary acquirements of the students of the 3rd class, Senior Department: and has remarked as follows as to its condition:

"I examined the Class in the Literary Studies by requiring each to read, explain, and parse a passage in Milton's Paradise Lost. The reading was generally very good. the explanation (sometimes difficult) were ready and generally correct. I award the prize to Rajnarain Bose."

"In Natural Philosophy, the examination was satisfactory ;···I award the prize to Dinonauth Dey, and I was much Pleased with the manner in which the following students answered the questions put to them···Rajnarain Bose ··"

† শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে আছে :

PRIZE FOR PROFICIENCY IN ADAM SMITH'S MORAL SENTIMENTS.

The Prizes for proficiency in Adam Smith's Moral Sentiments given by the President of the Council of Education were contended for at the Institution on the 11th March [1844].

"পুরাবৃত্তে কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্দ্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত।

Hume's History of England (unabridged). Gibbon's Roman Empire (unabridged). Mitford's History of Greece. Ferguson's Roman Republic. Elphinstone's India. Russell's Modern Europe.

"পুরাবৃত্ত লেখকের মধ্যে গিবন ও মেকলে, বিবিধ প্রবন্ধ লেখকের মধ্যে মেকলে এবং কবিদিগের মধ্যে স্পেনসর, টমসন ও বাইরন আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি সেক্সপিয়র ও মিল্টনের ক্ষমতা দেখিয়া স্তব্ধ হইতাম, কিন্তু আন্তরিক ভালবাসাটা উপরোক্ত কবি সকলের প্রতি ছিল।...কলেজে থাকিতে আমি মনে মনে ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য্য সম্পাদন করিবার কল্পনা করিতাম। তন্মধ্যে 'Science of National and Individual Happiness' একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং একটি অতি বৃহৎ Universal History লিখিবার কল্পনা, এবং উৎকল, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া চারি বেদ ও সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ করিবার কল্পনা প্রধান ছিল।

"আমাদের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডস (Captain David Lester Richardson) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকটে আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পর তিনি বিলাত যান। তৎপরে দুই বৎসর

The answers to the questions were all written in the presence of the President without reference to books or other assistance.

The answers were examined by the President, and he awarded the Gold Medal to Annundkissen Bose, and the Silver Medal to Rajnarain Bose, whose papers will be found in the Appendix C.

—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44, P.33.*

কর সাহেবের (James Kerr) নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্ষপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্ষপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "I can forget everything of India but your reading of Shakespear.". তিনি আশ্চর্য্যরূপে সেক্ষপিয়র বুঝাইতেন। তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্ব্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, "Are you going to the theatre today?" তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়।... তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না—কিন্তু তথাপি হয়। তিনি যখন প্রথম বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দনপত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজের সর্ব্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন Historain বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম, তেমনই Good Reader বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।

"হিন্দু কলেজে যতদিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বলিয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে আরো দুই তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া জন্মানোতে আমি ১৮৪৫ সালের প্রথমে* কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

* শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে পাই :

Certificates of proficiency, according to the rules, have to be granted to the undermentioned pupils (scholarship holders) who left the College during the year 1845 :

"আমার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার* জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেকেণ্ড ক্লাস হইতে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া ছাড়িয়া যান।...

"কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় আমার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে আমার প্রথম বিবাহ, বিখ্যাত ইংরাজী লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্রকে তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনী লেখনে সাহায্য প্রদান, স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষের সহিত রাজমহল ও গৌড় ভ্রমণ, এবং আমার ধর্ম্মমতে পুনঃ পুনঃ কয়েকটি পরিবর্ত্তন প্রধান।"

বিবাহ

"আমার প্রথম বিবাহ সেয়ালদহের রাধামোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসর ও কন্যাটির বয়স এগারো বৎসর। আমার এখানে কুলকর্ম্ম হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর

(1) Jogacechunder Ghose, senior scholarship holder, appointed Deputy Magistrate at Backergunge.

(2) Chundernauth Moitry, ditto, ditto, teacher Hooghly College.

(3) Rajnarain Bose, senior scholarship holder, unemployed.

(4) Bhoodeb Mookerjee, ditto, ditto, ditto.

(5) Omesh Chunder Dutt, ditto, ditto, joined the Medical College

(6) Nurpendurnauth Tagore, junior, scholarship holder, ditto Union Bank.

—*General Report etc. for 1845-46 P. 32.*

* এখানে রাজনারায়ণের স্মৃতিবিভ্রম হইয়া থাকিবে, প্যারীচরণ সরকার রাজনারায়ণের উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন।—লেখক।

পর আদ্যরস হাটখোলার দত্তদিগের বাটীতে হয়।…একুশ বৎসর বয়সে আমার আদ্যরস হয়।

"ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়।… স্বর্গীয় অভয়াচরণ দত্ত মহাশয় আমার শ্বশুর ছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে বড় মানুষ ছিলেন।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য

"কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে অমি সংশয়বাদী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর ও আমার পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হইল।…

"যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক বন্ধুদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি। সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।…ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।…কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্র বাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি, যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয়

ভাগে ইতিহাস পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলনের অনেক দিন পূর্ব্বে লিখি। দেবেন্দ্র বাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন।...

"ব্রাহ্মসমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্গাচরণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই।...উপনিষদের অনুবাদকের কার্য্য করিবার সময় দেবেন্দ্র বাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। .

"আমার কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ যথাক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ তরজমা করি। উক্ত অনুবাদ প্রশংসাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।...

"দেবেন্দ্র বাবু আমাকে ইংরাজী খাঁ বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গলা ভাল জানি বলিয়া তিনি জানিতেন না। এক দিন আমার প্রথম বক্তৃতা—যাহার প্রথমে 'এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবী অবলোকন করিলে' এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা রচনা করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর তাকিয়ার নীচে রাখিয়া বাসায় চলিয়া আসি। তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু কি না মনে করিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার পর দিন স্পন্দায়মান

হৃদয়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আ[illegible] নিকট ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত! সেই অবধি বক্তৃতার পর বক্তৃতা সমাজে আমা দ্বারা করা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত (সে সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন) তাঁহার বক্তৃতা জ্ঞানপ্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতা সকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা করিতে যে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার একটি কারণ আমার পারশি শিক্ষা।...

"[কার ঠাকুর কোম্পানির পতন হেতু] দেবেন্দ্র বাবুর আয় হ্রাস হওয়াতে ও তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের জন্য অধিক লোক [illegible]পালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি ১৮৪৮ সালের প্রথমে সমাজের [illegible]র্য্যালয়ের সহিত (সমাজের কার্য্যের সহিত নহে) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই, তাহার পর দেড় বৎসর বসিয়া থাকি। এই সময়েও পিতৃতুল্য দেবেন্দ্র বাবু আমাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেন।"

রাজনারায়ণ যখন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাহারই মধ্যে কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে খ্রীষ্ট[illegible] বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়* [illegible]মে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই সময়ে কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের ইন্‌সপেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

* এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে' দ্রষ্টব্য।

বাংলা ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃতা

রাজনারায়ণের বাংলা বক্তৃতার কথা এইমাত্র বলা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে (বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃ.৯৩) লিখিয়াছেন :

রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহে শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অসাধারণ মমত্বের সঙ্গে রাজনারায়ণ আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন এবং স্বদেশের উন্নতি সাধনের পক্ষে ইহা যে অত্যাবশ্যক, এ কথা তিনি গত শতাব্দীর চতুর্থ দশক হইতে বক্তৃতা ও লেখনী পরিচালনা দ্বারা স্বদেশবাসীর মনে বদ্ধমূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ ১৮৪৮, ১লা জুন হেয়ার স্মৃতি-সভায় স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বক্তৃতাটি ঐ সনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৭৭০ শক) প্রকাশিত হয়। ইহার পর রাজনারায়ণ ১৭৭৮ শকের (১৮৫৬ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ এবং ১৭৯৮ (১৮৭৬ খ্রীঃ) শকের কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় এ বিষয়ে আরও দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

"জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সহিত্যের উন্নতি সাধান আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। স্বদেশীয় ভাষানুশীলন সম্বন্ধে আমরা অনেক দিন হইল এই পত্রিকায় উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের লেখা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি যাঁহাদিগের অনাদর ছিল, ঐ প্রস্তাব প্রকাশ করিবার পর তাহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতি অনেক পরিমাণে সেই অনুরাগেরই ফল।"

১৭৭৮ শকে লিখিত প্রবন্ধেও রাজনারায়ণ এই মতের কথা বলিয়াছিলেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক *Captive Ladie's* এক খণ্ড ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু গৌরদাস বসাক মারফত কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি জে. ই. ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে (বেথুন) উপহার প্রদান করেন। বীটন সাহেব ১৮৪৯, ২০এ জুলাই গৌরদাসকে একখানি পত্রে লেখেন যে, ইংরেজীর পরিবর্ত্তে মাতৃভাষাতেই প্রত্যেকের কাব্যাদি রচনা নিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। রাজনারায়ণ ইহার এক বৎসর পূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছিলেন। এই অত্যাবশ্যক রচনাটি শত বর্ষ যাবৎ সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে, তাঁহার কোন পুস্তকে ইহা প্রকাশিত হয় নাই। মাতৃভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন দিক্ হইতে তিনি যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, আজিও তাহার গুরুত্ব সমধিক অনুভূত হইবে। এই জন্য বক্তৃতাটির মূল অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। বঙ্গভাষার অনুশীলনে সরকারী ঔদাসীন্য এবং প্রতিবন্ধকতার কথাও বলিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই:

"এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? অদ্যাবধি কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে? ইহা সত্য যে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছে, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাঁহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই

বা কত? বর্ত্তমান কোন পত্র সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চ-বিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এ দেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

"ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পর ভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা এ কথা কহেন তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড-ভূমি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনাদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কত দূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে।

"মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপটিক তাহা এইক্ষণকার দুই শত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদের অধিকার কালে যে সকল নগর গ্রীকনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু

সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংস্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এইরূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্যরূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতীভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থা[illegible] হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্[illegible]থা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এ মনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

"আমারদিগের দেশ ভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল [illegible]ণ্ডীয় লোক পূর্ব্ব পক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত পূর্ব্বো[illegible]ক্ত যুক্তি সকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে 'সেই বাঞ্ছিতকাল কোন্ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।' হা। ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের

বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্তপ্রমোদকারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমার-দিগের ইংরাজী ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না।—সে যে কি দুর্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার! ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যকও বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর? কোন্ বৎসর তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্মভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? এই কলিকাতা নগরীর বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন। পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাঁহাদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছেন? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্বক শিক্ষা করেন; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? পূর্ব্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম্ম ছিল? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল?

এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের বিষয়। ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সাধারণত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থ কর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশে॰ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী। নেবোরের রোমান্ ইতিহাস ও থরল্ ওয়ালের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে? এসিয়াটিক রিসার্চ্চ ও এসিয়াটিক সমাজের জর্নেল গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?

"যাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা? ইহা কি তাঁ॰রদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য ॰দনা বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্‌ঘাটন করেন? বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী ও ইংরাজী বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়—প্রেমামৃত রস সাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি,

যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধি সহিত সুহৃদ্ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই—যে নাম চিন্তামাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! 'কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন' কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয় যে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'? বীর্য্যবান্ গ্রীক জাতি ও জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্ত্তি পাণ্ডুপুত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজ-পুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে। সেক্‌সপিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয়

বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্য্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে! হোমর ও বর্জ্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন, এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্ম্মাণ, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সূচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?

"যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্দেশ্য; তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র সে স্থানের ভাষা, যে ভাষায় আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণ লেখকের কোন মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পর ভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী

পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্ট রূপে প্রচার ছিল, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফেরদোষী আত্ম ভাষাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরসস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনাদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি সুযশস্বী গ্রন্থকর্ত্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জ্জিল ও হোরেস, এবং লিবি ও সিসিরো ইঁহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণি দেশেতে কীর্ত্তিমান্ ফ্রেডারিক রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতাদ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে যত দিন নর্মান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতা সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত

সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎ খণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধ কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল ও ফ্রা[illegible] প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপ খণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্ম ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্ম সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেত্তারা আত্ম ভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমারদিগ[illegible] গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত [illegible]ব সকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমার[illegible]গের দেশ ভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক্ সম্ভব; কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either.

—Sir W. Jones' Work

"অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ! আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে

সর্ব্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন ও লাক, নিউটন ও লাপ্‌লাস, কুবিয়র ও হম্বোল্‌ট প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্ম ভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ব্ব বিবেচনাতে দেশ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক্‌রূপে উপার্জ্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্ত্তমান দেশ ভাষা সকলেরও আকর স্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশ ভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষ এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থিরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মাণ এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা আরও প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেন্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজকার্য্যের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কিরূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে

তাঁহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজকার্য্য দেশ ভাষাতে সম্পন্ন হইবে, আপনা হইতেই কত লোক আত্ম ভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন। যদি বল গবর্ণমেন্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন—অগ্রেই তাঁহারা শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে একশত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে। এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন, যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারালয়ের লিপি কর্ম্মচারী! জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজ-কার্য্যের এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যোগ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত একশত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টের লেশ-মাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের

অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির পৃথক বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ একশত বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতি তাঁহার-দিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই শিক্ষা নাই এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই অথচ তাহার কার্য্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক, কথা আর কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা যখন গবর্ণমেণ্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এ দেশে দেশ ভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র।* ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন— আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যাদান করা উচিৎ বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরু কার্য্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য্য সিদ্ধ হইবেক। ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশ ভাষার

* বাঙ্গলা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্ত তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।

উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অ[illegible] সুসম্পন্ন করুন এবং সম্যক্ যত্ন পূর্ব্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক, এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিরোধ আছে তখন [illegible] কার্য্য দ্বারা খণ্ডিত হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।"

বাংলা তথা দেশভাষার অনুশীলনে সরকারী ঔদাসীন্য ইহার পরেও বলবৎ ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচকে অভিনন্দন করিয়া "*L*" স্বাক্ষরিত এক ভদ্রলোক "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া"য় (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪) একখানি পত্র লেখেন। তিনি এই প্রসঙ্গে দেশভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা রাজনারায়ণের কথাই সপ্রমাণ করে। পত্রখানি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে প্রদত্ত হইল :

"While English Education is offered to all who have *time* and *opportunity,* the claims of the *masses* to Education through their own language, are recognized and the Calcutta Council of Education will not be entrusted any longer with the power of throwing *obstacles* in the way of popular enlightenment—during its twenty years of action it has had money for every sort of scheme connected with the Education of a few Baboos,—but it refused to carry out the magnificent plans of Mr Adam it misrepresented past experiments in Vernacular Eductation when it asserted the Government Vernaeular Education had failed in Ajmer, because the people did not flock to the schools, whereas the Agent sent there by Government was *unprovided for 10 years with any Vernacular books,* it stated the Chinsurah Vernacular system failed because Vernacular was not wanted,—but the Agent who had carried on the system most

sucessfully died, and his place was not suitably supplied. I need not refer to the Council's appointing a gentleman to draw up a list of Vernacular School books who did not know one word of the language. I am happy to say, however, that the Council has *of late* attended more to the Vernacular in their English Schools, but it is to be said more in sorrow than in anger that what obstructions the defunct Military Board threw to the roads and bridges of the country, similar ones have been thrown on popular Education by the Council of Education which will soon be a thing of the next—and I am sure the present members will be glad to be relieved for attending to questions on Vernacular Education to decide on which they possess neither leisure nor precious qualifications."

শিক্ষা-ব্রত

রাজনারায়ণ ১৮৪৯, ১২ মে সত্তর টাকা বেতনে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে কার্য্য করিবার সময় তিনি কলেজের ছাত্র ছাড়া বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেও ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। তিনি 'আত্মচরিতে' (পৃ. ৬২-৩ লিখিয়াছেন :

> আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত আমার নিকট অল্পবিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসীডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সব ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান।

সংস্কৃত কলেজে প্রায় দুই বৎসর কার্য্য করিয়া ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ

গ্রহণ করেন। এই পদ প্রাপ্তির সংবাদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরবর্তী ৪ মার্চ তারিখের এক পত্রে সরকারী শিক্ষা-বিষয়ক কমিটিকে জ্ঞাপন করেন:

I have the honour to report for the information of the Council of Education that Babu Rajnarain Bose resigned his post of the Second Master of the English Department in the Sanskrit College on the 22nd. ultimo having been appointed Head Master of the Midnapur School.

Sd./- Eswar Chandra Sarma.

রাজনারায়ণের সত্যকার শিক্ষাব্রতী-জীবন মেদিনীপুরেই আরব্ধ হইল। এখানে তিনি আঠার বৎসর শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া ১৮৬৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। শেষের দুই বৎসর শিরঃপীড়া হেতু তিনি ছুটিতে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এখানে মেদিনীপুর স্কুল সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৩৪ সালের নবেম্বর মাসে কয়েক জন উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় মাত্র আঠার জন ছাত্র লইয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। [illegible] বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র রসিকলাল সেন এ সময়ে ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৬, ৯ জুলাই এফ. টীড মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তিনি এখান হইতে বদলী হইয়া ৯ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে ঢাকা কলেজে গমন করেন। তাঁহার স্থলে ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে সিন্‌ক্লেয়ার মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন। প্রায় আড়াই বৎসর কাজ করিবার পর ১৮৫০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।* সিন্‌ক্লেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার এই পদে রাজনারায়ণ বসু নিয়োজিত হইলেন। টীড ও সিন্‌ক্লেয়ারের সময়ে, ১৮৪৪-৮ এই পাঁচ

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭২৬-৭।

বংসর সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।*

রাজনারায়ণ তাঁহার আত্মচরিতে টীড ও সিন্‌ক্লেয়ার সাহেবের উল্লেখ করিয়াছেন। উঁহাদের সময়ে বিদ্যালয়ের কার্য্য কতকটা গতানুগতিক ভাবেই চলিয়াছিল। রাজনারায়ণ ইহার কর্ণধার হইয়া অল্পকাল মধ্যেই ইহার রূপ বদলাইয়া দিলেন। ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিল, শিক্ষক-সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্বে যেখানে সরকারী কলেজ বা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইত, সেখানে স্থানীয় পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী ও মান্যগণ্য বাঙালীদের লইয়া 'লোক্যাল কমিটি' গঠিত হইত। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ এই কমিটির উপর স্কুল বা কলেজের পরিচালন-ভার অর্পণ করিতেন। কমিটির রিপোর্ট সরকারী রিপোর্টের অঙ্গীভূত হইত। রাজনারায়ণ উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির উপরে মেদিনীপুরস্থ কমিটির ইউরোপীয় সভ্যদের দরদের অভাব দেখিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। আত্মচরিতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যহীনতার কৌতুকপ্রদ কাহিনীও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি কমিটি রাজনারায়ণের কৃত কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদা সশ্রদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন এবং তাঁহারা শিক্ষা-বিভাগে যে-সব রিপোর্ট পাঠাইতেন, তাহাতে তাঁহার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা থাকিত। সরকারী রিপোর্টে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ সালের রিপোর্টে 'মেদিনীপুর স্কুল' অনুচ্ছেদে পাই :

Midnapore School. "The Headmaster Baboo Rajnarain Bose has been connected with the School since the year 1851. The Committee consider him a very zealous officer taking much pains with his boys in his Class and always watchful over the interests of the School, By his exemplary conduct and his attention to the interests of the School he has gained for it a high reputation among the inhabitants of the district who are now showing their appreciation of the benefit of a sound English education.

* সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', পৃ. ৬, ৮।

The School appears to have flourished under the management of Baboo Rajnarain Bose." (Appendix A, p, 307).

১৮৫৮-৫৯ সালের রিপোর্টে আছে :

"To this may be added that the Head Masters of Midnapore, Cuttack and Pooree Schools have introduced meetings for discussion on educational and literary subjects, in which the other Teachers and pupils of the first class have a share." (Report of the Inspector of the Schools, South-west Bengal, E. Roer. Appendix A, p. 104).

কটক ও পুরী স্কুলের ন্যায় মেদিনীপুর স্কুলেও ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে সাহিত্যাদি আলোচনার জন্য বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ছাত্রদের পরীক্ষার ফলও ভাল হইতে লাগিল। উক্ত রিপোর্টেই উল্লিখিত হইয়াছে :

"The results of the examination on the whole cannot, the Committee think, but he considered as satisfactory shewing that the instructive staff have paid attention to, their laborious work. Baboo Rajnarain Bose, the Head Master, is entitled to the especial thanks of the Committee, for his excellent management of the School, which appears just now to be in as flourshing a condition as could be expected......" (*Ibid* p. 319).

এই সনে মেদিনীপুর স্কুলে যে-সব উন্নতিমূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহারও একটি তালিকা রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে :

"Among the improvements introduced during the session may be noticed....

1. The adoption of the rules as laid down in the Report of the School Committee for the improvement of Schools bearing on the general management and dicipline of Schools. These rules are working well and bear evident marks of improvement over old ones.

2. The introduction of a system of discussion on a given subject amongst themselves conducted by the boys in the presence of the masters. An hour devoted to the subject once or twice a week cannot but be very profitably spent.

3. Extra studies requiring the boys to study a given book not comprised in the class course and giving marks for the same.

4. With a view to indicate habits of benevolence and a desire to help the poor, a little subscription at the rate of a pice or two from such boys and masters as are able and willing to pay, is raised monthly from which the descrepit and old are paid. (*Ibid*, p. 320).

মেদিনীপুর স্কুলে বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। উপরের তালিকায় বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আরও তিনটি বিষয়ের কথা জানিতে পারিতেছি। ইহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ের সহিত ছাত্রগণ সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। (১) পাঠ্য পুস্তক ব্যতিরেকে প্রতি ছাত্রকে অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হইত এবং পুস্তকের বিষয়-বস্তুর উপর পরীক্ষা লইয়া তাহাতে নম্বর প্রদত্ত হইত। (২) ছাত্র ও শিক্ষকগণ মিলিয়া একটি দরিদ্রভাণ্ডার খোলা হয় এবং বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত লোকদের ইহা হইতে সাহায্য দেওয়া হইতে থাকে। ইহার পর বৎসরের রিপোর্টে (১৮৫৯-৬০) রাজনারায়ণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে:

"To the Head Master particulary the thanks of the Committee are due for his vigilance and attention to duties, and unwearied exertions to advance the interests of the School. Which seems to be in as prosperous and healthy a condition as could be wished. The school is daily rising in the estimation of the people of the district, the poorer portion of whom actually yearn for instruction in it. Notwithstanding the establishment within the session of a Missionary school in the Town, which admits boys gratis, there are numerous new applications every month for admission into our school. It now numbers 202 boys on its rolls, being 44 more than at the end of the session preceding."
(Appendix A, p. 226).

রাজনারায়ণের প্রযত্নে তখন মেদিনীপুর স্কুলের এত উন্নতি ও খ্যাতি

হইয়াছিল যে, দরিদ্র ছাত্রগণ মিশনরী স্কুলে বিনা বেতনেও পড়িতে না গিয়া এখানে আসিয়া ভিড় জমাইত। এ বৎসর স্কুলের ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা চুয়াল্লিশ জন বৃদ্ধি পায় এবং মোট দুই শত দুই জনে দাঁড়ায়।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বিদ্যালয়ের বাহিরে জনসাধারণেরও শিক্ষক ছিলেন। তাহাদের উন্নতি ও মঙ্গলার্থে মেদিনীপুরে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যত প্রকার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশেরই মূলে ছিলেন মনস্বী রাজনারায়ণ। মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাজনারায়ণ। তিনি ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহা সংগঠনে যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিয়াছিলেন।* মেদিনীপুরে শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্ম্মাণ সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' (২২ জুন ১৮৬০) লেখেন:

অপরত্র কতকগুলি কৃতবিদ্যের উৎসাহবলে শ্রমজীবীদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটি "নাইট স্কুল" সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।...

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর যত্নে এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্ম্মিত হইয়া ইহার কার্য্য অতি উত্তমরূপে চলিতেছে। এবং একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা এখানে ব্রাহ্মের সংখ্যা অধিক, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম অতি অল্প।

এই উদ্ধৃত শেষাংশে উল্লিখিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন:

মেদিনীপুরে, আমি গত শ্রাবণ মাসে [জুলাই-আগস্ট ১৮৬২] উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজ অবলোকন পূর্ব্বক ও ব্রাহ্মদিগের

---

* রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক রচিত এই লাইব্রেরী সংক্রান্ত স্মারকলিপি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৪, মে সংখ্যা 'The Modern Review' তে (পৃ. ৫২৭) প্রকাশিত করিয়াছেন।

মধ্যে পরস্পর প্রণয় ভাব সন্দর্শন করিয়া অতীব তৃপ্ত হইয়াছি। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজ ১৭৬৮ শকে কোননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের দ্বারা স্থাপিত হয়। তাঁহার মেদিনীপুর হইতে কর্ম্মানুরোধে অন্যত্র গমন হইলে সমাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তথায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অবস্থিতি হইলে তাঁহার দ্বারা ১৭৭৩ শকে পুনরুদ্ধৃত ও উদ্দীপ্ত হয়। সম্প্রতি গত বৎসরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে একটি ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা সময়ে বেদী হইতে উপদেশ দেন এবং তাহার পূর্ব্বে এক অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য ও আর একজন অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পাঠ করেন, অবশেষে ব্রাহ্মসঙ্গীতও হয়...। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিনয় গুণে সকলে একমনা হইয়া সমাজের সাহায্য বিধান করিতেছেন। দৃঢ়ব্রত রাজনারায়ণ বসুর যত্ন ও পরিশ্রমে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন উন্নত বেশ ধারণ করিতেছে। তথাকার সকল ব্রাহ্মেরাই তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহারা মনের সহিত শ্রদ্ধা করেন।...তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে মোহমুগ্ধ মেদিনীপুরে যে জ্ঞানালোক প্রকাশ হইয়াছে, যে ধর্ম্মামৃত বর্ষিত হইয়াছে, তাহা আর যাইবার নহে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইবে। এই আশার ভিত্তিভূমি তথাকার ব্রাহ্মবিদ্যালয়। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—কার্ত্তিক, ১৭৮৪ শক)।

রাজনারায়ণ একান্ত ভাবে মেদিনীপুরকেই নিজ কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে অবস্থিতিকালে বিবিধ জনহিতকর সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার কোন কোনটির উদ্দেশ্য সুপ্রচারিত

হইয়া বঙ্গের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষণ ও পোষণে বিশেষ সহায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ সুদক্ষ শিক্ষাব্রতী ও দূরদর্শী সমাজসেবিরূপে তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নয়ন বা নিয়োগের জন্য একাধিক বার সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। মেদিনীপুরবাসীরা রাজনারায়ণের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অবসর গ্রহণের সংবাদ পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে কানপুরে [তখন রাজনারায়ণ স্বাস্থ্যলাভোদ্দেশ্যে কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন] ১৮৬৯, ২৯ মার্চ্চ একখানি মানপত্র প্রেরণ করেন। মেদিনীপুর স্কুল এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দ্বারা কিরূপ উপকৃত এবং উজ্জীবিত হইয়াছিল, ইহাতে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। মানপত্র হইতে নিম্নে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। মেদিনীপুরবাসীরা লেখেন ঃ

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যত দূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি আপনার পদের কার্য্য যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতেই এ স্থানের মহোপকার সাধিত হইতেছে। আপনার আগমনের পূর্ব্বে এখানকার গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তৎকালে ছাত্রসংখ্যা অশীতি এবং শিক্ষক কেবল ছয় জন মাত্র ছিলেন। তখন ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এমন কি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ফোর্থ নম্বর রীডার পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি যে বৎসর আগমন করিলেন, সেই বৎসরই দুইটি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিন শতেরও অধিক এবং ইংরাজী শিক্ষক নয় জন ও পণ্ডিত দুই জন হইলেন।

আপনার সময়ে বহু ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি বিদ্যালয়টিকে সম্যক্ উন্নত করিয়া এ দেশে জ্ঞান ও সুনীতির বহুল বিস্তার সাধন করিয়াছেন।

আপনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমুদায় চিন্তা বিনিয়োজিত করিয়া নিরস্ত হন নাই। যত প্রকারে মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে, তৎসমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যত্নশীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই সকল উপায় ফলোপধায়ী হয়, তজ্জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন।

অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিক বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান-নিবারণী সভাও আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন, এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভমেন্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরবসম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপাসনা দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।

...আপনার অপ্রতিহত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এখানে ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত, সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আপনার অবস্থানকালে মেদিনীপুরে যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে—রাজভক্তি বা দেশানুরাগের যে সকল উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বা গত দুর্ভিক্ষকালে

অথবা তাদৃশ অন্যান্য সময়ে মেদিনীপুরের অন্নরাশি ও [illegible] যে সার্থকতা হইয়াছে, সে সমস্ত কেবল আপনারই উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা দ্বারা সম্পাদিত। মেদিনীপুরের সমুদায় শুভকর কার্য্যে আপনি মূল মস্তকস্বরূপ ছিলেন। (আত্ম-চরিত, পৃ. ১২৪-৫)।

সুরাপান-নিবারণী সভা

উপরের উদ্ধৃতিতে যে সকল সভা-সমিতির নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে, সুরাপান-নিবারণী সভা ও জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। ইংরেজী শিক্ষার আওতায় পড়িয়া নব্য শিক্ষিতেরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অঙ্গ জ্ঞানে সুরাপান আরম্ভ করিয়া দেন। ক্রমে ইহা সমগ্র বঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহার ফল বিষময় হইয়া উঠে। রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজহিতৈষিগণ মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধে অবহিত হইলেও ইহা নিবারণকল্পে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা সুরু হয় গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক হইতে। কলিকাতায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এ উদ্দেশ্যে একটি সমিতি স্থাপন করেন। কিন্তু ইহারও তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুরে এ জন্য সভা স্থাপন করেন। সভার নামকরণ হয় সুরাপান-নিবারণী সভা। তিনি আত্ম-চরিতে (পৃ. ৮৩-৫) এ বিষয়ে লিখিয়াছেন। তল্লিখিত 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি'র অন্তর্ভুক্ত নিম্নের বিবরণটিও এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করিতেছে :

"২২ ফাল্গুন [১৮০১] পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পান দোষের প্রাবল্য ও মদ্যপান জন্য সভ্যতাভিমান ও ইংরাজী ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমাকর্ত্তৃক সুরাপান-নিবারণী সভা সংস্থাপন ও তজ্জন্য তথাকার মাতালদিগের দ্বারা আমার বিলক্ষণ পীড়ন এই সকল বিষয়ে

ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গল্প হইল। এই সভা বঙ্গদেশে স্থাপিত প্রথম সুরাপান-নিবারণী সভা। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার কর্ত্তৃক কলিকাতায় ঐরূপ সভা সংস্থাপন হইবার পূর্ব্বে উহা সংস্থাপিত হয়। ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্রে লিখিত ছিল যে, পরিমিত মদ্যপান করা কেমন, না বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। ঐ ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। মেদিনীপুরে এই সুরাপান-নিবারণী সভা জন্য আমার যত পীড়ন হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য তত হয় নাই। এক্ষণকার কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সভার সভাপতি হারিসন সাহেব তখন মেদিনীপুর ও অন্যান্য দেশের স্কুল-ইনিস্পেক্টর ছিলেন। মেদিনীপুরের মাতালেরা তাঁহার নিকট আমার দুর্নাম করিয়া একটি দরখাস্ত করে। তাহাতে আমার সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইংরাজী প্রয়োগ ছিল 'He is a fanatic' অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি। মাতালেরা এ দরখাস্তে বলিয়াছেন, আমি সমস্ত দিন স্কুলে ছাত্রদিগকে না পড়াইয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি। কিন্তু বস্তুত: এ কথা সম্পূর্ণরূপে অমূলক। স্কুলের সময় আমি ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রসঙ্গই করিতাম না। ঐ সময়ের কলিকাতাবাসী পরলোকগত তখনকার হিন্দুসমাজচূড়ামণি বঙ্গদেশের প্রথম কে. সি. এস. আই. (রাজা রাধাকান্ত দেব) এর পৌত্র মেদিনীপুরের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাকে আমার দলে আনাতে মাতালেরা আমার উপর বিশেষ চটিয়া ছিল, যেহেতু তাঁহার বাসা তাহাদিগের বিশেষ আড্ডা ছিল। তিনি যখন মদ্যপান পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করিয়া আপনার সহধর্ম্মিণীকে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমাকে লক্ষ টাকা দিলে যত না অমি সুখী হইতাম, এই ক্ষুদ্র কাগজটি দেওয়াতে আমি তদপেক্ষা সুখী হইলাম।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—শ্রাবণ ১৮০৫ শক)

জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা

জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভার অপর নাম জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা। রাজনারায়ণ এই সভাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে যে স্বাদেশিকতার প্রস্রবণ ছুটিয়াছিল, এই সভায় অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর মধ্যে তাহার মূল পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

> এই সভার কার্য্যবিবরণ হইতে 'Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal' রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন।...জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা 'good night' না বলিয়া সুরজনী বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন ; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত, তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।" (আত্ম-চরিত, পৃ. ৮৩)

সভার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহার সুফলপ্রসূ বহুদূরপ্রসারী কার্য্যাবলীর সামন্যই আভাস পাওয়া যায়। মেদিনীপুরে অবস্থানকালেই রাজনারায়ণ সভার কার্য্যকে ভিত্তি করিয়া উক্ত Prospectus বা অনুষ্ঠান পত্র রচনা করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে *National paper*-এ ইহা মুদ্রিত হয়। তথা হইতে চৈত্র ১৭৮৭ শকের (মার্চ্চ-এপ্রিল ১৮৬৬) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ইহা হুবহু উদ্ধৃত করেন। ইহা হইতে আমরা

জানিতে পারি, অন্যূন আশী বৎসর পূর্ব্বে একজন বঙ্গসন্তানের মনে সাজাত্যবোধ কিরূপ পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের জাতীয়তা সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই তবে যে উহা সার্থক হইবে, ইহার মধ্যে তাহা অত্যন্ত প্রকট। ইহাতে মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি রাজনারায়ণ স্বদেশবাসীদের মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন: স্বদেশীয় ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিদ্যা, ইংরেজী শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বেই বালক-বলিকাদের যথোপযুক্তরূপে মাতৃভাষা শিক্ষা দান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলন, বাংলা শব্দ ব্যবহার দ্বারা কথোপকথনে ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাংলা ভাষায় পরস্পরকে পত্র লেখা, বাঙালীর সভাতে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এ দেশে যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কারকার্য্য সম্পাদন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রমুখ স্বদেশীয় সুপ্রথাসকল রক্ষা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার সম্পূর্ণ বর্জ্জন, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতি।

এই অনুষ্ঠানপত্রখানি প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই 'নেশানাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র উক্ত বিষয়সমূহ কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য হিন্দু মেলা (চৈত্র বা জাতীয় মেলা নামেও পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মেলার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নাম হইল নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন:

> "শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দু মেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।

উহা আমার প্রস্তাবিত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।" (আত্ম-চরিত, পৃ. ২০৮)

এই অনুষ্ঠানপত্রখানি মৎপ্রণীত "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে হুবহু মুদ্রিত হইয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ

মেদিনীপুরে কর্ম্মত্যাগের কিছুকাল পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৭০-৮০, এই দশ বৎসর বাঙালী-জীবনের এক গৌরবময় যুগ। স্বদেশের উন্নতিকল্পে বহুমুখীন কর্ম্মপ্রণালী বাঙালী-প্রধানগণ কর্ত্তৃক এই সময়ে অনুসৃত হইয়াছিল। এই সব কর্ম্মধারার উদ্গাতা এবং কর্ম্মিপ্রধানের অগ্রণীস্থানীয় ছিলেন মনস্বী রাজনারায়ণ। বসু মহাশয় আত্মজীবনীতে এ সমুদয়ের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহাকে ভিত্তি করিয়া সমসাময়িক পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকাদির সাহায্যে তাঁহার কার্য্যাবলীর পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভবপর।

রাজনারায়ণের কর্ম্মশক্তির উপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিসীম আস্থা ছিল। তিনি রাজনারায়ণের উপর যেমনটি নির্ভর করিয়া চলিতে পারিতেন, এমনটি বোধ হয় আর কাহারও উপর পারিতেন না। তাই তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দেই রাজনারায়ণকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে অধিক আহ্লাদ আর কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া আছি।"* রাজনারায়ণ কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিয়াই মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে কায়মনে যোগদান করেন। তিনি এত দিন

* পত্রাবলী, পৃ. ৮৫-৬

কলিকাতার বাহিরে থাকিলেও বরাবর ইহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, কাজেই স্বল্প কালের মধ্যেই তিনি ইহার কর্ম্মধারার সঙ্গে নিজেকে ওয়াকিবহাল করিয়া লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টী। ট্রাস্টীর ক্ষমতাবলে তিনি ১৭৯২ শকের মাঘ মাস (জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১) হইতে অন্যান্যের সহিত রাজনারায়ণকেও ইহার অধ্যক্ষসভায় গ্রহণ করিলেন। প্রথম হইতেই রাজনারায়ণ ইহার সভাপতির কার্য করিতে থাকেন। তিনি যোগ্য সহকর্ম্মিরূপে পাইলেন মহর্ষির পুত্র যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে ১৭৯১ শকের প্রারম্ভেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৭৯২ শকের মাঘ হইতে ১৮০৬ শকের ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তিনি একভাবে এই কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। রাজনারায়ণের প্রভাব তাঁহার এবং কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর কিরূপ পড়িয়াছিল, তাহা পরে আলোচ্য। কলিকাতার বাস তুলিয়া দিবার পরেও, রাজনারায়ণ আমরণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হাইকোর্টের উকীল ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধি-সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণের কলিকাতায় বসতি স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে আলোড়ন উপস্থিত হয়। কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের মধ্যে নরপূজা ও অবতারবাদের সূচনা দেখিয়া রাজনারায়ণ ইহার বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্মবিবাহ যাহাতে আইনসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সরকার কর্ত্তৃক আইন প্রণয়ন করানো সম্পর্কে একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কেশব-চন্দ্র সেন এই বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদের একটি সভা আহ্বান করিয়া এ বিষয়ে মতামত লইবার জন্য এক কমিটি গঠন করেন।

আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে কমিটির সভ্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। হিন্দু সাধারণের মধ্যেও ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলে। এ সকল কারণে এ বিষয়ের আলোচনা কিছু কাল স্থগিত থাকে। কিন্তু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য একটি সংশোধিত প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করিলেন। এবারে আদি ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী হইয়া এরূপ আইন-প্রণয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন এবং সভা-সমিতি করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মবিবাহ সংস্কৃত হিন্দু বিবাহ ছাড়া আর কিছুই নহে, এরূপ ঘোষণা করিয়া 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' এই নামকরণে তাঁহারা বিশেষ আপত্তি তুলিলেন। সরকার এই আপত্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' এই নামের পরিবর্তে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে ১৮৭২ সালের প্রথম দিকে উক্ত বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইনটি ১৮৭২ সালের তিন আইন নামে পরিচিত।

এই আইন যে দিন ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ হয় সে দিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু পরিদর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এদিনকার সভার কৌতুককর বর্ণনা তিনি আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেশব-প্রবর্ত্তিত বিবাহ-আইন আন্দোলনের বিরুদ্ধেও রাজনারায়ণ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং ইহার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে পৌরোহিত্য করিয়া স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য-প্রচারে তিনি অতঃপর সবিশেষ অবহিত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও এই সময়কার আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপ্রণালী-বিষয়ক বক্তৃতাসমূহ ইহা প্রকৃষ্টরূপেই সপ্রমাণ করে।

১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে রাজনারায়ণের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মবোধিনী

সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য "ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোকেদের ব্রহ্মধর্ম্ম উপদেশ করা।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন। সভার অধীনে একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় রবিবারে সভাপতি রাজনারায়ণ ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্য দুই রবিবারে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিতেন।* সভা পল্লী অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার কার্য্যক্রম ও পরিণতি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন :

> [১৭৯৩] শকে [১৮৭২] সালে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা স্থাপন করি। আদি ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের Trust Deed অনুসারে উহা এখন দস্তুরমোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারে না...আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রচার কার্য্যের কোন সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য আমি ঐ সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের লোক সভার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী। ইনি দিন কতক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয় ভাব রক্ষা পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর নানা কারণ বশতঃ আর অধিক দিন সভা টেকিল না। সেই সকল কারণের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔদাসীন্য একটি কারণ। কেশব বাবু আদি সমাজের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অবধি তিনি কেমন ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৯৩, বৈশাখ ও মাঘ ১৭৯৪ শক দ্রষ্টব্য

আমাদিগকে বলিতেন আমাদের এক্ষণে দুই মাত্র কার্য্য—আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রতি বুধবার নিয়মিত উপাসনা করা এবং প্রতি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা।*

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী এক দল ব্রাহ্মের সহিত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দেই কেশবচন্দ্র সেনের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। ইঁহারা কিছুকাল উক্ত সমাজমন্দিরে না গিয়া স্বতন্ত্র গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা করেন। রাজনারায়ণ এই সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আত্ম-চরিতে (পৃ. ১৯৬-৭) তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আষাঢ় ১৭৯৪ শক) লেখেন :

> জনরব এই যে, যে সকল ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় ঐ সমাজের সঙ্গে মিলিয়াছেন কিন্তু এ জনরব অমূলক। নূতন সমাজের অধিকাংশ সভ্য এরূপ করেন নাই; অল্পসংখ্যক সভ্যই এরূপ করিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ হইল শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। স্থূল বিষয়ে ঐক্য থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনৈক্য সত্ত্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজ অন্য সমাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

উক্ত বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বহু-আলোচিত কুচবিহার-বিবাহের পর। তখন কেশব-বিরোধী প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই নানা বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মদের মত ও উপদেশ যাচ্ঞা করিতেন। সকল বিষয়েই রাজনারায়ণের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রখর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসীর জাতীয় ধর্ম্ম, ইহাকে জাতীয় রূপ দেওয়াই যে সকল ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য, এ কথা তিনি

* আত্ম-চরিত, পৃ. ১৯৩-৪

বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদের একাধিক পত্রে লিখিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে ১৮৭৮, ১৫ জুন এক পত্রে তিনি লেখেন :

"We should adopt a national form of divine worship, a national theistic text book and national ritual as far as all this could be done consistently with the dictates of conscience. We should renounce marked foreign customs and manners that we might have without much thought or reflection but innocently, adopted from Europeans but which are repugnant to the general feeling of the nation and by renouncing which we do not act against Brahmoism…

"W should conduct our reformatory movements in a national way so as to suit the tastes and ideas of the nation without compromising our Brahmo principle."

হিন্দু মেলা

এই সময়কার সাধারণ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনারায়ণের যোগ বিশেষ লক্ষণীয়। হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনারায়ণের ভাবধারা বিশেষ কার্য্য করিয়াছিল। ইহার প্রথম অধিবেশনেই (১৮৬৭ খ্রীঃ) পাঠের জন্য রাজনারায়ণ স্বগ্রাম বোড়াল হইতে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী দ্বারা রচিত "বঙ্গের পূর্ব্বমহিমা" শীর্ষক স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর মাঘ হইতে চৈত্রসংক্রান্তির মধ্যে সাড়ম্বরে এই মেলার সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। রাজনারায়ণ ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। এই মেলা প্রায় চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। প্রতি বৎসরই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি মেলায় পৌরোহিত্য করিতেন। ১৮৭৫, ১১ ফেব্রুয়ারি ইহার যে সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। তিনি লিখিয়াছেন :

১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য্য আমি সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্শিবাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদার সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয়। এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রাইচরণ রায় ব্যাঘ্র-শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীতক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

হিন্দু মেলা একটি সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। ইহার অধ্যক্ষতা করিতেন "নেশন্যাল সোসাইটি" বা জাতীয় সভা। এই সভার কার্য্য সম্বৎসর ধরিয়া চলিত। ইহার অধীনে একটি নেশন্যাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। সার্ভেয়িং, ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, এবং সঙ্গীতাদি শিক্ষারও এখানে ব্যবস্থা ছিল। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া জাতীয় সভার অধিবেশন হইত এবং প্রত্যেক অধিবেশনেই এক একজন প্রধান ব্যক্তি জাতীয় উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। বক্তাদের মধ্যে মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামাচরণ সরকার সীতানাথ ঘোষ, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি সুবিখ্যাত বক্তৃতা এই সভায় প্রদান করেন—"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা," ১৮৭২, ১৫ সেপ্টেম্বর; "সে কাল আর এ কাল," ১৮৭৩, ২৩ মার্চ্চ। ইহা ছাড়া "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" সম্বন্ধে ১১ই আগস্ট ১৮৭২ রাজনারায়ণ জাতীয় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিবিলিয়ান জন বীম্স ফরাসী দেশের ফ্রেঞ্চ একাডেমির ন্যায় বঙ্গদেশে একটি একাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ইহার উদ্দেশ্য—"সভ্যেরা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন, তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে

হইবে!" রাজনারায়ণ জাতীয় সভায় এই প্রস্তাবের বিপক্ষেই উক্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :

ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিয়ম সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। (আত্ম-চরিত, পৃ. ১৯৩)

অন্যান্য কার্য্য

রাজনারায়ণ ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেন। এ কারণ সমসাময়িক অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গেও তাঁহার যোগ দেখিতে পাই। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও অন্যান্য কলেজের পূর্ব্বতন ছাত্রবৃন্দের সামাজিক মেলামেশার (College Reunion) জন্য তিনি জগদীশনাথ রায় নামক হিন্দু কলেজের আর এক জন প্রখ্যাত সহাধ্যায়ীর সহযোগে একটি বাৎসরিক 'সম্মিলন' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৭৫ সালের ২ জানুয়ারি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরে 'মরকত কুঞ্জে'। এই অধিবেশনে রাজনারায়ণ "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" পাঠ করেন। এই সম্মিলন কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে যে "বিদ্বজ্জনসমাগম" হয় (১৮ এপ্রিল ১৮৭৪), রাজ-নারায়ণও তাহার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৭৬, ২৬ জুলাই Indian Association বা ভারত-সভা নামে রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়।

রাজনারায়ণ ইহার কর্ম্মকর্ত্তৃ-সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৭৮ সালে বিধিবদ্ধ বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হস্তারক আইনের প্রতিবাদেও তিনি তৎপর হইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের এ সময়কার আর একটি বড় কার্য্য—যুবক-মনে স্বদেশপ্রেমের উন্মেষসাধন-প্রচেষ্টা। রাজনারায়ণে স্বদেশপ্রেম যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মহর্ষির পরিবারে স্বদেশপ্রেমের স্রোত বহুকাল যাবৎ বহিয়া চলে। রাজনারায়ণ বসুর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার পুত্র যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই স্রোতে একেবারে গা ঢালিয়া দিলেন। ইঁহারা নিজের স্মৃতিকথায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী সভা'র কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশদভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ। মন্ত্রগুপ্তির সঙ্গে স্বদেশের উন্নতিমূলক বিবিধ কার্য্য সাধনের চেষ্টা ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধনেও সভা বিশেষ তৎপর ছিলেন।*

যুবক-মনে স্বদেশপ্রেম স্থায়ী ভাবে উন্মেষিত করিবার জন্য রাজনারায়ণ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়' স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (আশ্বিন ১৮০৩ শক) এক পত্র লেখেন। এই পত্রে আছে :

> ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'...ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমর প্রাণপণে যত্ন করিব। মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৬৪-১৭০ দ্রষ্টব্য।

যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না সেইরূপ হিন্দুসমাজই আমাদিগের কার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ শরীর, মন, সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে এমন কি, তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের আদি পুরুষ বৈবস্বত মনু হইতে রাজপুতনার বীরকুল-চূড়ামণি প্রতাপ সিংহের সময় পর্যান্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বন্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ একহৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্ম্মসঙ্গত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।

মহা হিন্দু সমিতি

রাজনারায়ণ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর চলিয়া যান। এখানেই তিনি আমরণ অবসর জীবন যাপন করেন। কিন্তু অবসরকালেও তিনি স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তায় বরাবর অবহিত ছিলেন। দেওঘরে বৎসরেককাল অবস্থানের পর তিনি হিন্দু জাতির উদ্দেশ্যে ইংরেজীতে একটি প্রস্তাব রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র ভারতের হিন্দু জাতির এক মহাসমিতি বা মহাসম্মেলন স্থাপন করা ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রস্তাবটির বঙ্গানুবাদ 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে প্রকাশিত হয়, পরে মূল প্রস্তাব ইংরেজী পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনার

সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজনারায়ণ স্বয়ং পুস্তক প্রকাশ ও আন্দোলন আলোচনার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :

"আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সালে দেওঘরে আসি, আসিবার এক বৎসর পরে এই পুস্তিকা ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। অদ্য (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) তিন বৎসর হইল ঐ প্রস্তাব বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিয়া নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ করি। নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি উহার ইংরাজী মূল মান্দ্রাজ প্রদেশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরাজাগুডে নারায়ণ গজপতি রাও গারুর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে।...এই পুস্তিকা সকল শ্রেণীর হিন্দুই পছন্দ করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, দ্বারভাঙ্গার বাবু চন্দ্রশেখর বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই পুস্তিকার প্রশংসা করিয়াছেন।...ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহা হিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ।" (আত্ম-চরিত পৃ. ৯৪-৫)

বাংলা ইংরেজী নানা সংবাদপত্রেও এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতে থাকে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (কার্ত্তিক ১৮০৮ শক) লেখেন :

"ভক্তিভাজন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবুর ইচ্ছা মহা হিন্দু সমিতি নামে এক হিন্দু সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। হিন্দু মধ্যে সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার উপাসকই এই সমিতিতে মিলিত হইতে পারেন। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করা এই সভার প্রধান লক্ষ্য হইবে।...

এখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বলে আমাদের অনেক উৎকর্ষ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ জন্মাবধি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন। বৃদ্ধ হিন্দু রাজনারায়ণ বসুর এই আশা যদি পূরণ হয় তাহা হইলে এই আদি ব্রাহ্মসমাজেরই অনেকটা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এই ঘোর বিপ্লবের সময় সভা সমিতি বা যে কোন উপায়েই হউক যিনি এই হিন্দু জাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম্ম রীতি রক্ষার সূচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক এদেশের একজন পরম বন্ধু। অনেকের সংস্কার ইংরাজী শিক্ষা দেশের উপকার অপকার দুই করিতেছে। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বৃদ্ধ হিন্দুর ন্যায় যিনি ইংরাজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশানুরাগের এইরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করেন আমরা তাঁহাকে রত্নের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

ইহার তিন বৎসর পরে মূল ইংরেজী *The Old Hindu's Hope* নামে প্রকাশিত হইলে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (৪ আগষ্ট, ১৮৮৯) লেখেন:

> "The scheme is exceedingly solemn in its character and Catholic in its spirit…The proposal gives rough details of how the Samiti is to be formed and worked, but these are subject to modification. Patriotism of the highest type pervades every syllable of old man's thoughts and utterances, and all who have the nation's good at heart would do will to consider the practicability of the proposal, which, if successfully carried out, is calculated to work a revolution in the temporal and spiritual economy of the Aryan Nation."

বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে তখনই কতকটা ফলও ফলিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন:

"আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সংবাদপত্রে আন্দোলন উৎপাদন দ্বারা বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্ম্মসভাকে ও বঙ্গদেশের অন্যান্য

ধর্ম্মসভাকে প্রধানতঃ মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী ও তৎপরে পশ্চিমের "ভারত ধরম্" মহামণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত করে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদের সংযোগে সংরচিত অভিনব সভা আমার প্রস্তাবিত মহা হিন্দু সমিতি বলা যাইতে পারে।" (আত্ম-চরিত পৃ. ৯৮)

শেষ জীবন

দেওঘর বৈদ্যনাথধাম হিন্দুদের, বিশেষ করিয়া প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। রাজনারায়ণ যত দিন দেওঘরে বাস করিয়াছিলেন তত দিন ইহা নব্যপন্থীদেরও তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এবং তিনি ঋষি আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি এখানে থাকিতে থাকিতে "সারধর্ম্ম," "তাম্বুলোপহার" প্রভৃতি রচনা করেন। স্থানীয় কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বাহিরের সঙ্গেও তিনি পত্রাদি দ্বারা যোগরক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজনারায়ণ অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন যে, তিনি শেষ জীবনে বাল্যবন্ধুদের একটি তালিকা করিয়া লইয়াছেন এবং প্রায়ই এক-এক জন সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি হইতে তাঁহাদিগকে বলিতেন। হিন্দু অহিন্দু, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলের তিনি শ্রদ্ধা প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। দেওঘরে অবস্থিতি কালেই ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (কার্ত্তিক ১৯২১ শক) এইরূপ লেখেন :

আমাদের এবং সমস্ত বঙ্গদেশের পরম শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রীতিভাজন মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বিগত ২ আশ্বিন সোমবার তাঁহার প্রিয় বঙ্গভূমি অন্ধকার করিয়া—তাঁহার প্রাণের পরিজনবর্গকে অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া এবং দেশবিদেশস্থ অগণ্য বন্ধুবর্গকে

হা হুতাশের নিরাশায় নিখিল জগতের জনকজননীর জ্যোতির্ম্ময় অমৃতধামে সমুত্থান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে আছে যে, "ঈশ্বরভক্তের হৃদয় কি মধুময়, কি কোমল; তাঁহার ধর্ম্মসাধন কি কঠোর"—ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দুর্লভ; কিন্তু ঐ দিব্যধাম-প্রয়াত মহাত্মাতে আমরা তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন মন সার্থক করিয়াছি। তাঁহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি শীলসৌজন্য এবং লোকের মন আকর্ষণের ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি উচ্চপদের রাজকর্ম্ম হাত বাড়াইলেই পাইতে পারিতেন; সাধারণ লোক-সমাজে তিনি একজন প্রধান দলপতির সিংহাসন পাইতে পারিতেন; কিন্তু সেদিকে তিনি যান নাই; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকেই জীবনের সার করিয়াছিলেন। সংসার-সাগরে তাঁহার ক্ষুদ্র দেহতরী রোগে জর্জ্জরিত হইতেছে—শোকের তরঙ্গে অনবরত আহত হইতেছে—কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা বিকৃত হইতে দেখি নাই। যাহাকে তিনি পাইতেন তাহার প্রতিই তিনি সৌহার্দ্দ-পাশ বিস্তার করিতেন—শত্রুতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। যখনই আমরা তাঁহার নিকটে শীতল হইতে গিয়াছি তখন আমরা তাঁহার প্রসন্ন বদনে স্বর্গীয় হাস্য দেখিয়াছি—অথচ তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার চারিদিকে শোকের বায়ু বহিতেছে। তাঁহার রোগাক্রান্ত মর্ত্ত্য শরীরের আড়াল হইতে কি যে এক অমূল্য স্বর্গীয় প্রেমময় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত তাহা সহস্র চেষ্টা করিয়াও লেখনী দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। যিনি দুই মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সৎসঙ্গের আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন তিনি আজীবন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন—তাহা মুখে বলিয়া অন্যকে বুঝানো তাঁহার সাধ্যাতীত। অতএব নবপ্রয়াত মহাত্মার আশ্চর্য্য অমায়িক অকৃত্রিম হৃদয়ের গুণসকল প্রকাশ করিয়া বলিবার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকা

ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাঁহার ঘরাও ভাবের অগণন গুণ—প্রবীণ বাল্যতা সরসতা মাধুর্য্য শীলসৌজন্য প্রভৃতি অশেষ গুণ বর্ণনা করিতে যাওয়া লেখনীর কেবল পণ্ডশ্রমই সার। তাহাতে আমরা ক্ষান্ত হইয়া—তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যাহা করিয়াছেন এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই যাহা করিতে পারিত না, তাহাই এক্ষণে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে মনের ভাব লাঘব করি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারে করুণাময় পরমেশ্বরের হস্ত জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সহসা আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম দিব্য ধীরে ধীরে জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল কেশবচন্দ্র তাহার মধ্যে অনর্থক একটা তুমুল গোলমাল এবং বিবাদ বিসম্বাদ প্রবেশ করাইলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐরূপ গোলমাল বিবাদ বিসম্বাদ বর্ত্তমান কালের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমাদের এই ভারতবর্ষের উপরে ইংলণ্ডের প্রতাপ কার্য্য করিতেছে;—নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছে। বাহিরে কোন গোলমাল নাই—ভিতরে তেমনি তুমুল গোলমাল চলিতেছে। এই গোলমালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের গোলমাল উত্থাপন করা আবশ্যক—দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের ধ্বনি নিনাদিত করা আবশ্যক। ব্রহ্মানন্দ যথোপযুক্ত সময়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়া স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে সেই কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা সেরূপ দক্ষতার সহিত সমাধা করিতে পারিবেন না। ব্রহ্মানন্দের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বর্ত্তমান কালের ঠিক উপযোগী। ব্রহ্মানন্দ যেমন কালোচিত তীব্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন—নবপ্রয়াত মহাত্মা তেমনি দেশোচিত মধুর ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের

প্রধান অস্ত্র কর্ম্মোদ্যম; নবতিরোহিত মহাত্মার প্রধান অস্ত্র হৃদয়ের মাধুর্য্য এবং প্রেম। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বদেশের নামে গলিয়া যাইতেন; একাল এবং সেকাল নামক পুস্তক যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস। তাঁহার এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহা আমাদের দেশের ঠিক উপযোগী। আমাদের জীবিতাবস্থাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের দুইটি প্রধান স্তম্ভ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন—উভয়েই পরম ভাগ্যবান্।...”

গ্রন্থাবলী ও রচনার নিদর্শন

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা। প্রথম ভাগ। ১৮৫৫।

“শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু, কলিকাতা ও মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল বক্তৃতা করেন সেই সমস্ত বক্তৃতা এক্ষণে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। যাহাঁরা সাংসারিক কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ দ্বারা সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে উক্তগ্রন্থ বিশেষ উপকারী, বিশেষতঃ যে সমস্ত তত্ত্বরসজ্ঞ গুণী ভগবদ্ভক্ত শ্রদ্ধা ভাবালম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বর প্রেমামৃত পান করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিতে পারিবেন, উহার মধ্যে এরূপ প্রস্তাব একটিও নাই যাহা পাঠ করিলে মনোমধ্যে পরমার্থ রসের সঞ্চার না হয়।” (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আশ্বিন ১৭৭৭ শক।—বিজ্ঞাপন।)

এই পুস্তক সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে (৬ ফাল্গুন) লেখেন ঃ

তোমার বক্তৃতা পুস্তক যাহা তুমি আমাকে উপহার দিয়াছিলে, সে দিন আমি তাহা দেখিতে দেখিতে আমার নয়ন ও মন তৃপ্তিরসে

আর্দ্র হইতেছিল, তোমার সে রচনা আর আমার নিকট পুরাতন হয় না। আদিম ঋষির রচনার ন্যায় তোমার এ রচনা। (পত্রাবলী, পৃ. ২৫)

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা। দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৭০।

এলাহাবাদ হইতে চারুচন্দ্র মিত্র ১৭৯২ শকে প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে লেখেন :

"রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর উক্ত মহাশয় দ্বারা যে সকল বক্তৃতা রচিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনুমত্যনুসারে একত্র সংগ্রহ করিয়া "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ" এই নামে প্রকাশ করিলাম। বোধ হয় ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। গোপগিরির প্রথম দুই বক্তৃতা ব্যতীত অন্য যে সকল বক্তৃতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল, তাহা পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে কখন প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকারের রচিত কতকগুলি ব্রহ্ম-সঙ্গীতও দেওয়া গেল।

রচনার নিদর্শন :

"গ্রন্থ-সকল কি অকপট মিত্র! তাঁহারা কখন পরোক্ষ নিন্দা করে না, তাঁহারা বাহ্যে সৌহার্দ্দযুক্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া মনেতে অপকার আলোচনা করে না। গ্রন্থ হইতে পৃথিবীর পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা মানুষের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা ও জ্ঞানের মহৎ মহৎ দৃষ্টান্তসকল প্রতীত হয় মনে কি মহত্ত্ব উপস্থিত হয়! সন্তাপ-নাশিনী মনঃ-শ্রী-প্রদায়িনী কবিতা আমারদিগের নেত্র ও আনন্দকে উল্লাসে কি সুশোভিত করে! বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা সৃষ্টির কার্য্য-সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞান হইলে কি বিশুদ্ধ আনন্দের সম্ভোগ হয়! ধর্ম্মোৎপাদ্য বন্ধুতা পবিত্র সুখের আর এক মহৎ কারণ। বন্ধুর সহিত

নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে কি বিশেষ সুখের উদ্ভব হয়? বন্ধুর সহিত সৃষ্টিকার্য্যের তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া কি আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়! বন্ধুকে স্বীয় দুঃখের কথা বলিলে মনের ভার কি পর্য্যন্ত লাঘব হয়! কোন দূর দেশে বন্ধুর নিকট হইতে পত্র প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে কত আনন্দের সঞ্চার হয়। কিন্তু স্বদেশোপকারের—পরোপকারের সুখের সহিত কি এ সকল সুখের তুলনা হইতে পারে? যিনি স্বদেশের প্রেমে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন, স্বদেশের হিতানুষ্ঠান-ব্রত পালনে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকেন, তিনি অতি পবিত্র, অতি রমণীয় সুখাস্বাদন করেন। নাগরূপী মিথ্যাপবাদের হলাহলপূর্ণ সহস্র মুখ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহার কি হইবে? তিনি কেবল সেই এক পরম পুরুষের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত সচেষ্ট, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হইলে কৃতার্থ হয়েন। স্বদেশ-প্রেমী আপনার দেশীয় ভাষাকে সুচারু করা এবং তাহাকে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন প্রস্তাব সকলের রচনা দ্বারা সুসম্পন্ন করা কি সুখদায়ক কর্ম্ম বোধ করেন। স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এবং সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য জাতি সমূহের মধ্যে এক অন্য জাতি হইবে এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করত সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।" (প্রথম ভাগ। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ। ১৭ ভাদ্র ১৭৬৯ শক)।

"প্রীতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে; প্রীতি দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর আপনার আনন্দ অন্যকে বিতরণ করিবার জন্য জীবের সৃষ্টি করিলেন, তিনি এক্ষণে সকলকে আপনার স্নেহগুণে বদ্ধ করিয়া জননীর ন্যায় সকলকে পালন করিতেছেন। প্রীতিতে আমরা জীবিত রহিয়াছি, প্রীতি আমাদিগের সকল উদ্বোধ, ভাব ও কার্য্যের

মূল ; প্রীতি দ্বারা আমাদিগের মন ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। প্রীতি নিরাকার পদার্থ। গাঢ় হস্তস্পর্শ, প্রফুল্লতর ঈষৎ হাস্য, অমৃতময় মধুর শব্দ বন্ধুর প্রীতি প্রকাশ করে ; কিন্তু সে সকল প্রীতি নহে, সে সকল অন্তরস্থ প্রীতির বাহ্য চিহ্নস্বরূপ ; প্রীতি স্বয়ং নিরাকার পদার্থ। প্রীতি নিরাকার পদার্থ কিন্তু জীবন, যৌবন, ধন, মন, প্রাণ সকলই উহার বশীভূত। প্রীতি সুখের সার, ও আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলই নীরস বোধ হয়, আমরা জীবনে যেন মৃতপ্রায় হইয়া থাকি। যেমন রসনা-পরিতৃপ্তি জন্য বিবিধ অন্ন পান আছে, এবং জ্ঞানের পরিতৃপ্তি জন্য জ্ঞানের বিবিধ বিষয়ীভূত পদার্থ আছে, তেমনি প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য নানাবিধ পদার্থ আছে। পিতার প্রতি প্রীতি একরূপ, সন্তানের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; স্ত্রীর প্রতি প্রীতি একরূপ, বন্ধুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; গুরুর প্রতি প্রীতি একরূপ, শিষ্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; প্রভুর প্রতি প্রীতি একরূপ, ভৃত্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; মিত্রের প্রতি প্রীতি একরূপ, শত্রুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; স্বদেশের প্রতি প্রীতি একরূপ, সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; অচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি একরূপ, সচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; বিশুদ্ধ প্রীতি একরূপ, অবিশুদ্ধ প্রীতি অন্যরূপ। যেমন জল একই পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে পতিত হইয়া বিশুদ্ধ কিংবা অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করে, প্রীতিও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।...যদি প্রীতি কি পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে জীবিতকে জিজ্ঞাস কর, জীবন কি পদার্থ, ঈশ্বরভক্তকে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি পদার্থ। প্রীতির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করি। ঈশ্বর যেমন ভক্তগণের হৃদয়-কুটীরে দর্শন দেন, জ্ঞানীর আত্মরূপ শোভনতম প্রাসাদে সেরূপ দর্শন দেন না। যখন সামান্য প্রীতিও অতি সুখের

বিষয়, যখন স্নেহের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার বিশুদ্ধ সুখের কারণ হয়, তখন যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা, আমারদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ভাব তাঁহাকে অর্পণ করা কত সুখের বিষয় না হয়। প্রীতি অধ্যাত্ম-যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।...হে পরমাত্মন! প্রীতি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছ, সে ভার সম্যক্ রূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর।...এই অকিঞ্চন দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রীতি ভাবের বিশিষ্ট রূপ সঞ্চার কিয়ৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, এই অকিঞ্চন যেন চিরকাল সেই মধুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে বয়স ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের শীতল ভাব যেন আমার আত্মাতে প্রবেশ না করে। আমি যেন তোমার প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তার কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকি।" (দ্বিতীয় ভাগ। ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা। কার্ত্তিক, ১৭৮৯ শক)

"বসন্তকালে জগতে নবজীবন ও নবরসের আবির্ভাব হয়; বন ও উপবন সকল নব পল্লব ও মুকুলকুঞ্জে পরিশোভিত হইয়া চিত্ত হরণ করে; পক্ষিগণ নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি পূর্ব্বক অবরুদ্ধ কণ্ঠ পরিমুক্ত করিয়া সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করে; অপূর্ব্ব মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে আশ্চর্য্য সুখের সঞ্চার করে। কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সখ্যভাবের সৌন্দর্য্য কি শ্রেষ্ঠ! যখন হৃদয় হৃদয়কে আকর্ষণ করে, যখন এক সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মন অন্য সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়, সে ভাবের সৌন্দর্য্যের নিকট বসন্তের

সৌন্দর্য্য কোথায়? কিন্তু যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সাম্যভাবের সৌন্দর্য্যের জনয়িতা, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কি সীমা আছে? তিনি সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ; তাঁহা হইতে সকল জ্যোতি, সকল শোভা ও সকল সৌন্দর্য্য বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি গুণের আকর। তিনি সৌন্দর্য্যের সাগর।" (দ্বিতীয় ভাগ মেদিনীপুর গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা। ফাল্গুন ১৭৮৭ শক)

ব্রহ্মসাধন। ১৮৬৫।

রাজনারায়ণ এই পুস্তক সম্বন্ধে আত্ম-চরিতে লেখেন:

"ব্রহ্মসাধন পুস্তকও সেখানে [মেদিনীপুরে] রচনা করি। ব্রহ্মসাধন পুস্তকের সাধারণ ভাব Upham's Interior Life হইতে নীত। আমার নিজেরও অনেক ভাব উহাতে আছে। দুঃখের বিষয় যে ঐ গ্রন্থ কেহ ছোঁয় না; কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার নিজের মত এই যে উহা আমার সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মসাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে লোকে উহার তত্ত্ব সকল আপনার জীবনে উপলব্ধি না করিলে এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না। কেশববাবু আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।" (পৃ. ৭৮)

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা। প্রথম ভাগ। ১৮৬৬।

ঐ। দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৬৭।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে রাজনারায়ণ লেখেন:

"অনেক দিবস হইল আমি এই ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা রচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তাহা সমাপ্ত হইয়া প্রচারিত হইল।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম পরম সত্যধর্ম্ম ইহা দেখান ও তাহার তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহার প্রথম ভাগে যে সকল তত্ত্ব

প্রমাণীকৃত হইয়াছে তাহাই দ্বিতীয় ভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্ম পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দার্শনিক বিচার পাইবেন, দ্বিতীয় ভাগে তাহা পাইবেন না। প্রথম ভাগে যে দার্শনিক বিচার আছে তাহার কঠোরতার হ্রাস করিতে সাধ্যমতে ক্রটি করি নাই। আমাদিগের ধর্ম্মের মূলের বিষয় বলিতে গেলেই দার্শনিক বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কোন মতে নিবারণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন দর্শনজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্ তাহা হইলে তাঁহার আর ভ্রমের সীমা থাকে না। ঈশ্বরের অনেক অকিঞ্চন অনুচর আছেন যাঁহাদিগের দর্শনক্ষেত্রে দর্শন তাহার নীরস কঠোর মূর্ত্তি কখন প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু অনেক দর্শনশাস্ত্র-বিশারদ বিদ্বান্ অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। দার্শনিক তর্কদ্বারা যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মতত্ত্ব সকল প্রমাণীকৃত হয়, তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে, এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগেরও ভ্রমের সীমা নাই। যেমন কোন অবোধ ব্যক্তি নদীর প্রস্রবণ না আবিষ্কৃত হইলে তাহার সুশীতল সুনির্ম্মল জল পান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে তাঁহারাও সেইরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য করেন।

"কেহ কেহ এইরূপ বলিতে পারেন যে যে সকল বিষয় এই গ্রন্থে লিখা হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপ রূপে লিখা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যদি গ্রন্থ প্রণয়নের অভিপ্রায় বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহা দোষ বলিয়া গণ্য করিবেন না। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার অভিপ্রায় এই যে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়সকল স্থূলরূপে অবগত হইবেন; তাহা হইলে ইহার প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধীয় বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই বিষয়টি বিশেষরূপে অবগত হইবার পক্ষে ইহা উপকারী হইবে। এই গ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কত দূর আমার চেষ্টা

সুসিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।…"

রাজনারায়ণ পুস্তকখানি ১৮৫৩ সালে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। ইহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"আত্মপ্রত্যয় সকল দেশের সকল কালের লোকের মনে বিদ্যমান আছে। এমন দেশ নাই, এমন কাল নাই, যে দেশের অথবা যে কালের লোকের মনে আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান ছিল না অথবা নাই। কিন্তু যে উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার হয় সে উপলক্ষ কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে না ঘটিলে সে আত্মপ্রত্যয় তাহার মনে সঞ্চারিত হয় না। সূর্য্য সকলেরই দর্শনীয় পদার্থ অতএব সূর্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস সকল মনুষ্যেরই আছে। কিন্তু যে বস্তুটী কেবল পৃথিবীর এক দেশে আছে, তাহার দর্শন সকল মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে না, অতএব সে বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় সকল মনুষ্যের মনে বিদ্যমান নাই।

"আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অন্য কোন প্রকারে লভনীয় নহে। তাহাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তনভূমি। বৃক্ষের অস্তিত্ব জ্ঞান আমরা কেবল সহজ জ্ঞান দ্বারা লাভ করি। আমাদের সহজ জ্ঞান রূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা বৃক্ষের অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না। ন্যায় অন্যায়ের ভাব এবং মহৎ ও নীচের ভাব মূল ভাব, অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আমাদের সহজ-জ্ঞান রূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা ন্যায় অন্যায়ের ভাব অথবা মহৎ ও নীচের ভাব লাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না। সহজ-জ্ঞান স্বয়ং নিরবলম্ব ; কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া যুক্তি ও কল্পনা প্রভৃতি অন্যান্য মনোবৃত্তি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যুক্তি সহজ-জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তুসমূহ হইতে সর্বরূপে ভিন্ন অন্য কোন

বস্তুর অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। যখন কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা চক্ষুর অদৃশ্য কোন গ্রহের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন, তখন মনুষ্যের পূর্ব্ব-বিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কোন বস্তু নিরূপণ করেন না। যখন ভূতত্ত্ববেত্তা পৃথিবীর গর্ভস্থিত মনুষ্যের অগম্য প্রকাণ্ড জ্বলন্ত দ্রব ধাতুপিণ্ডের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন তখন মনুষ্যের পূর্ব্ববিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বস্তু নিরূপণ করেন না। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে যুক্তিদ্বারা আমরা কোন মূল ভাব উপার্জ্জন করিতে পারি না। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে সকল পদার্থ জানিতে সক্ষম হই, কল্পনা সেই সকল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় সংযোজন, বিয়োজন, প্রসারণ ও আকুঞ্চন শক্তি সকলের সহকারে কার্য্য করে। স্বর্ণময় পর্ব্বত, স্কন্ধহীন দানব, প্রকাণ্ড আকার দৈত্য, অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মনুষ্য এই সকল ভাব সহজ-জ্ঞান দ্বারা উপার্জ্জিত ভাবে সংরচিত।" (প্রথম ভাগ। উপক্রমণিকা—প্রত্যয় ও প্রত্যয়ের নিয়ম)।

আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ১৮৬৭।

এডিসনের অনুকরণে কয়েকটি চরিত্র-চিত্রণ। ইহা পরে "বিবিধ প্রবন্ধ" পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে। ১৮৭৩।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ১৮৭৩।

ইহার 'অনুক্রমণিকা'য় (১১ মাঘ ১৭৯৪ শক) রাজনারায়ণ বসু লেখেন:

"বিগত ৩১ ভাদ্র দিবসে আমি জাতীয় সভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে উপস্থিত মতে একটি বক্তৃতা করি। সেই দিবসের অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। ঐ বক্তৃতা দিবার কিছু দিন পর যত দূর তাহা স্মরণ হইল

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহাতে এই প্রস্তাবের উৎপত্তি হইয়াছে।” পুস্তকের কিয়দংশ এই :

“হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারা দেব দেবীর পূজা অর্চনা ও যাগ যজ্ঞ করিতেন না কিন্তু যাহারা করিত তাহাদিগকে তাঁহারা কনিষ্ঠ অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা তাহাদিগকে স্বধর্মভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন, কখন তাহাদিগকে স্বধর্ম হইতে পৃথক্ বা বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ধর্ম্মের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানেরা বলে, পৌত্তলিক দেখ্ আর কাট্। খৃষ্টানেরা বলে হিন্দুরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পূজা করে, তাহার দ্বারা তাহারা ঈশ্বরের পূজা করে না। সয়তানের পূজা করে। সয়তান ঐ সকল দেবতার ভিতরে বাস করে। এ সকল কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনৌদার্য্য প্রসূত। যাহারা পুত্তলিকার পূজা করে তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে। নাস্তিকতা অপেক্ষ পৌত্তলিকতা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেব-দেবীর উপাসনা করা অকর্ত্তব্য, কিন্তু পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতা পাপ কর্ম্ম নহে, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র। বস্তুতঃ সকল লোকের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধারণাশক্তি সমান নহে। সমুচিত [illegible]ার ত্রুটি, উপদেশের অভাব ও বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অনেকে ব্রহ্মকে অনেক প্রকারে ভাবনা করে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অনীশ্বর ঈশ্বর জ্ঞান করিবে অথবা কল্পিত দেবদেবীকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাংশ বোধে পূজা করিবে, ইহার বিচিত্রতা কি? এই সকল লোককে এক সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া রাখা এবং উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানতা মোচন ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য, এই মত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছে ভিন্ন আর কি বলা

যাইতে পারে? আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে স্বভাবের সঙ্গে এই মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াই মনুষ্য ব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেব দেবীর পূজা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপানস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এই সোপান অবলম্বন করে তাহাদের প্রতি এই উপদেশ আবশ্যক হয় যে চিরকাল তোমরা সোপানে থাকিও না, ছাদে উঠ। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম্মবহির্ভূত লোক তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না।"

"ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যেহেতু উহার সত্য সকল ধর্ম্মে পাওয়া যায় এবং উহাতে পৃথিবীস্থ সকল জাতির অধিকার আছে। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এমন এক আকার ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম কিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে আর হিন্দুধর্ম্ম বলা যাইবে না? রামচন্দ্র নামে একটি লোককে পাঁচ বৎসরের সময় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, এখন তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তা বলিয়া সে কি আর সেই রামচন্দ্র নহে? সেই ঋগ্বেদের সময়ের হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সংশোধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাকারে পরিণত হইয়াছে, এ বলিয়া কি উহাকে আর হিন্দুধর্ম্ম বলা যাইবে না? ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল জাতির ঐক্যস্থল ও সকল জাতির উহাতে অধিকার আছে, অতএব উহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, এ বাক্য যেমন সত্য, হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ সংশোধিত ও উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাকারে পরিণত হইয়াছে অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার এই বাক্য তেমনি সত্য।"

সে কাল আর এ কাল। ১৮৭৪।

রাজনারায়ণ পুস্তকের ভূমিকায় (২২ আশ্বিন ১৭৯৬ শক) লেখেন :

"প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও আমি, আমরা দুই জনে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য করিতাম, ইহা ১৭৯৪ শকের ফাল্গুন মাসে হঠাৎ একদিন মনে পড়িল। বোধ হইল, আমরা যেন এক প্রকাণ্ড ডেস্কের সম্মুখে এখনও দুই জনে কার্য্য করিতেছি। এইরূপ পূর্ব্বকার বন্ধুতার ব্যাপার হঠাৎ স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়াতে অক্ষয়বাবুর সন্দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল। তৎপরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত বালীতে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাক্ষাতের সময় নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমি ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, আমি সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পূর্ব্বে আমার এইরূপ মানস ছিল। অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবিত বিষয় আর এই বিষয়টি প্রায় সমান। পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা থাকাতে সহসা অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তৎপরে জাতীয় সভায় ঐ শকের ১১ চৈত্র দিবসে সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া একটি বক্তৃতা করি। আমার প্রিয় বন্ধু ও ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ঐ বক্তৃতার নোট লিখিয়াছিলেন। সেই সকল নোট হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রবন্ধটি লিখিয়া অক্ষয়বাবুকে দেখান হইয়াছিল। তিনি যে সকল স্থান পরিবর্ত্তন অথবা যে সকল স্থানে নূতন বিষয়

সংযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্থানে তাহা করিয়া দিয়াছি। এই প্রবন্ধ রচনাতে আমার বর্ত্তমান অপটু শরীরে যত দূর পরিশ্রম করিতে পারি, তাহা করিতে ক্রটি করি নাই; এক্ষণে যাঁহার প্রস্তাবে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, তিনি স্নেহের, এবং সাধারণবর্গ অনুগ্রহের, কোমল করপল্লবে ইহা গ্রহণ করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।"

পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"বাঙ্গালা ভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এ বড় দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃতের চর্চ্চা সেরূপ হইতেছে না। বাগ্‌দেবী সরস্বতী গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া রাইন নদীর তীরে আশ্রয় লইয়াছেন। বাগদেবীর এরূপ অন্তর্ধানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ, ভট্টাচার্য্যদের দুর্দ্দশা। তাঁহাদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের স্ত্রীর ছিন্ন বস্ত্র, চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই; এক এক লোকের হয়ত অনেকগুলি ছেলে; কি করিয়া তাহাদের মানুষ করিবেন ভাবিয়া অস্থির। এই উৎকট দণ্ড তাঁহারা কেন প্রাপ্ত হইতেছেন? কেবল সংস্কৃত চর্চ্চা করেন বলিয়া। জগতের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ভাষা। সর্ উইলিয়ম জোন্স বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষা "More copious than the Latin, more perfect than the Greek and more exquisitely refined than either,"—এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা শিক্ষা করান বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগের নিকট হইতে এই ঘোরতর শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি বটে, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহার দ্বারা যথার্থ বিদ্যা উপার্জ্জন যাহাকে বলে তাহা হইতেছে না। শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ইহার প্রধান কারণ। যেরূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে এ অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট ফল হইতে পারে না। আমি স্বয়ং কোন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম। আমি করিতাম কি, না, নিজে বালকদিগকে পুস্তকের কোন স্থানের অর্থ একেবারে বলে দিতাম না, প্রশ্নকৌশলে সেই স্থানের প্রকৃত অর্থটি তাহাদের মুখ দিয়া বাহির করাইতাম। আর কেবল এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। উপস্থিত পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ পাড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে এমন চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এরূপ পড়ানোতে পরীক্ষার ফল মন্দ হইতে লাগিল। আমার একটি বন্ধু, তিনিও নিজে একজন শিক্ষক ছিলেন; তিনি আমাকে দাদা দাদা করিতেন। তিনি আমাকে একদিন বলিলেন, 'দাদা! তুমি ভাল কচ্ছো না, তোমার দুর্নাম হচ্ছে—ছেলেদের গেডিয়ে দেও' (অর্থাৎ ক্রমিক মুখস্থ করাও), আজকাল না গেডাইলে কোন মতে পরিত্রাণ নাই। মানসিক বৃত্তি পরিচালনা না করিয়া পড়ার পক্ষে (Key) কী গুলি বড় সুবিধা-জনক। এই কী মুখস্থ করা বহুল অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। আমি বলি, বরং বিদ্যামন্দিরে সিঁদ কেটে ঢুকা ভাল, তবু এইরূপ চাবি দিয়া তাহার দ্বার খোলা কর্ত্তব্য নয়।

"ইউরোপে এত শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, এখানে কেবল মাত্র এক চাকরী দ্বারা কি এত ভদ্রলোকের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে?···বস্তুতঃ জগৎশুদ্ধ লোক কি কখন কেরাণী অথবা স্কুলমাষ্টার অথবা উকীল হইতে পারে? শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া কেহ পথ চলে না। অনেকে ব্যারিষ্টার অথবা সিভিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন কিন্তু কয় জন সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান? শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদিগের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড়

না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে, আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না। বাহিরে সেক্ষপীয়র, মিলটন ও ডিফরেন্শিয়ল কেলকুলসের চাক্‌চিক্য, ভিতরে সব ভুওয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের উপর নির্ভর, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। শেষ কালে ইংরাজেরা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিবেন, তবে কি আমরা আহার করিব? তাঁহারা বিদেশীয় লোক, তাঁহারা আমাদের জন্য যতটুকু করেন, আমাদের ততটুকুই ভাল। তাঁহাদের উপর আমাদের জোর কি? এই সকল ভারি গভীর বিষয়, এ সকল বিষয়ে অতি প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্যক কিসে আমাদের জাতিত্ব থাকে, কিসে যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের চলা আবশ্যক, নতুবা অত্যন্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

"সে কালের বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন না, তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না, আর সাহেবরাও তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু

আমাদিগের হাত-পা বাঁধা, সে সকল দো[illegible]সংশোধন বিষয়ে আমাদিগের কোন কথাই চলে না।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব। ১৮৭৫।

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। ১৮৭৬।

রাজনারায়ণ ভূমিকায় (১০ মাঘ ১৭৯৭ শক) লেখেন :

"হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরাবৃ[illegible]য়ক এই বক্তৃতা প্রথম কলেজ-সম্মিলনে অভিব্যক্ত হয়। ঐ সম্মিলন [illegible]টাব্দ ১৮৭৫ সালের ১ জানুয়ারি দিবসে হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তিকা একটি যন্ত্রস্থিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত হইল বলিয়া তাহার যেরূপ পত্রাঙ্ক হওয়া উচিত তাহা না হইয়া অন্য প্রকার হইয়াছে। 'সে কাল আর এ কাল' এবং 'হিন্দু কলেজের পুরাবৃত্ত' এই দুই পুস্তিকা প্রকাশকরণে আমার প্রধান অভিপ্রায় এই যে, লোকে সে কালে আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিত বৃত্তান্ত এবং প্রত্যেক প্রধান নগর, প্রত্যেক প্রধান গ্রাম, প্রত্যেক প্রধান বংশ, প্রত্যেক প্রধান বিদ্যালয় প্রত্যেক প্রধান কার্য্যালয় ও এতদ্দেশে সঙ্গীত শিল্পাদি বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি বিষয়ের পুরাবৃত্ত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবে তাহা হইলে ব[illegible]ভাষার কত দূর সমৃদ্ধি সাধন ও আমাদিগের সম্বাদভাণ্ডারের ক[illegible] দূর বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা যায় না।"

পুস্তিকাখানির কিয়দংশ এই :—

"ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনো ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতাপ্রিয় হইব। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন

ফলিবে, যখন আমরা স্বাধীনরূপে কলেজ সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবে, খৃষ্টান বিবিদিগের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিব, কবিতা ও উপন্যাস ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ না করিয়া আমাদের নিজের প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে স্ফূর্তি প্রদান করিব, স্বাধীনরূপে বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইব, স্বাধীনরূপে উপজীবিকা আহরণ করিব, অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধভাবে অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যত দূর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব এবং কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট বালকবৎ রোদন না করিয়া আমাদিগের রাশ এমন ভারী করিয়া তুলিব যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না।”

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। বঙ্গভাষা সমালোচনী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৭৮।

রাজনারায়ণ ১৩ই বৈশাখ, ১৮০০ শকে লিখিত 'বিজ্ঞাপনে' লেখেন :

"কয়েক বৎসর হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উপস্থিত মতে বক্তৃতা করি; সে বক্তৃতা করিবার সময় তাহা কাহারও দ্বারা আনুপূর্ব্বিক লিখিত না হওয়াতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কেবল তাহার সার মর্ম্ম 'ন্যাশন্যাল পেপর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপর ১৭৯৮ শকের ১৯এ বৈশাখ দিবসে মেদিনীপুরে ঐ বিষয়ে উপস্থিত মতে এক বক্তৃতা করি, তাহা লিখিত হইয়া ঐ বৎসরের ৪ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে কলিকাতার বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। সে অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। 'ভারত সংস্কারক' সম্বাদপত্রে এই বক্তৃতার যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

"আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই বক্তৃতা প্রণয়নে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব' ও লং সাহেবের সঙ্কলিত 'Descriptive Catalogue of Bengali Books.' নামক পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থে ভূয়সী দোষ-গুণ-বিচার-ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রম-পরতা প্রদর্শিত হইয়াছে।...এই বক্তৃতায় যাহা আছে, তাহা কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিবৃত্তিক বিবরণ বিষয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এমত নহে; আমার নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।...

"...বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভা এই পুস্তিকা প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি সভার সাহায্য জন্য তাহার প্রথম মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত আয় সভাকে অর্পণ করিয়াছি।..."

পুস্তকের কিয়দংশ এই :

"বাঙ্গালা ভাষার ভাবী অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এক্ষণে ঠিক বলা যায় না। পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা যায় না, ভাষার ভাগ্যও সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না। যখন রমুলস চোর বাটপাড় লইয়া রোমনগরের পত্তন করেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই কতিপয় চোর বাটপাড়ের ভাষা একসময়ে সমস্ত ইউরোপ খণ্ডের বিদ্বানদিগের ভাষা হইবে এবং সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রকার ভাষা হইয়া থাকিবে? যখন মহম্মদ মুসলমানধর্ম্ম

প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, মরুভূমি-নিবাসী কতকগুলি দস্যুর ভাষা একসময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বানদিগের ভাষা হইবে? যখন শাক্যমুনির প্রথম শিষ্যেরা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের ভাষা পালি ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই পালি ভাষা সমস্ত পূর্ব্ব আসিয়ার ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা হইবে? বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে কি আছে তা ঈশ্বরই জানেন, হয় ত ভবিষ্যতে উহা ঐ প্রকার সম্পদাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার বাহ্যসম্পদ্ আকস্মিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর একপ্রকার সম্পদ্ আছে, তাহা মনুষ্যের যত্নের প্রতি নির্ভর করে। সে সম্পদ্ আভ্যন্তরীণ; সে সম্পদ্ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থদ্বারা ভূষিত হওয়ারূপ সম্পদ্। অদ্য আটাইশ বৎসর হইল, মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম, যথার্থ বলিতে কি, হোমর, প্লেটো ও সফক্লিজ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি কিম্বা চরিত্রবর্ণনা-নৈপুণ্যের পরকাষ্ঠা প্রদর্শক সেক্‌সপিয়রের অমরত্ব-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন গেটী ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অপূর্ণ থাকে এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন পূজ্য বিশালখ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃতরস পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সে আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্ম-ভাষা-রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে।...

"যখন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ইংরাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার খিচুড়ি ভাষাতে কথা কহিয়া থাকেন, যখন তাঁহারা মাতৃভাষাতে একখানি সামান্ত পত্র লিখিতে হেয় বোধ করেন, যখন তাঁহারা বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, তখন স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম জন্মিয়াছে, ইহা আমরা কি প্রকারে বলিতে পারি? স্কুল কলেজের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষাতে আপনাদিগের অধিকার জন্মাইবার জন্ম বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাতে ইংরাজী বক্তৃতা করিতে পারে এবং প্রবীণ লোকেও তাহাদিগের উৎসাহার্থ তথায় গিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর অন্যান্য সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? স্কুল কলেজের ছাত্রেরা ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিবার জন্ম পরস্পরকে ইংরাজীতে পত্র লিখিতে পারে, কিন্তু প্রবীণ লোকে ওরূপ করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যখন আমরা দেখিব যে তাঁহারা ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন আমরা বলিতে পারিব যে, স্বদেশের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত প্রেম উদিত হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন, জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।"

বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম খণ্ড। ১৮৮২।

পুস্তকের 'ভূমিকা'য় রাজনারায়ণ লেখেন (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৪ শক) :

"আমার প্রণীত 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আমি যাহা লিখিয়াছি

তাহা 'বিবিধ প্রবন্ধে' সন্নিবেশিত হইল। কেবল *'সে কাল আর এ কাল'* হইল না। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ 'জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা' নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত অনুবাদকার্য্য আমার পরম প্রিয় আত্মীয় স্বসম্পর্কীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হইলে আমার পরম বন্ধু ও সমাধ্যায়ী কবিকুলগৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রার্থনানুসারে তাহার দোষগুণ বিষয়ে ইংরাজীতে এক পত্র লিখি তাহাও উমেশ বাবুর দ্বারা অনুবাদিত হইয়া এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল। 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' এডিসনের স্পেক্টেটরের প্রথম দুই সংখ্যাকে আদর্শ করিয়া লিখিত। উহাতে যে সকল ব্যক্তির চরিত্র আঁকা হইয়াছে তাঁহাদিগের প্রত্যেক্যের চরিত্র দুই তিনজন যথার্থ জীবিত ছিলেন বা আছেন এমত ব্যক্তির চরিত্র লইয়া সংরচিত। 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' খ্যাতনামা মহারাজ সর্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই, বাহাদুরের 'মরকত নিকুঞ্জ' নামক উদ্যানে প্রথম কলেজ রিইউনিয়ানে বক্তৃতাকারে অভিব্যক্ত হয়। আমি এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রাঙ্কনের স্বত্ব 'Oriental Publising Establishment'কে প্রদান করিয়াছি।...ইতি"

পুস্তকে এই বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ঃ স্বদেশী ভাষানুশীলন মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "মেঘনাদবধ" কাব্যের সমালোচন, আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত, আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার, শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব, বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি, জাতিভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন, আশ্চর্য্য স্বপ্ন, জেঠামো, চিকিৎসা, সমাজ সংস্কার, ঐ (দ্বিতীয় প্রস্তাব), ঐ (তৃতীয় প্রস্তাব), মিসর দেশ, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, তিনটি পরিশিষ্ট।

এই পুস্তকের কোন কোন প্রবন্ধ হইতে অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ—

জাতিভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন

"জাতিভেদ প্রথা কেবল ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোক সমাজের উপকার সাধন করে এমত নহে; দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া আর এক প্রকারেও লোকসমাজের উপকার সাধন করে। দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষিত না হইলে তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অভাব জন্য লোকে আক্ষেপ করিয়া থাকে। গ্যাল্টন সাহেব প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে ঐ অভাব মোচন জন্য বুদ্ধিমান পুরুষের সহিত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাদিগের সন্তানও বুদ্ধিমান হইবে। এই প্রকারে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ দেশে চিরকাল রক্ষিত হইবে। উল্লিখিত পণ্ডিতেরা ইউরোপ খণ্ডে এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু আমাদিগের দেশে এই প্রথা অনেক দিন অবধি আছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা যে বুদ্ধিমান, তাহার সন্দেহ

নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে অন্য জাতীয় ছাত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য কুলোদ্ভব ছাত্রই অধিক। জাতিভেদ প্রথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের প্রবাহ দেশে রক্ষা করিয়া লোক সমাজের মঙ্গল সাধন করে; এবং ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোক সমাজের চরিত্র সম্বন্ধীয় দোষ নিবারণ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনের বিশেষ সহকারী হয়। জাতি বংশগত হইবে অথচ নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইলে উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নত হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও মূর্খ হইলে স্বজাতি হইতে অধঃপাতিত হইবে, এইরূপ রীতি প্রচলিত থাকিলে জাতিভেদ প্রথার দোষ নিবারিত হইয়া তাহা হইতে কেবল শুভফল উৎপন্ন হইবে। জাতিভেদ প্রথা রাখা উচিত কিন্তু বর্ত্তমান জাতিবিভেদ প্রথার কিছুমাত্র সংস্কার আবশ্যক নাই এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। পিতৃ-পিতামহের প্রতি ভক্তিজনিত রক্ষণশীল ভাব লোক সমাজের মঙ্গলকর, কিন্তু যদি তাহা উন্নতি ও সংস্কারের একান্ত প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলকর নহে। বস্তুতঃ আমরা যে সংস্কারের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাকে সংস্কার বলা যায় না; তাহা পিতৃ-পিতামহের অতি শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা মাত্র।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৯৬ শক)

আশ্চর্য্য স্বপ্ন

"নিদ্রাযোগে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম,...। বোধ হইল বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন সুসভ্য হইয়াছে যে, পূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর ইংলণ্ড বঙ্গদেশ হারাইবার সময় যে প্রকার সভ্য ছিল তাহাই রহিয়াছে।

বঙ্গদেশ এইরূপ সভ্য অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে পর বাঙ্গালীরা অর্ণবপোত আরোহণপূর্ব্বক ইংলণ্ড গমন করিয়া ইংলণ্ড জয় করিলেন। ইংলণ্ড জয়ের পর বঙ্গরাজ ইংলণ্ডকে একজন বাঙ্গালী বাইসরয়ের (Viceroy) অধীনে স্থাপন করিলেন।

"কিছুদিন পরে আমি বিলাত গমন করিলাম এবং দেখিলাম ইংলণ্ড বাঙ্গালীদের অধীনে থাকিয়া আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কলেজ, স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু প্রধানতঃ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের আলোচনা হইতেছে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপকেরা বিজেতাদিগকে রীতি নীতি সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মনে করিয়া তসরের জোড় পরিধান পূর্ব্বক টিকি রাখিয়া সম্বুকের নস্যাধার হইতে নস্য লইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। ইংরাজী দর্শন অপেক্ষা সংস্কৃত দর্শন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া লোকে তাহা অধ্যয়ন করিতেছে এবং অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন অপেক্ষা সংস্কৃত দর্শন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া লোকে তাহা অধ্যয়ন করিতেছে এবং অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল প্রকার তত্ত্বই মন্থন করিয়া লইতেছে। সিবালিয়র্ বুনসেন বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করা যাইতে পারে, সে সকল তত্ত্ব রূপকাকারে সেই সকল গ্রন্থে অবস্থিতি করিতেছে এক্ষণে সকলে বুনসেন মহোদয়ের কথায় যথার্থ ভাব উপলব্ধি করিতেছেন। তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে যে, লোকে পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থকে কেবল কল্পনাসম্ভূত উপন্যাস কেন মনে করিত। লোকে ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া ঐ ভাষায় কবিতা রচনা করিতেছে। বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগের গ্রন্থ

কলেজে ও স্কুলে অধীত হইতেছে এবং বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন ইংরাজ শিক্ষক সেই সকল গ্রন্থের কী (Key) প্রকাশ করিতেছেন। ইংলণ্ডের আচার ব্যবহারেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সংস্কৃত শাস্ত্রে উদ্ভিজ্ ভোজন ও মদ্যপান হইতে বিরতির গুণ কীর্ত্তিত আছে। সেই গুণ বর্ণন পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত লোক মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকে বাঙ্গালী বিজেতারা মাছ ও পাঁঠা খাইয়া থাকেন ইহা দেখিয়া মাংসের মধ্যে কেবলমাত্র মাছ ও পাঁঠা খাইতেছেন। পল্লীগ্রামের কোন কোন চন্ড ইংলণ্ডের সনাতন রীতি গোমাংস ভক্ষণ হইতে কোনমতে বিরত হইতে না পারিয়া গোপনে গো-হত্যা করিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে। গোপনে গো-হত্যার কারণ এই যে, বাঙ্গালী বাইসরয় এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে গো-হত্যা করিবে তাহাকে শক্ত সাজা দেওয়া যাইবে। দেখিলাম ইংরাজ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা গোমাংস ভক্ষণের অনিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত মাছ ও পাঁঠা ভক্ষণের ইষ্ট প্রতিপাদন করিতেছেন। লোকে ইংরাজী পিকেল (pickle) ও সাস্ (sauce) পরিত্যাগ করিয়া আঁবের আচার ও কাসুন্দি বিলক্ষণ প্রিয় জ্ঞান করিয়া খাইতেছে ও প্রতি বৎসর আঁবের আচার ও কাসুন্দি বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইতেছে। এখানকার রাশি রাশি মাগুর মাছ ও পয়জারে কই প্রতি বৎসর তৈল ও লবণে সংরক্ষিত হইয়া বিলাত যাইতেছে ও সভ্যদেশের মাছ বলিয়া আদরে রক্ষিত হইতেছে।

"অন্যান্য বাঙ্গালা ব্যঞ্জনের মধ্যে সুক্তনী, চড়চড়ি ও ফুলবড়ি ভাজার অধিকতর আদর দেখিলাম। তৈলমর্দ্দন গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইষ্টকর, কিন্তু দেখিলাম অনেক সাহেব তৈলমর্দ্দন আরম্ভ করিয়াছেন,

ও এই রীতি অবলম্বন জন্য লর্ড মনবড্ডো (Lord Monboddo) কে প্রশংসা করিতেছেন ও তাঁহাকে তাঁহার কালের অগ্রবর্ত্তী পুরুষ ছিলেন বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। আরও দেখিলাম, তাঁহারা চুরুট পরিত্যাগ করিয়া হুঁকায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লোকের পরিচ্ছদেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দেখিলাম ইংলণ্ডে শীত দেশ হইলেও অধিকাংশ লোক ধুতি চাদর ও পিরাণ পরিধান করিতেছেন ; তাঁহাদিগের বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে, শীতে হি হি করিতেছেন, কিন্তু তথাপি এইরূপ পরিচ্ছদ সুসভ্য পরিচ্ছদ জ্ঞান করিয়া তৎপরিধানে বিরত হইতেছেন না। যখন আমি স্মরণ করিলাম যে, বঙ্গদেশে পরাধীনতাকালে সাহেবি পরিচ্ছদ পরিধান গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে কষ্টকর জানিয়াও কোন কোন বাঙ্গালী তাহা পরিধান করিতেন তখন আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইলাম না। দেখিলাম বিবি দিগকে আর বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না, তাঁহারা সাটী পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা গাউন অপেক্ষা সাটীকে সৌন্দর্য্য সাধক জ্ঞান করিতেছেন। ইংলণ্ড যখন স্বাধীন দেশ ছিল, তখনও সকল লোকে স্ত্রীদিগের অতিরিক্ত স্বাধীনতায় বিরক্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তঃপুরবাসের সম্পূর্ণ উপকারিত্ব উপলব্ধি করিতেছেন।

"দেখিলাম অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং পল্লীগ্রামের যে সকল চষা তাহা অবলম্বন করে না তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা গ্রাম্য (Pagan) এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা কালে ধনমূলক জাতিভেদ ছিল, এক্ষণে দেখিলাম জ্ঞান ও ধর্ম্মমূলক জাতিভেদ হইয়াছে। কতকগুলি লোক কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গরাজ উপবীত প্রদান করিয়া শ্বেতদ্বীপী ব্রাহ্মণ এই আখ্যায় এক নূতন

শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও দেখিলাম, লোকে মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার প্রথা পরিত্যাগ করিয়া তাহা দাহ করিতেছে; শুনিলাম যে, ইংলণ্ডের স্বাধীনতার কালেই এই হিন্দু-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এইরূপে ইংলণ্ডে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। এমত সময়ে সংবাদ আসিল যে, বঙ্গরাজ তাঁহার দূরস্থ রাজ্য ইংলণ্ড দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। কিছুদিন পরে তিনি বাষ্পীয়পোতে আসিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য লণ্ডনে মহা আয়োজন হইতে লাগিল। যে দিন তিনি লণ্ডন প্রবেশ করেন সে দিন লণ্ডনের শোভন রাজমার্গে অশেষ জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সেই জনস্রোতের কলরবে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিলাম কলিকাতার প্রাতঃকালের কলরব আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে!"

("প্রতিধ্বনি")

সারধর্ম্ম। ১৮৮৬।

প্রকাশক গগনচন্দ্র হোম ভূমিকায় (১১ই মাঘ, ১৮০৭ শক) লেখেন:

"আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ধার্ম্মিক-প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও ধর্ম্মমত এই কয়েকটি প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। যখন 'আলোচনা'তে তাঁহার লিখিত 'সারধর্ম্ম' বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছিল, তখন তাহার অনেক গ্রাহক এবং লেখক ইহাদের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন; এমন কি ব্রাহ্ম-সমাজের এবং খ্রীষ্টসমাজের কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় কোন কোন অংশ অনুবাদিতও হইয়াছিল। আমি নিজে তাঁহার এই ইংরেজী ও

বাঙ্গালা প্রবন্ধ কয়টি পাঠ করিয়া অত্যন্ত মোহিত ও অনেক উপকৃত হইয়াছি ; তাই মাঘোৎসব উপলক্ষে তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।"

এই পুস্তকে একটি ইংরাজী ("The Essential Religion") এবং উপসংহার সমেত পাঁচটি বাংলা প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। উপসংহারে রাজনারায়ণ লেখেন :

"লোকের ধর্ম্মমত আক্রমণ না করিয়া ধর্ম্মে লওয়ানো ব্রাহ্মধর্ম্মে ব্রহ্মাস্ত্র ; এই প্রণালী দ্বারা তিনি বিশ্ববিজয়ী হইবেন। এক্ষণে ব্রাহ্মেরা দুই প্রধান দলে বিভক্ত ; বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ও স্বজাতি পরবশ ব্রাহ্ম এই দুই দলেরই হিতার্থে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। ইহা বলা বাহুল্য যে লেখক শেষোক্ত দলভুক্ত।"

ভাম্বূলোপহার। ১৮৮৬।

১৮০৭ শকে মাঘোৎসবের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যান-সম্মিলনীতে পঠিত হয়।—

(১) পাতি হাঁস যেমন স্বভাবতঃ জলে চরে, সেইরূপ আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরে চরে।

(২) আমরা ঈশ্বরের নানা কাতুরে ছেলে। একটু দুঃখেই আমরা কাতর হই।

(৩) আমাদিগের সকল দুঃখ মঙ্গলেরই কারণ। অন্ধকারে যেমন লোকে ভূত দেখে আমরা তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে দুঃখ দেখি। ভূতের ভয়েই গেলাম। ভূতের ভয় না ছুটিলে আমরা কখন মানুষ হইতে পারিব না।

(৪) পিতা মুখোষ পরিলে যেমন ছেলে ভয় পায়, তেমনি ঈশ্বর দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলে আমরা ভয় পাই। পিতা মুখোষ

পরিলে যেমন পিতাই থাকেন, তেমনি পরম পিতা আমাদিগের সম্বন্ধে দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলেও সেই পরম পিতাই থাকেন।

(৫) দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এচোড়ে পাকা ছেলে; তত্ত্বসকল যতদূর মানবীয় অবস্থাতে জানা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে তাঁহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের আলোক কত প্রকাশিত হইবে বলা যায় না। একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য্য কেন?

(৬) অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি দ্বারা রচিত এই শরীর আত্মার নটবহর। এই নটবহর লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কোন কোন সময় তাহাতে বিরক্ত হইতে হয়।

(৭) শরীর আত্মার লেফাফা মাত্র। যে কেবল শরীরের বেশভূষার প্রতি মনোযোগী এবং সারবত্তা-শূন্য তাহাকে আমি কেবল লেফাফা দুরস্ত ব্যক্তি বলি।

(৮) শামুকের খোলা যেমন মস্ত, কিন্তু ভিতরের জীবটী অতি ছোট; তেমনি প্রকৃত ধর্ম্ম অতি সংক্ষেপ ও সরল, কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্য অবয়ব মস্ত। প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি লোকের তত মনোযোগ নাই; এই বাহ্য অবয়ব লইয়া কত মারামারি।

(৯) যেমন প্রসবের সময় ছেলের মাথা একটু একটু পৃথিবীর দিকে দেখা দেয়, তেমনি বৃদ্ধ মানুষের মাথা পরকালের দিকে একটু একটু দেখা দিতেছে; সেইখানে টুক্ করিয়া গিয়া পড়িলেই হইল।

(১০) কোন ব্যক্তি পাপ-প্রবৃত্তির দমনের প্রকৃষ্ট উপায় কি জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম যে, পাপেচ্ছা যখনই মনে উদিত হইবে, তখনই আপনাকে কোসে আধ্যাত্মিক লাথি মারাই পাপ-প্রবৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। আধ্যাত্মিক লাথি অবশ্য শারীরিক কার্য্য নহে, আধ্যাত্মিক কার্য্য।

(১১) যখন পাপেচ্ছা মনে উদিত হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য পুনরায় অনুতাপ করিবে। তাহাতে এক ঢিলে দুই পক্ষী মারা হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত পাপ আরো প্রক্ষালিত হইবে এবং নূতন পাপমতি দমন হইবে।

(১২) কোন কোন জ্ঞানী বলেন যে, পশুদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে, অন্যান্য জ্ঞানীরা বলেন, তাহা তাহাদের আদোতে নাই। শেষোক্ত জ্ঞানীরা আমাদিগের অন্যান্য জীব-ভ্রাতাদিগকে মানবীয় অধিকারের কিঞ্চিৎ অংশও দিতে নারাজ; কিন্তু এরূপ নারাজির কোন বিশিষ্ট হেতু দেখি না। উক্ত জীব-ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে প্রমাণিত হইলেও তাহা মনুষ্যের সঙ্গে তুলনায় অবশ্য অল্প হইবে, তাহাতে আমাদিগের প্রাধান্যের বিশেষ হানি হইবে না, অথচ মানবীয় অধিকারের অতি অল্পাংশ পাইয়াই উক্ত ভ্রাতারা সন্তুষ্ট হইবেন।

(১৩) ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহাকে মাথায় করিয়া সমস্ত দিন রাত্রি নাচিবে; কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়, যেহেতু তাঁহাদিগের অন্যান্য অনেক কাজ আছে।

(১৪) অনেক মনুষ্য কেবল আলু পটোলের কথা কহিয়া সমস্ত দিন থাকে, এরূপ থাকা কর্ত্তব্য নহে; আলু পটোলের যতদূর অতীত হইতে পারা যায়, হওয়া কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (মহা হিন্দুসমিতি নামক একটি মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব)—ইং ১৮৮৭।

ইহার আখ্যাপত্রে আছে:

স্বল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

ইহার 'ভূমিকা' এখানে প্রদত্ত হইল:

...মুসলমানদিগের যেমন National Mahommedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারত প্রবাসী ইংরাজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদিগের Eurasian and Anglo-Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রযোজিত হইয়া, ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ প্রয়োজন হিন্দুদিগের আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে। মধ্যে মধ্যে এমন এক একটি কার্য্য গবর্ণমেণ্ট করিয়া বসেন যে, তদ্দ্বারা হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধিকারের উপর হস্তার্পণ হয়। সম্প্রতি এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পুরীর রাজার হস্ত হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের উপর তাঁহার বংশপরম্পরাগত কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সকল হিন্দুদিগের একটি সমিতি থাকিলে, যদি তাহা হইতে উক্ত অপহরণের প্রতিবাদ হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সমীপে তাহার কথার যেমন জোর হইত, এমন আর কিছুতেই হইবে না।* কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুঃখ নিবারণ জন্য এরূপ সমিতি সংস্থাপন করা যে আবশ্যক হইতেছে এমত নহে। দেববাণী সংস্কৃতের চর্চ্চা ভারতবর্ষে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলে হয়। সরস্বতী দেবী এক্ষণে গঙ্গা তীর পরিত্যাগ করিয়া, রাইন নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের যুবকদিগের ক্রমশঃ শারীরিক অবনতি হইতেছে। আমাদিগের বিদ্যালয় সকলে ধর্ম্মশিক্ষা না থাকা প্রযুক্ত

* এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য প্রত্যাখ্যান করেন।

যুবকদিগের নৈতিক অবনতি হইতেছে। তজ্জন্য এক্ষণকার লোকেরা ক্রমশঃ সংশয়বাদী, স্বার্থপর ও ইউরোপীয় বিলা[illegible] হইতেছে। আমাদিগের দেশের লোকে ক্রমশঃ পানাসক্ত হই[illegible]। ভারতবর্ষে দিন দিন দরিদ্রতার বৃদ্ধি হইতেছে। এমন কি গবর্ণমেণ্ট সম্প্রদায়ের একজন* নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে পঁচিশ কোটী লোকের মধ্যে পাঁচ কোটী অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে। আমাদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল—এমন কি সামান্য দেশলাইটী পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আমদানি করিতে হয়। ভারতবর্ষের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। যদি আমাদিগের স্বদেশীয় রাজা থাকিত, তবে এই দুরবস্থার প্রতিকার হইতে। যখন তাহা নাই, তখন সাধারণবর্গের সমবেত চেষ্টা দ্বারা [illegible] হওয়া কর্ত্তব্য। হে হিন্দু মহোদয়গণ। আপনারা এই দারুণ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কি কোন চেষ্টা করিবেন না? আপনারা কি আ[illegible]স্য নিদ্রায় চিরকাল যাপন করিবেন? পুরাকালে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে হিন্দুজাতির যে অগ্রণীপদ ছিল, সেই অগ্রণীপদে তা[illegible]কে পুনঃ স্থাপিত বরিতে কি আপনারা সচেষ্ট হইবেন না? [illegible]াল পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে কি এ কার্য্য এখন সাধিত [illegible]তে পারে? গবর্ণমেণ্টের উপর সকল বিষয়ে এত নির্ভর করেন কেন? আপনারা কি এমন প্রত্যাশা করেন যে, যে অন্ন আপনারা ভক্ষণ করেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের মুখে তুলিয়া দিবেন? তাঁহারা বিদেশীয় লোক। আপনারা কি প্রত্যাশা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আপনাদিগেরই উপকার করিতে থাকিবেন? এমন নিষ্কাম ধর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট হইতে কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

---

* Sir W. W. Hunter

হিন্দুদিগের উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা করিতে গেলে তাহা ধর্ম্মমূলক করা চাই, যেহেতু হিন্দুরা অতি ধর্ম্মপরায়ণ জাতি। হিন্দু, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বেড়ায়, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে নিদ্রা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু কোন পত্র লিখিতে গেলে ঈশ্বরের নামে পত্র আরম্ভ করে। হিন্দু কোনখানে যাইতে হইলে, ঈশ্বরের নাম করি[illegible] বেরোয়। পৃথিবীতে কোন্ জাতি এমন ধর্ম্মপরায়ণ আছে? ইংলণ্ডের লোক যেমন "অগ্নিস্থান ও গৃহ" (Hearth and Home) বলিলে, কিম্বা জর্ম্মেনেরা পিতৃভূমি (Fatherland) বলিলে, যেমন উন্মত্ত হইয়া উঠে, তেমনি হিন্দুরা ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠে। হিন্দুজাতির উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা যদি ধর্ম্মমূলক না করিয়া সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে বুনিয়াদশূন্য ও গাঁথুনিশূন্য আল্‌গা ইষ্টকের বাড়ী যেমন প্রবল বায়ুর প্রথম ঝটিকাতে পড়িয়া যায়, তেমনি সভা বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য মহ হিন্দুসমিতিকে ধর্ম্মমূলক করা হইয়াছে। এইজন্য এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের স্তব করিয়া সভা আরম্ভ হইবে এবং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দেবপূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, কারণ ভারতমাতার হিতার্থ একত্রিত হওয়া অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্ম ক্রিয়া শ্রেষ্ঠতর?

মহা হিন্দুসমিতি সংস্থাপন করিতে গেলে হিন্দু কাহাকে বলা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। হিন্দুস্থানী খাওয়া দাওয়ার উপর নির্ভর করে না, এই কথা বলিলে পাঠকবর্গ বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুরা বন্য শূকর মাংস ভক্ষণ করে না, রাজপুত হিন্দুরা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী হিন্দুরা কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে না—ব্রাহ্মণ ছাড়া মান্দ্রাজের সকল হিন্দুরা তাহা খাইয়া থাকে।

পাঞ্জাবের হিন্দুরাও ঐরূপ করে, ইহা সকলেই জানেন যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদিগের সহিত ব্যবহারে হিন্দুদিগের পান পানির আয়েব নাই। কাশ্মীরের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা বাজার হইতে মুসলমান ভৃত্য দ্বারা রুটী মাংস ক্রয় করিয়া আনাইয়া ভক্ষণ করেন, কেবল পরিবেশন সময়ে স্বজাতীয় লোকে হাতে করিয়া দেয়। তবে আহার সম্বন্ধে এক বিষয়ে নিয়মের কাঠিন্য আছে সন্দেহ নাই। গো-খাদককে কখনই হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, খাওয়া দাওয়ার উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। হিন্দুত্ব পরিচ্ছদের উপর নির্ভর করে না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হিন্দুদিগের পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দুত্ব রীতিনীতির উপরেও তত নির্ভর করে না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন। ব্রাহ্মণদিগের কুশণ্ডিকা করিয়া বিবাহ ও বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠী বদল করিয়া বিবাহ করা কত ভিন্ন, কিন্তু উভয়েই হিন্দু। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল হিন্দুজাতির কতগুলি সাধারণ আচার ব্যবহার আছে। হিন্দুত্ব কোন বিশেষ ধর্ম্মমতের উপর নির্ভর করে না। শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে মতের প্রভেদ কত! সাধারণ হিন্দুর মত জৈন সম্প্রদায়ের মত হইতে কত বিভিন্ন, কিন্তু জৈনেরা হিন্দু। তবে হিন্দুত্ব কিসের উপর নির্ভর করে? যে যে বিষয়ের উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে, তাহা পশ্চাৎ উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ভারতীয় আর্য্য বংশোদ্ভব না হইলে হিন্দু বলা যায় না। অন্যান্য আর্য্যজাতির যে সকল শারীরিক লক্ষণ আছে, ভারতীয় আর্য্যদিগের তাহা আছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে অনার্য্য জাতি হইতে পৃথক করা যায়। ভারতীয় আর্য্যেরা যে সকল জাতিকে আর্য্য শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেও আর্য্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, যথা—মান্দ্রাজের ব্রাহ্মণ ছাড়া নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা

ও যে সকল সাঁওতাল হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে জাতি রামায়ণ ও মহাভরত ও অষ্টাদশ পুরাণ জাতীয় পুরাকালীন ইতিহাস অথবা প্রবাদ ভাণ্ডার বলিয়া মান্য করে না, তাহাদিগকে হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে জাতির আদি ভাষা সংস্কৃত এবং আধুনিক ভাষা সাক্ষাৎ সম্মুখে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন কোন ভাষা অথবা যে ভাষা আদৌ সংস্কৃত নহে, কিন্তু যাহাতে প্রচুররূপে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিয়াছে এমন কোন ভাষা যেমন মান্দ্রাজের ভাষা সে জাতি হিন্দু জাতি। চতুর্থতঃ যে হিন্দু সে সংস্কৃত নাম অথবা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন কোন নাম ধারণ করে। পঞ্চমতঃ যাহারা পরব্রহ্মকে অথবা কোন দেব অথবা দেবীকে পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করে তাহারা হিন্দু। পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। একস্থলে মাত্র এই নিয়মের ব্যভিচার আছে। জৈনেরা পরব্রহ্মের উপাসনা করে না, কিন্তু তাহারা হিন্দু। তাহাদিগের প্রধান দেবতা তীর্থঙ্কর, কিন্তু তীর্থঙ্কর সংস্কৃত নাম। কিন্তু যাহা হউক হিন্দু দেবতাতে বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত তাহারা হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়। এই এক ব্যভিচার মূল ব্যতীত পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। হিন্দুদিগের ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এক।

আমি আমার প্রস্তাবে ব্রাহ্মদিগকে এবং বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিয়াছি। যখন পরব্রহ্মকে সকল হিন্দুশাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছে এবং পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা, তখন যাঁহারা তাঁহার বিশেষ উপাসক তাঁহাদিগকে কেন হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারি না। হিন্দু শাস্ত্রে নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠাধিকার এবং সাকার উপাসনা কনিষ্ঠ অধিকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা হিন্দু বলিয়া কেন গণ্য হইবেন না, তাহা বলিতে

পারি না। যখন কবিরপন্থী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, শিখ, সাধ, চৈতন্য মতাবলম্বী বৈষ্ণব বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনন্তকুল বৈষ্ণব, যাঁহারা জাতিভেদ আদোবে স্বীকার করেন না, যখন জৈনেরা পর্য্যন্ত যাহাদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা অর্থাৎ তীর্থঙ্কর সাধারণ হিন্দুর উপাস্য কোন দেবতা নহে, ইহারা পর্য্যন্ত যখন হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়েন তখন ব্রাহ্মেরা কেন হিন্দু বলিয়া গণ্য হইবেন না। যে সকল বিলাত ফেরত ব্যক্তি হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারা হিন্দু বলিয়া কেন গণ্য হইবেন না তাহাও বুঝিতে পারি না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গো-খাদক কখনই হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু আমরা জানি যে, যাঁহারা ইংরাজী খানা খান, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ গো-খাদক নহেন। কোন বিশেষ হিন্দু বিলাতে গরু খাইয়াছেন কি কিনা, কিম্বা এখনও খান কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের খানাতল্লাসী করা কর্ত্তব্য নহে। প্রস্তাবিত মহা হিন্দুসমিতির একটি নিয়ম এই যে, সমিতি গোরক্ষণে ও গোজাতির উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন। এই নিয়ম জানিয়াও যে ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইবেন, তাঁহাকে গোরক্ষায় যত্নবান, অতএব গো-খাদক নহে বলিয়া লইতে হইবে।

মহা হিন্দুসমিতিতে যোগ দেওয়ার প্রতি কোন হিন্দু কোন আপত্তি করিতে পারে না, বিশেষতঃ যখন খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যাপার নাই।

আমাদিগের সকলেরই এই কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, **আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব আর যতই ছাটিব ততই মরিব।**

ফাল্গুন, ১২৯৩ সাল, বৃদ্ধহিন্দু।

গ্রাম্য উপাখ্যান।

১২৯০ সালে 'সুরভি'তে "গ্রাম্য উপাখ্যান" ও চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ভ্রমণ" প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধটি 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত'এ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম প্রকাশের বহু বৎসর পরে উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হয়। ইহার 'গ্রাম্য উপাখ্যান' অংশ হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত হইল :

"ইয়োরোপীয় জাতিগণের মধ্যে পোর্ত্তুগিজেরাই বঙ্গদেশের সহিত প্রথম বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করে। কালীঘাটের পাশ দিয়া যে গঙ্গা গিয়াছে তাহাকে আদ্যগঙ্গা বলে। ঐ আদ্যগঙ্গা এক সময়ে অতি প্রশস্ত নদী ছিল। ঐ নদী দিয়া পোর্ত্তুগিজদিগের জাহাজ আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়া শিবপুরের কাছ দিয়া যে সরস্বতী নদী প্রবাহিত আছে এবং যাহা এক্ষণে সাঁকরাইলের খাল নামে আখ্যাত এবং আঁদুল নামক গ্রামের নিকট দিয়া গিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া হুগলী জেলার সাতগাঁ গ্রামে যাইত, উলুবেড়িয়ার গাঙ্ দিয়া সরস্বতী নদীর মুখ পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না, যেহেতু খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত ভূমি ছিল। একজন ধনাঢ্য মোগল খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিয়া দিয়াছিল, সেই খাল ক্রমে প্রশস্ত হইয়া উলুবেড়িয়ার গাঙের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ করিয়া দিয়াছে। খিদিরপুর হইতে জয়নগর মজিলপুর পর্য্যন্ত আদ্যগঙ্গার দুই পার্শ্বের গ্রামের নাম প্রাচীন পোর্ত্তুগিজ মানচিত্রে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আদ্যগঙ্গা বহুল স্থানে মজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণ দেশের লোকেরা 'বসু পুষ্করিণী' 'ঘোষের পুষ্করিণী' নামক পুষ্করিণী সকলে গঙ্গা ধরিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গাকে লোকে যেমন পবিত্রজ্ঞান করে সেই সকল পুষ্করিণীকে তাহারা তদনুরূপ পবিত্র জ্ঞান করে। ইংরাজের আমলের প্রথম পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগিজদিগের জাহাজ বানিজ্যার্থে কলিকাতায়

আসিত। কলিকাতার শেঠেরা ঐ জাহাজের [illegible]নের কাজ করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর [illegible] বসু নামক কোন ব্যক্তি পোর্ত্তুগিজ কাপ্তেনের কাজ করাতে তাঁহাকে ফিরিঙ্গি কমল বসু বলিয়া লোকে ডাকিত। কামরা প্রভৃতি দুই একটি পোর্ত্তুগিজ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।"

"সেকালে বালকদিগকে সংস্কৃত শ্লোক অভ্যাস করাইবার রীতি ছিল। বাপ খুড়ো জেঠা প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহাদিগকে ঐ সকল শ্লোক অভ্যাস করাইতেন। যে শ্লোকের আদিতে 'মা নিষাদ' আছে সেই চিরবিখ্যাত শ্লোক সর্ব্বপ্রথমে মুখস্থ করাইতেন। এ রীতিটী কেন উঠিয়া গেল আমরা বুঝিতে পারি না। যে শ্লোকটি সংস্কৃত ইতিহাস পুরাণ ও উপপুরাণের ভিত্তি স্বরূপ, যে সকল অনুষ্টুপ শ্লোক দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যরূপ বৃহৎ ও সুশোভন অট্টালিকার অধিকাংশ বিরচিত, তাহার মধ্যে যেটি সর্ব্বপ্রথম রচিত হয়, যাহা রামায়ণে ঐ ছন্দের অন্যান্য শ্লোকের মধ্যে পবিত্র স্বভাব মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে দেব প্রেরণা প্রভাবে প্রথমে বিনিসৃত হইয়া নিজ শ্লোক রচয়িতাকেও বিস্মিত করিয়াছিল, যে ছন্দের [illegible]ক অবনীমণ্ডল পবিত্রকারী পুণ্যগাথা রামায়ণ বিরচিত, যে শ্লো[illegible]জীবের প্রতি কারুণ্যরসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক, সে শ্লোক যদি অ[illegible] বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করান উচিত না হয়, তবে কোন্ শ্লোক করান উচিত? রোগের সময়ে খই খাইবার প্রথা যেমন বিনা কারণে উঠিয়া গিয়া সাগু খাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি বিনা কারণে 'মা নিষাদ' কণ্ঠস্থ করাইবার রীতি উঠিয়া গিয়াছে। খই অতি শুভ্র পবিত্র লঘুপাক দ্রব্য তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া সাগু তাহার স্থান কেন অধিকার করিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সেই 'মা নিষাদ' বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করাইবার রীতি কেন উঠিয়া গেল বুঝিতে পারি

না। 'মা নিষাদ' প্রয়োগাদ্য শ্লোকটি হিন্দু জাতির একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ ও উচ্চ জাতীয় স্বভাবের মহত্ত্বের পরিচায়ক। সেই শ্লোক কণ্ঠস্থ না করান পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের লোকেরা যেমন থিওগিনিস্ (Theogeinus) কবি রচিত নীতিসূত্র বালকদিগকে অভ্যাস করাইত তেমনি সে কালে আমাদিগের দেশে গুরুজনেরা বালকদিগকে চাণক্য শ্লোক অভ্যাস করাইতেন।... বালকদিগকে হিতোপদেশগর্ভ কবিতা অভ্যাস করান অতি উত্তম রীতি. দেখা যায় মনুষ্যের বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর সংসার পথে বিচরণ করিবার সময় তাঁহার বিদ্যালয় কণ্ঠস্থ করা পদ্যময় হিতোপদেশ অনেক সময়ে তাঁহার সাংসারিক কার্য্য নিয়মিত করে। চাণক্য শ্লোকে অনেক হিতোপদেশ আছে। বালকদিগকে তাহা অভ্যাস করান উত্তম রীতি বলিতে হইবে। বালকদিগকে তাহা অভ্যাস করাইবার রীতি কেন উঠিয়া গেল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নিদানপক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় ঐ প্রকার নীতিসূত্র বিরচিত হইবার পূর্ব্বে ঐ রীতি উঠাইয়া দেওয়া ভাল কায হয় নাই।"

রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

তৎকর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত। ১৯০৯। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে আছে :

এই আত্ম-চরিতের যতদূর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল, তাহার পরও ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ২৪।২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ইহার হস্তলিপিখানি তাঁহার প্রিয় দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, কুমারী কুমুদিনী মিত্রকে দিয়া যান, এবং তাঁহাকেই ইহা প্রকাশ করিবার ভার দিয়া যান। তাঁহার এই দৌহিত্রীর নাম তিনি কুমারীরত্ন রাখিয়াছিলেন। আত্ম-চরিতের

মূল খাতাখানি হইতে কুমারীরত্ন একটি নকল প্রস্তুত করেন। তাহা হইতে, মূলের সহিত মিলাইয়া, এই পুস্তক মুদ্রিত হইল।"

ইহার বহু অংশ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

রাজনারায়ণের একখানি রোজনামচা বা দিনলিপি ছিল। দেওঘরে বাসকালীন উক্ত দিনলিপি হইতে কোন কোন অংশ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় (১৮০২ হইতে ১৮০৯ শক পর্যান্ত) মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে কোন কোন অংশ এখানে দেওয়া হইল:

২০ আশ্বিন [১৮০১ শক]। অদ্য এই স্থানে অতি প্রত্যূষে পৌঁছি।

৩১ আশ্বিন [ঐ]। অদ্য হইতে দেশীয় ভাষায় প্রাত্যহিক বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। এতদিন ইংরাজীতে লিখিয়া আসিতেছিলাম, তাহা অন্যায়। নিজের উপদেশের বিপরীত কার্য্য করা উচিত নহে।

২৪ ভাদ্র [১৮০২ শক]। "সুরুচির কুটীর" এই উপন্যাসটি নীরস বিষয় কর্ম্মের প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে, "In a business like manner"। যে যে স্থানে ভাবের উচ্ছ্বাস হওয়া কর্ত্তব্য, সে সকল স্থান অতি নীরস ভাবে লিখিত হইয়াছে। এমন যে সুরেশ ও সুরুচির প্রথম প্রণয়ালাপ তাহা লোকে যেমন পাট্টা কবুলিয়ত লেখা কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছে; তাহাতে ভাবের লেশমাত্র নাই। এই উপন্যাসটি "সুশীলার উপাখ্যানের" ন্যায় সাধারণ হিন্দু সমাজের উপযোগী করিয়া লেখা হয় নাই; কেবল ব্রাহ্মদিগের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। যাহা হউক, উহা হইতে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য অর্থসঞ্চয় ও পরোপকার বিষয়ে অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারেন।

১৫ আশ্বিন [ঐ]। অদ্য মেদিনীপুরের জমিদার বাবু সীতানাথ প্রহরাজ ও তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও বন্ধু বাবু অখিলচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন হয়। তিনি উক্ত কথোপকথনের সময় ব্রাহ্মদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উচ্চতা ও তদনুবর্ত্তীদিগের আচরণ এ দুয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? আমি বলিলাম তাহার কারণ মানুষের অপূর্ণতা। উত্তম মধ্যম লোক তাবৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, সেইরূপ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আছে; তবে আমি স্বীকার করি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তৃতা যেরূপ উচ্চ ও তাহার তুলনায় আমাদিগের আচরণ যেরূপ নিকৃষ্ট, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ লোকের চক্ষে যেরূপ চট্ করিয়া লাগে, অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের সম্বন্ধে সেরূপ চট্ করিয়া লাগে না। অতএব আচরণ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।"

২৩ আশ্বিন [ঐ]। অদ্য শেষ সংখ্যক বান্ধব পাঠ করি। তাহাতে দুর্গাপূজা সম্বন্ধীয় "ভারতশক্তির মহোৎসব" শিরস্ক প্রস্তাবে লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও শাস্ত্রীয় গবেষণার প্রগাঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া যদি বাঙ্গালীর হৃদয়ে সামরিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে যত দিন পৌত্তলিকতা ভারতে থাকিবে, তত দিন উক্ত উৎসব হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে সামান্য মেটেফিরিঙ্গিরা যাহা পারে অর্থাৎ রাজার বিপদের সময় তাঁহাকে যুদ্ধে সাহায্য করা, বাঙ্গালীরা তাহা পারে না; এইজন্য তাহারা পর্য্যন্ত আমাদিগকে ঘৃণা করে। আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী কল্পনা সকলই রূপক মূলক। তাহা প্রাচীন হিন্দুদিগের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ করিতেছে।

'আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার', 'জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালী জাতি' এবং 'হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন' রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই তিনটি বিষয়ে দেওঘরে বক্তৃতা করেন—দিনলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। প্রথমটি "বিবিধ প্রবন্ধে" স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়টি 'তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকা'—চৈত্র ১৮০১ ও বৈশাখ ১৮০২ শকে এবং তৃতীয়টি ঐ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শকে প্রকাশিত হয়। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের আপদ বিপদ' শীর্ষক একটি বক্তৃতার সারমর্ম্ম উক্ত পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শকে মুদ্রিত হয়।

ইংরেজী গ্রন্থ

1. A Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj being a Lecture delivered at the Midnapore Samaj Hall on the 21st June 1863.
2. Brahmic Questions of the Day Answerd. 1869.
3. Brahmic Adviee, Caution and Help. 1869.
4. The Adi Brahmo Somaj, its Views and Principles. 1870.
5. A Lecture in Reply to the Query: "What is Brahmoism?" 1871.
6. Theistic Toleration and Diffusion of Theism. 1872.
7. The Adi Brahmo Somaj as a Church. 1873.
8. Hints showing the Feasibility of constructing a Science of Religion. 1878.
9. Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists. "Published by Messrs. Williams and Nargate of London and Edinburgh, of the first half of

his 'What is Brahmoism' with very little alteration." 1881.

10. Brahmo Catechism. 1882. Published by M. Butchiah Pantalu of Madras.

11. Old Hindu s Hope. 1889

ইহা ছাড়া রাজনারায়ণ বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী প্রবন্ধ ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাদি লিখিয়াছেন। "The Essential Religion"—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"—বৈশাখ ১৮০৫ শকে প্রকাশিত হইয়া পরে "সারধর্ম্মে" গ্রথিত হয়। ১৮১৫ শকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা পত্রিকায় "History of the Primitive Aryans of Central And the Farliest Indo-Aryans. Preface" প্রকাশিত হয়। ইহা পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই। তাহার চারিটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আত্ম-চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চিঠিপত্র

[বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা সুবিদিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে কলিকাতা 'সারস্বত সম্মিলন বা সমাজ' এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সমাজের প্রাণ। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ভৌগোলিক নামের পরিভাষা গঠন করিয়া সমাজ একখানি পত্রী প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বসুর নিকট ইহা প্রেরিত হইলে তিনি এ সম্পর্কে এই পত্র লেখেন :]

দেওঘর, ৪ আষাঢ় [১২৯০]

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না, ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক; কেহ কাহারও কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল "Irritabile vates trition" আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই-তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি-শব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়, তদ্দ্বারা ভ[াব]ী গ্রন্থ-কর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্র[স্তাব]টিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবো[ধ] ব্যক্তি কিছু মাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্যপ্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English Channel একটি উপসাগরের নাম; Channel শব্দে কেবল

মাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না ; কিন্তু কি করা যায় ? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজকশব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশম্বদ—

শ্রীরাজনারায়ণ বসু

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architec, Logic প্রভৃতি শব্দও থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

দেওঘর, ২০ কার্ত্তিক, ব্রা, স, ৫৭

৫ নভেম্বর, ১৮৮৬ সাল।

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২২ অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে আমি ছাড়া দুইটি মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা আপনার পত্র সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহেন।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষা স্বভাব ও রুচি অনুসারে এক একটি প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কেহ ব্রাহ্ম থাকিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়েন কেহ বৈষ্ণব

ধর্ম্মের প্রতি, কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি। ক্রিয়াকলাপেও ঐরূপ। কেহ সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন পদ্ধতি অল্পাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অনুসরণ করিতে ধর্ম্মের হানি বোধ করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই আছেন। এই প্রকার সকল লোকই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঐ বিশ্বজনীন প্রকৃতি ব্যাহত হইবে।

আপনার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনারা ব্রাহ্ম কাহাকে বলেন। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধনের জন্য অন্য কোন জাতির নিকটে যাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না। বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা বিধি দিতেছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেন।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি।" কোন ব্রাহ্ম যদি বলেন যে পাপতাপ ও সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তিপূর্ব্বক চিরকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যথার্থ মুক্তি (জীবন্মুক্তি এই মুক্তির অন্তর্ভূত) তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয়

করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন "বিবেক বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা।" উহাতে ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। সে বিষয়ে কিছু থাকা কর্তব্য, যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রধান মত। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানুপ্রাণন বুঝায় না। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করেন এবং আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এবং বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না।

আপনারা প্রচারকদিগের কর্ত্তব্যে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা গ্রহণ করিবেন না।" ঈশ্বর প্রাপ্য সম্মান কাহাকে বলেন? আমাদিগের দেশীয় প্রথানুসারে যদি কোন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-প্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বর প্রাপ্য সম্মান মনে করেন কি না? যদি কেহ ঐরূপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক "অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন না।" যদি আমাদের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাহার যেমন বিবেচনা ও রুচি সেইরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্যের কোন হানি হয় না।

আপনারা লিখিয়াছেন যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন

না" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কোন ব্রাহ্ম আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেক অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আপনাদিগের দৃষ্টিতে তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি? যদি আপনারা বলেন যে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়. অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা তাঁহাদিগের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না?

যদি কোন ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সে অনিচ্ছা আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি? বোধ হয় করেন। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এরূপ স্বাধীনতা প্রদান অবিধেয়। তাঁহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা সম্মান করিবেন কি না?

যদি আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বংশীয় ব্রাহ্ম কেবল কৌলিক রীতির অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত কোস সংস্রব না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপবীত দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না?

এইরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য ধরিয়া শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এইরূপ কোন ব্রাহ্মের মত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় কি না, এবং এরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলা যায় কি না? যদি কোন বিশেষ

সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট মত অথবা কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম নহেন অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য না করেন বলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্ম্মে পোষায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে পোষায় না। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ঐ শব্দের "ব্রহ্মের উপাসক" এই অর্থ করিতেন। সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত থাকুক না কেন, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইলেই তিনি তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতেন। আমরা যদি ব্রাহ্ম শব্দে আর কিছু বুঝি তাহা হইলে ঐ শব্দের ব্যবহার আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঐ শব্দের সৃষ্টীকর্ত্তা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রসারণ করিতে পারি, সঙ্কোচ করিবার কোন অধিকার নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ যতদূর পারেন ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতেছেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নির্ব্বিশেষে যে কেহ নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে বটে, কিন্তু যে ব্রাহ্মেরা তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল আচার মাত্র জ্ঞান করিয়া তদনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এমৎ আমরা বলি না। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা বীজ মাত্র। প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। যদি আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন

বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের অনুবর্ত্তী লোক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অল্পই পাইবেন কারণ আমি দেখিতেছি এক-একটি ব্রাহ্ম এক-একটি সম্প্রদায়।) তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটি প্রচার সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে "প্রচার সভা" এই মাত্র নাম দিয়া সেই বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকে কর্ত্তব্য যাহ' নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। অবিলম্বে আপনাদিগের মধ্য হইতে এক দল উঠিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তন পর পরিবর্ত্তন চলিবে। কমিটি সব কমিটির অবধি থাকিবে না। অতএব ব্রাহ্ম-সমাজকে মতবদ্ধ (Creed bound) করিতে চেষ্টা করা বৃথা. বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ শৃঙ্খলবদ্ধ করা উচিত হয় না, তাহাতে সকল প্রকার ব্রাহ্মের স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য, আসল বিষয়ে মিল থাকিলেই হইল।

নিবেদক—

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুঃ—উপরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উত্থাপিত হইল সেই সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না, যাহা বলিলাম তাহা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম।

এই পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০ নবেম্বরের সভায় পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

কলিকাতা, ৪৫নং বেনেটোলা লেন,

১৩ চৈত্র, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

পরম পূজনীয় মহাশয়েষু, প্রীতিপূর্ব্বক প্রণাম।

সে দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে আপনি যে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের চিরসম্পত্তি। আপনার দৃষ্টান্তের কথা সকল লোককে তিনি বলিয়া বেড়ান। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন যে তিনি দৈবেন্দ্রিক হইয়াছেন। তিনি কোনখানে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে "পিতা নোসি" এই প্রার্থনা দ্বারা আরম্ভ করেন। পরশ্ব দিবস বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং গতকল্য দরবারের দলের সহিত পদ্মকুটীরে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। প্রণয়াস্পদ প্রতাপচন্দ্র বলিলেন। * * * * প্রেম না হইলে কেহ কথা শুনে না। অন্য অপেক্ষা দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি লোকের এক্ষণে প্রেম হইয়াছে, ঐক্য সাধনার্থ তাঁহার কথা এখন শুনিবে। দেখিলাম মতনিষ্ঠা জন্য দরবারের দলের প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের খুব শ্রদ্ধা আছে। পরশ্ব দিবস সন্ধ্যার পর কৃষ্ণকুমারের বাসায় পাঁচ-ছয়টি বাছাবাছা যুবক ব্রাহ্মের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে হাফেজের একটী মেস্‌রা আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। "তাঁহার সৌন্দর্য্যে অবগুণ্ঠন অথবা যবনিকা নাই কিন্তু যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর রাস্তার ধূলির প্রতি লক্ষ্য করিবে।" রাস্তার ধূলির বিষয় অনেক বলিলাম। আর বলিমাম যে যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত হইয়াও মধুগর্ভ পুষ্প দিকে ধাবিত হয় তেমনি আত্মা পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয়। আত্মার এই সাভাবিক সংস্কার দ্বারা (Natural instincts of the soul) চালিত হইয়া যে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম্মজীবন,

দর্শন দ্বারা যাহা আরম্ভ হয় তাহা যথার্থ ধর্ম্মজীবন নহে। তবে দর্শনের কান কোন বিষয়ে উপকারিত্ব আছে। ধর্ম্মের সোপান এইরূপ সাজাইয়া বলিলাম—

(১) ঈশ্বরের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক আকর্ষণ। যেমন নব মধু-মক্ষিকা ইত্যাদি—

(২) এই আকর্ষণজনিত ব্যাকুলতা—

(৩) পাপ দলন। এমনি করিয়া ইহাতে লাগা যেন জীবন মৃত্যুর ব্যাপার। মোহ ও পাপই রাস্তার ধূলি।

(৪) ধূলি অপসরণ ও ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল রূপে আত্মার নিকটে প্রকাশ—

(৫) পরমাত্মাতে আত্মার মরণ। "যথা প্রিয়া স্ত্রী" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদ। কিন্তু এই মধুর ভাবের বিকৃতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই বিকৃতি বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রবল।

সকলেই আমার কথাতে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই কথোপকথনে শ্বেতকেশ শ্রদ্ধেয় মহলানবিশ উপস্থিত ছিলেন।

অদ্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেওঘর যাত্রা করিব। কলিকাতায় আসিলেই আমার শারীরিক অসুখ ও লোকের নিকট যাতায়াতে কষ্ট হয় এক-একবার অনুতাপ হয় যে কেন আসিলাম তথাপি আপনি আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই আসিব। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলে এবং অন্য বন্ধুদিগের সহিত দেখা না করিলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন এইজন্য তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইলাম তবু অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি রহিল।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১৮০৯ শক

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫০

রাজকৃষ্ণ রায়

১৮৪৯—১৮৯৪

রাজকৃষ্ণ রায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

জন্ম ঃ বাল্য-জীবন

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ অক্টোবর তারিখে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত তিলি-পরিবারে রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্ম্মী ও সুহৃদ্ শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার জীবনী সঙ্কলনের প্রধান অন্তরায় তাঁহার বাল্য-জীবনের বিবরণ সঙ্কলনের উপায়াভাব। তিনি কবে জন্মিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না, কারণ অতি শৈশবে তিনি মাতৃহীন হইয়া, কলিকাতায় তাঁহার পিতার নিকট আনীত হন। তাঁহার জনক প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটে পরে কলিকাতায় ব্যবসায়-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বাসায় স্বজাতীয়া একটি রমণী ছিলেন। শিশু রাজকৃষ্ণের পালন ভার তাঁহারি উপর ন্যস্ত ছিল। এই রমণীকে তিনি মাসী বলিতেন, পরে জানিতে পারেন যে, তিনি তাঁহার পিতার সেবিকা মাত্র। যাহা হউক এই রমণীর সযত্ন পালনেই রাজকৃষ্ণ বাবু বৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরও যত দিন তিনি জীবিতা ছিলেন তত দিন তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং উত্তর-কালে তাঁহার ভ্রাতাকেও অর্থ-সাহায্য করিতে দেখিয়াছি।

রাজকৃষ্ণ বাবু স্বীয় অনিশ্চিত জন্মসময়ের স্থিরতা সম্পাদন জন্য বহু বার বহু জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ণীত কোষ্ঠীর কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক পত্রিকাতে তাঁহার অনেক জীবনী বাহির হয়, তাহাদের কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য নাই।

এমন কি কেহ কেহ ১২৬২ সালে তাঁহার জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি আমা অপেক্ষা [জন্ম : কার্ত্তিক ১২৬৫] বয়সে বড় ছিলেন। আমরা ১২৮৬ সালে একবার এক বৃদ্ধ জ্যোতিষীর নিকট যাই, তাঁহার গণনার ... ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসের গৃহস্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। ...তিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় আমাদের প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বাবুর জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া, আমায় বলিয়াছিলেন, 'এই চক্র প্রস্তুত করিতে জ্যোতিষী ভ্রম করিয়াছেন।...জন্মকাল ১২৫৮ সাল না হইয়া ১২৫৬ সালের ৬ই কার্ত্তিকই হওয়া উচিত।'...জ্যোতিষী মহাশয় একে একে দ্বাদশটি ভাব বিচার করিয়া শেষে বিংশোত্তরীয়া দশানুসারে তাঁহার আজীবনের দশাফল বলিলেন। সে সমুদায় শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার নির্ণীত জন্ম শকাদি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ১৮৪৯ অব্দের ২১এ অক্টোবর রবিবার সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।...তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর একাদশ মাস মধ্যেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্মের পর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতায় আনীত হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময়ে...তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, ইহাই জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরেও তিনি কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পালিকা তখনও তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন। তিনি কয়েক বার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় অবশেষে পাঠ ত্যাগ করেন।"*

---

* ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণের ৪র্থ সংস্করণে শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক লিখিত রাজকৃষ্ণের জীবনী।

কাব্যানুরাগ

রাজকৃষ্ণ রায়ের কাব্যানুরাগ ও প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র দেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, প্রভাকর পত্রের পদ্য পাঠ করিয়া তাঁহার প্রথমে পদ্য লিখিবার প্রবৃত্তি হয়। তিনি খুব অল্প বয়সের সময়ে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রভাকরে অনেক পদ্য লিখিয়াছেন ; সে সমুদায়ের কতকগুলি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে আছে। অনেকগুলি তিনি আর পুনর্মুদ্রণের উপযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহার কিশোর বয়সের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেট, প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।"

রাজকৃষ্ণের অনেক প্রাথমিক রচনা 'আর্য্যদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১, আশ্বিন ১২৮৩), 'তমোলুক পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ-কার্ত্তিক ১২৮২, গদ্য পদ্য), 'জ্ঞানাঙ্কুর' (ভাদ্র ১২৮২), 'বঙ্গমহিলা' (মাঘ ১২৮২) প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনর্গল লিখিতে পারিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিকথায় তাঁহার সম্বন্ধে একটি মজা গল্প বলিয়াছেন। গল্পটি এইরূপ :—

"রাজকৃষ্ণ বাবু যখন 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে'* আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান কবি ; সবেমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি যদুনাথ

* জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা'র প্রথম অধিবেশন হয়—৬ বৈশাখ ১২৮১ তারিখে। পরবর্ত্তী ১২ই বৈশাখ তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভার অধিবেশনে রাজকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় দেখিয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম; মধ্যে কি একটা ষ্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোকরা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—'আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।' যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক অমনি সপ্রতিভ ভাবে মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ পারি।" আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন, "তা বাঃ, বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী 'তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয়? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি।" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে:—

কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা ক'রে আনিয়া হেথায়। ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ. ১৬০-৬১।

মুদ্রাযন্ত্রালয়ে চাকুরী

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

উপার্জ্জনের অভিলাষে রাজকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন (ইং ১৮৭৩৭)। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

> প্রথমে তিনি উপার্জ্জনাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখান হইতেই রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সহিত পরিচয় হয় এবং তাঁহার নিকট সঙ্গীত কবিতাদি রচনা করিতে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পতিব্রতা নাট্যগীতি লিখিয়া বটতলায় বিক্রয় করেন···। এতদ্ব্যতীত জীবিকার্জ্জনের জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি প্রকাশিত হইলেও তাঁহার নামযুক্ত না হওয়ায় আমরা এস্থলে আর সেগুলিকে তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে ভক্ত মহাশয়ের মুদ্রাযন্ত্রে থাকিতে তিনি বঙ্গভূষণ ও স্তবমালা নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
>
> এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে, তিনি তাঁহার রচিত কবিতারাজী হইতে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া অবসর-সরোজিনী নামক কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশে ইচ্ছা করেন। তৎপূর্ব্বে স্কুলপাঠ্য কবিতা-গ্রন্থ প্রচার করিয়া লাভবান্ হইবেন মনে করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতাকৌমুদী প্রকাশ করেন ; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই।

আলবার্ট প্রেস

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ আলবার্ট প্রেসে 'অবসর-সরোজিনী' মুদ্রণকালে তিনি স্বত্বাধিকারী গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুনজরে পড়েন।

মুখোপাধ্যায় ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম; মধ্যে কি একটা ষ্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—'আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।' যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক অমনি সপ্রতিভ ভাবে মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ পারি।" আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন, "তা বাঃ, বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী 'তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয়? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি!" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে :—

কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা ক'রে আনিয়া হেথায়। ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ. ১৬০-৬১।

মুদ্রাযন্ত্রালয়ে চাকুরী

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

উপার্জ্জনের অভিলাষে রাজকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন (ইং ১৮৭৩-৭)। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন:—

> প্রথমে তিনি উপার্জ্জনাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখান হইতেই রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সহিত পরিচয় হয় এবং তাঁহার নিকট সঙ্গীত কবিতাদি রচনা করিতে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পতিব্রতা নাট্যগীতি লিখিয়া বটতলায় বিক্রয় করেন…। এতদ্ব্যতীত জীবিকার্জ্জনের জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি প্রকাশিত হইলেও তাঁহার নামযুক্ত না হওয়ায় আমরা এস্থলে আর সেগুলিকে তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে ভক্ত মহাশয়ের মুদ্রাযন্ত্রে থাকিতে তিনি বঙ্গভূষণ ও স্তবমালা নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
>
> এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে, তিনি তাঁহার রচিত কবিতারাজী হইতে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া অবসর-সরোজিনী নামক কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশে ইচ্ছা করেন। তৎপূর্ব্বে স্কুলপাঠ্য কবিতা-গ্রন্থ প্রচার করিয়া লাভবান্ হইবেন মনে করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতাকৌমুদী প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই।

আলবার্ট প্রেস

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ আলবার্ট প্রেসে 'অবসর-সরোজিনী' মুদ্রণকালে তিনি স্বত্বাধিকারী গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুনজরে পড়েন।

গিরিশচন্দ্র মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধান-ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করেন (ইং ১৮৭৬?)। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

"এই সময় কলিকাতা পার্শীবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুই জন আত্মীয়, আলবার্ট প্রেস নামে একটি নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই মুদ্রাযন্ত্রেই তাঁহার অবসর-সরোজিনী মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী এই স্বজাতীয় কিশোরবয়স্ক কবিটিকে বড়ই স্নেহচক্ষে দেখিতেন, তাঁহার দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুরও তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের আনুকূল্যেই রাজকৃষ্ণ বাবুর এইরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

গিরিশবাবুর আত্মীয়গণ প্রেসের কার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য প্রেসের কার্য্য ভাল চলিতেছিল না, এমন কি কর্ম্মচারীদিগের বেতন তাঁহাকে নিজে হইতে দিতে হইত; এজন্য তিনি ঐ প্রেস উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর অবসর-সরোজিনী তখনও শেষ হয় নাই। তিনি গিরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রেসের তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। গিরিশবাবু তাঁহার প্রস্তাবানুসারে লাভের অর্দ্ধাংশের অধিকারী করিয়া তাঁহাকেই তত্ত্বাবধানভার দিলেন। প্রেস আশুতোষ ঘোষ কোম্পানির নামে চলিতে লাগিল। স্থির হইল, গিরিশবাবুর নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারী হিসাবপত্র রাখিবেন, রাজকৃষ্ণ বাবু প্রেসের জন্য কার্য্য সংগ্রহ ও তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রথমে রাজকৃষ্ণ বাবু নিজ ব্যয়ের জন্য যাহা প্রয়োজন কেবল তাহাই লইবেন। উহা হিসাবে লেখা থাকিবে পরে তাঁহার অংশ হইতে পরিশোধিত হইবে। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি

প্রেস হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রেস তাহার লাভ লোকসানের ভাগী থাকিবেন। এই বন্দোবস্তে রাজকৃষ্ণ বাবুর মত অনর্গল লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের বড়ই সুবিধা হইল।···

অবসর-সরোজিনীর আদর হইল। তিনি এবারে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক "অনলে-বিজলী"। তিনি চেষ্টা করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের দ্বারা উহার অভিনয় করাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই উক্ত রঙ্গভূমির সহিত তাঁহার সম্পর্ক আরম্ভ হয়। এই সকল গ্রন্থ লোকের নিকট প্রশংসিত হইলেও, অধিক বিক্রীত হইত না, কাজেই রাজকৃষ্ণ বাবু সাধরণের জন্য ঘোড়ার ডিম প্রভৃতি রহস্য গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ঘোড়ার ডিম এক মাসে দুই বার মুদ্রিত হইয়া দুই সহস্র বিক্রীত হইয়াছিল; আমিই উহার প্রকাশক ছিলাম। ক্রমে উহা বহু বার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং উহার পর রাজকৃষ্ণ বাবু কুপোকাৎ প্রভৃতি আরও ঐরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারত গানও প্রকাশিত হয়।

* * *

রাজকৃষ্ণ বাবু বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য ক্রমে নাট্যসম্ভব, দ্বাদশ গোপাল, লৌহ-কারাগার, বিক্রমাদিত্য, হরধনুর্ভঙ্গ ও রামের বনবাস রচনা করেন।···এইরূপে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হইল,···রাজকৃষ্ণ বাবুর নিজের ব্যয় চলিলেও লভ্যাংশ দ্বারা স্বত্বাধিকারীর বিশেষ সুবিধা বোধ হইত না। তিনি এই প্রেসের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা অন্য কোন ব্যবসায় করিলে প্রচুর লাভবান্ হইতেন এই মনে করিয়া তিনি প্রেস বিক্রয় করিলেন।"

"পরমহিতৈষী সহৃদয় সুহৃদ্" গিরিশবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া, রাজকৃষ্ণ পরবর্ত্তীকালে (ইং ১৮৯২) 'কল্কি পুরাণে'র উপহার-পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে আমার পরম সহায়। বিশেষতঃ আপনিই আমার সাহিত্য-জগৎ-প্রবেশের প্রধান পথ-প্রদর্শক। বহুকালের কথা, কি শুভক্ষণেই আমি আপনার "আলবার্ট যন্ত্রে" আমার "অবসর-সরোজিনী কাব্য" ছাপিতে দিয়াছিলাম। আপনি সেই পুস্তকপাঠে পুলকিত হইয়া, আমার হস্তে আপনার আলবার্ট প্রেসের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, উত্তরোত্তর নানাবিধ গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন।"

সাময়িক-পত্র পরিচালন

'সমাজ-দর্পণ'

আলবার্ট প্রেসের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে রাজকৃষ্ণ 'সমাজ-দর্পণ' প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। 'সমাজ-দর্পণ' সম্পাদন করিতেন—যশোদানন্দন সরকার। ইহাতে রাজকৃষ্ণের কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে যশোদানন্দন সম্পর্ক ত্যাগ করিলে রাজকৃষ্ণ স্বয়ং 'সমাজ-দর্পণ' পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু গ্রাহকাভাবে শীঘ্রই উহা বন্ধ করিতে হয়।

'বীণা'

'সমাজ-দর্পণ' রহিত হইলে ১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) মাস হইতে রাজকৃষ্ণ 'বীণা' নামে "নানাবিষয়িণী কবিতা-প্রসবিনী" একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম

সংখ্যার সূচনায় সম্পাদকের রচিত একটি গীত মুদ্রিত হইয়াছে ; উহা এইরূপ :—

(আস্থায়ী)	(সঞ্চারী)
বাজল বীণা, নাচল জল,	ভওঁর ভওঁরী বীণাকে সঙ্গ
বিজলী চমকে জলদ-গায় ;	গুঁজরি' গুঁজরি' করত রঙ্গ,
টুটল নিদ, ফুটল ফুল,	তা'কো সঙ্গ, নীরব বঙ্গ !
সচল ভেল অচল বায় ।	তুঁ ভি গা রে সুর মিলায় ;
(অন্তরা)	(আভোগ)
বাণী-বীণা বাজে ধীরি ধীরি,	নয়ী বীণা, বৈণিক নয়ো,
দায়রা দায়রা দারা দিরি দিরি ;	তন্ত্র নয়ো, মন্ত্র নয়ো,
ধেত্তা ধিধি, তেত্তা তিতি	নয়ো প্রবন্ধ, নয়ো প্রসঙ্গ ;
সঙ্গত ধীর মধুর ভায় ।	নমহু বীণাপাণি-পায় ।

ক্রোড়পত্রী-রূপে গীতটির একটি স্বরলিপিও ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে ; উহা বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের অন্যতর সঙ্গীত-অধ্যাপক মদন-মোহন বর্মণ-কৃত। প্রথম বর্ষের 'বীণা'য় ক্রোড়পত্রী-রূপে সর্বসমেত ৮টি বাংলা গানের স্বরলিপি স্থান পাইয়াছে : তন্মধ্যে ৩টি মদনমোহন বর্মণ, ৩টি বৈকুণ্ঠনাথ বসু ও ২টি অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-কৃত।

'বীণা' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা চারি বৎসর জীবিত ছিল ; বিভিন্ন খণ্ড এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম খণ্ড	বৈশাখ ১২৮৫—চৈত্র	আলবার্ট প্রেস হইতে
২য় খণ্ড	বৈশাখ ১২৮৬—চৈত্র	ঐ
৩য় খণ্ড	বৈশাখ ১২৮৮···	বীণা যন্ত্রে মুদ্রিত
৪র্থ খণ্ড	কার্ত্তিক ১২৯৩—আশ্বিন ১২৯৪	ঐ

দ্বিতীয় বর্ষে "বীণার পরিশিষ্ট"-স্বরূপ "গ্রন্থ-সমালোচন" প্রবর্ত্তিত

হয়। এ সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ যে-প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহাতে একটু অভিনবত্ব আছে; তিনি লিখিয়াছেন :—

বাঙ্গালা সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ কোন পুস্তক সমালোচনার্থ উপহার না পাইলে সমালোচনা করেন না, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সেরূপ করা ভাল নহে। উপহার না পাইলেও, অন্ততঃ ইচ্ছানুসারে কোন কোন গ্রন্থ ক্রয় করিয়াও সমালোচনা করা উচিত। আমরা বীণায় উপহারপ্রাপ্ত এবং ক্রীত পুস্তকাবলির সমালোচনা করিব।

রাজকৃষ্ণ যে-পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রথমে সমালোচনা করেন, তাহা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী-লিখিত 'উদাসিনী'। তিনি লেখেন :—

আমরা এই পদ্য গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়াছি।...এ গ্রন্থখানিতে প্রণেতার নাম নাই। তা' যাই হউক, গ্রন্থকার এক জন মন্দ লেখক নহেন। তিনি উচ্চ দরের লেখক না হইলেও একজন ভাল লেখক বটেন। তাঁহার বর্ণনাশক্তি সুন্দর, এবং ভাষাও খুব সরল। কিন্তু উদাসিনীর গল্পটি চোরাই মাল। গ্রন্থকার কবিবর গোল্ডস্মিথের সন্ন্যাসী (Hermit) নামক পদ্যটি সাজাইয়াছেন! পাঠকগণ উদাসিনীর সহিত ইংরাজ কবির সন্ন্যাসী মিলাইয়া দেখিবেন। তবে কিনা সে গল্পটি অতি ক্ষুদ্র, আর উদাসিনীর গল্পটি দীর্ঘ।

আমরা তৃতীয় বর্ষের 'বীণা'র মাত্র চতুর্থ সংখ্যাটি দেখিয়াছি। বীণা যন্ত্রের অবৈতনিক মুদ্রাকর শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—"বীণা যন্ত্রে অতি কষ্টে তৃতীয় বর্ষের বীণা শেষ হইয়া উহা বন্ধ হইল; তৃতীয় বর্ষের শেষাংশেও কবিতার পরিবর্ত্তে তাঁহার অদ্ভুত ডাকাত ও দুই সন্ন্যাসী ও অপরাপর একজন লেখকের চীনের কলসী নামক গল্প বাহির হইয়াছিল।"

'বীণা' চতুর্থ বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ১৫ কার্ত্তিক ১২৯৪ তারিখের পাক্ষিক 'অনুসন্ধান' পত্রে (পৃ. ৯২) প্রকাশ :—

> রাজকৃষ্ণ বাবু ঠনঠনিয়া পল্লীতে নিজের একটি থিয়েটার খুলিতেছেন ; সেইহেতু অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবার অবসর তাঁহার আদৌ নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'বীণা' বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং 'বীণা'র পঞ্চম বর্ষের জন্য যে কয়জন গ্রাহক অগ্রিম মূল্য জমা দিয়াছিলেন এখন তিনি টাকা ফেরত বা তাহাদের অভিলষিত পুস্তকাদি দিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতেছেন।

বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা 'বীণা'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি প্রাথমিক রচনার সন্ধান ইহাতে মিলিবে ; মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার প্রথম কবিতা "এক দিন" প্রথম বর্ষের (কার্ত্তিক ১২৮৪) 'বীণা'তেই প্রকাশিত হইয়াছিল। রামদাস সেন, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, অক্ষয়কুমার বড়াল, মনোমোহন বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি 'বীণা'র লেখক-শ্রেণিভুক্ত ছিলেন।

'গল্পকল্পতরু' : ১২৮৬ সাল হইতে রাজকৃষ্ণ 'গল্পকল্পতরু' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

> ...বীণা নামক কবিতাময়ী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্পকল্পতরু নাম দিয়া ফর্ম্মায় উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ করেন। উহার প্রথম গ্রন্থ হিরণ্ময়ী—হিরণ্ময়ী শেষ হইলে তখন গল্পকল্পতরু বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে বীণা প্রেস স্থাপিত হইলে উহার পুনঃপ্রচার করিয়া তাহাতে স্বপ্রণীত জ্যোতির্ম্ময়ী এবং অন্যান্য লেখকের শান্তিকুটীর* প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* 'শান্তিকুটীর' (ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) ও 'চীনের কলসী' (ডিসেম্বর ১৮৮২) শরচ্চন্দ্র দেবের রচনা বলিয়া 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' পুস্তকের "শরচ্চন্দ্র দেব"

বীণা যন্ত্র

আলবার্ট প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় রাজকৃষ্ণ অসুবিধায় পড়িলেন। তাঁহাকে সাময়িকভাবে 'বীণা'র প্রচার বন্ধ করিতে হইল—রামায়ণাদির অংশ-বিশেষ অন্যত্র মুদ্রণের বন্দোবস্ত করিতে হইল। এই অসুবিধা তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১২৮৮ সালে তিনি বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে কিছু ঋণ করিয়া সামান্য আয়োজনে ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ঠনঠনিয়ায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন; উহার নামকরণ হইল—'বীণা যন্ত্র'। ইহা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

বিবাহ

"বীণা যন্ত্র স্থাপনের কিছু দিন পরেই রাজকৃষ্ণ বিবাহ করেন। সেই বিবাহের ফল তাঁহার একমাত্র পুত্র রজনীরঞ্জন।"

বীণা-রঙ্গভূমি

মুদ্রণ-কার্য্যে ও পুস্তকাদি বিক্রয়ে রাজকৃষ্ণের দিনগুলি সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ গ্রহের ফেরে তাঁহার জীবন-স্রোত ভিন্নমুখী হইল। তিনি অভিনয়কুশলী ছিলেন; মাঝে মাঝে নানা স্থানে অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন। অভিনয়ের প্রশংসায় উন্মত্ত হইয়া তিনি স্বাধীনভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইলেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

প্রবন্ধে (পৃ. ৮৮৫) উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলি যে রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা নহে,—অন্য লেখকের, সে-কথা শরচ্চন্দ্র দেবও রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনকথায় উল্লেখ করিয়াছেন।

"রাজকৃষ্ণবাবু সেতারবাদনদক্ষ এবং অভিনয়-কার্য্য-নিপুণ ছিলেন।...তিনি সর্ব্ববিধ রসাভিনয় তুল্য দক্ষতার সহিত করিতেন। মূকাভিনয়েও তিনি প্রশংসিত। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরাই গ্রামে তাঁহার যত্নে এক অভিনয়-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে তিনি নিজে অভিনয় করিতেন। প্রথমে "আগমনী ও বিজয়া" নামে একখানি গীতাভিনয়, পরে তাঁহার "পতিব্রতা" পরিবর্ত্তিত করিয়া "সাবিত্রী" নামে একখানি গীতাভিনয় এবং কয়েকখানি প্রহসন তথায় অভিনীত হয়; কিন্তু সেই সব গ্রন্থের কাপী আর পাওয়া যায় নাই, কেবল কয়েকটী গীত গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট আছে।...তিনি যে কেবল সরাই গ্রামেই অভিনয় করিতেন, তাহা নয়। মাহেশে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে তিনি মাঝে মাঝে এ আমোদ করিতেন। কলিকাতার আর্য্য-নাট্য-সমাজের সঙ্গে তিনি প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয় করেন। ঐ অভিনয় উত্তম হওয়ায় অধ্যক্ষগণ, অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া দুই রাত্রি ঐ অভিনয় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে দেখাইলেন। কলিকাতার ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাগজে আর্য্য-নাট্য-সমাজের প্রহ্লাদচরিত্র বিশেষতঃ রাজকৃষ্ণবাবুর হিরণ্যকশিপুর অভিনয় উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসিত হইল। এদিকে রাজকৃষ্ণবাবুরও রাহুর দশা। তিনি সেই প্রশংসায় উন্মত্ত হইয়া নিজে বালক লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, এ অভিনয় কিন্তু অবৈতনিক নয়, উপার্জ্জনের জন্য। গুরুদাস বাবু প্রভৃতি তাঁহার দুই একটি বন্ধু তাঁহাকে এ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, বুঝাইলেন—সাধারণ দর্শকের অনেকেই রমণীর নৃত্যগীতবিহীন অভিনয় দেখিবে না। তিনি কিন্তু সে কথা শুনিলেন না; উৎসাহ দিবার লোক অনেক নিষেধ করিবার লোক অল্প, কাজেই বীণা রঙ্গভূমি স্থাপিত হইল।"

১২৯৪ সালের মাঝামাঝি ঠনঠনিয়া ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোডে বীণা-রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হয়। ৩১ অক্টোবর ১৮৮৭ (১৫ কার্ত্তিক ১২৯৪) তারিখের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ :—

"রাজকৃষ্ণ বাবু ঠনঠনিয়া পল্লীতে নিজের একটি থিয়েটার খুলিতেছেন, সেইহেতু অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবার অবসর তাঁহার আদৌ নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'বীণা' বন্ধ করিতে হইল।"

এই সংবাদ প্রকাশের মাসখানেকের মধ্যেই বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনয় সুরু হয়। প্রথম অভিনীত হইল রাজকৃষ্ণের লিখিত নূতন পৌরাণিক নাটক 'চন্দ্রহাস'। এই অভিনয় দেখিয়া 'অনুসন্ধান' ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৭ (২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৪) তারিখে লেখেন :—

"বীণা-রঙ্গভূমি।—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা-রঙ্গভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক। সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি আছে, তাহাই দূর করা তাঁহার উদ্দেশ্য; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই,—পুরুষ দ্বারা স্ত্রী-অংশ অভিনীত হয়। আর, ইহাই এ থিয়েটারের নূতনত্ব। সংপ্রতি 'চন্দ্রহাস' নামক একখানি হরিভক্তিময় নাটক ইহাতে অভিনীত হইতেছে। অভিনয় দোষশূন্য না হইলেও, সমিতির অনেক মেম্বর অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন।"

বীণা-রঙ্গভূমিতে ক্রমে ক্রমে চন্দ্রহাস, প্রহ্লাদ-চরিত্র, হরধনুর্ভঙ্গ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি সাফল্যের সহিত অভিনীত হইল। রাজকৃষ্ণের এই নব প্রচেষ্টায় কোন কোন ধনী পরিবার কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া সহানুভূতি দেখাইলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ (১৩ ফাল্গুন ১২৯৪) তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহে' প্রকাশ :—

"বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গভূমিতে রঙ্গপুর তাজহাটের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় ২৫০৲ এবং কুচবিহারের মহারাণী ২০০৲ টাকা দান করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে উপকৃত করিয়াছেন।"

শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—"প্রথম অভিনীত হইল 'চন্দ্রহাস'; খবরের কাগজে প্রশংসা অনেক হইল, কিন্তু অর্থাগম তাদৃশ হইল না। তবে সুবিধা এই, অভিনেতাগণ অবৈতনিক। হইলে কি হয় তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনার ব্যয় নিতান্ত অল্প নয়।" কিন্তু এত করিয়াও রাজকৃষ্ণ দল ঠিক রাখিতে পারিলেন না। ছয় মাস যাইতে-না-যাইতেই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে অভিনয় বন্ধ করিলেন; তাঁহাকে "দুঃখের কথা" লিখিতে হইল :—

"অনেক কাল চেষ্টা করিয়া, বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা-রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে হিমালয়ের এভারেষ্ট্‌ শৃঙ্গে তুলিয়াছিল; কিন্তু কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা। কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চারা গাছটির কীট—আমার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবে—প্রথমে কুটিল স্বার্থপরতাবারুদ ও গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাটে কি কেবল "সর্পাদপি ভয়ঙ্করো" জীব?...৫ শ্রাবণ ১২৯৫।" ('হরিদাস ঠাকুর')

রাজকৃষ্ণ ঋণপরিশোধের আশায় বীণা-রঙ্গভূমি অন্য একটি সম্প্রদায়—আর্য্য-নাট্য-সমাজের হাতে তুলিয়া দিলেন। ২৭ মে ১৮৮৮ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫) তারিখের 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ :—

"আর্য্য-নাট্য-সমাজ।—আজকাল আবার বীণা থিয়েটারে উহাঁরা 'চৈতন্যলীলা' ও 'চন্দ্রহাস' প্রভৃতির অভিনয় করিতেছেন।"

আর্য্য-নাট্য-সমাজ রাজকৃষ্ণ রায়ের নূতন নাটক 'হরিদাস ঠাকুর,' 'বৈশাখী চাঁপা' নামে প্রহসন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ভ্রান্তিবিলাসে'র নাট্য-রূপ কিছু দিন ধরিয়া অভিনয় করিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্ত্তৃক অভিনীত হওয়ায় বীণা-রঙ্গভূমিতে দর্শকের অভাব

ঘটিতেছিল। এই প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' ৯ নবেম্বর ১৮৮৮ তারিখের পত্রে যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সম্প্রতি আমরা বীণা রঙ্গভূমিতে আর্য্য নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং এখন অভিনয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঙ্গভূমিতে তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতার অভাব বিশেষ ক্ষতিজনক ; কিন্তু আর্য্য নাট্য সমাজ যেরূপ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে তাঁহারা যে রাজকৃষ্ণ বাবুর মহৎ উদ্দেশ্যও পূর্ণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল সহরে বেশ্যা সংযুক্ত থিয়েটার সকলের পশার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল পুরুষ অভিনেতা লইয়া স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও বলের কার্য্য ; তাহার পথে বিস্তর বিঘ্নবাধা। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও আর্য্য নাট্য সমাজ যে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।···

বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আর্য্য নাট্য সমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।"

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আর্য্য-নাট্য-সমাজ বীণা-রঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। রাজকৃষ্ণ মহাজনদের উৎপাতে উপেন্দ্রনাথ দাসকে মহিলা অভিনেত্রী সহযোগে অভিনয় করিবার জন্য বীণা-রঙ্গভূমি ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' লিখিলেন :—

"বাবু রাজকৃষ্ণ রায় অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়াই বীণা থিয়েটার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট বিশেষ সহানুভূতি না

পাইয়া এবং নিজেরও নানা অসুবিধা ও অভিনয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, তৎপরে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া সন্নীতিপরায়ণ ভদ্রলোকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায়ও রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘৃণা এবং লজ্জার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পোষকতা করিতে শিখে নাই। তাহা না হইলে এক কলিকাতা সহরেই "বেঙ্গল" "ষ্টার" "এমারেল্ড" বেশ্যা অভিনেত্রী মিশ্রিত এই তিনটী রঙ্গভূমি বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে? গত বৎসর কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার কতকগুলি বেশ্যা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার ভদ্রলোকদিগের প্রতিবন্ধকতায় তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতিপরায়ণ। আমরা শুনিতেছি "ন্যাশন্যাল" থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ বহুবাজারনিবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ দাশ সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া "নিউ ন্যাশনাল" নামে একটী থিয়েটার খুলিতেছেন এবং আপাততঃ বীণা থিয়েটারের ঘর ভাড়া লইয়া সেই স্থানেই অভিনয় করিবেন। উপেন্দ্রবাবু নাকি বেশ্যা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করাইবেন। তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন।"

'সুলভ সমাচার'-সম্পাদকের মন্তব্যে মর্ম্মাহত হইয়া রাজকৃষ্ণ সম্পাদককে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি পরবর্ত্তী ১৪ই ডিসেম্বরের পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"মহাশয়! গত ২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারের সুলভ সমাচারে দেখিলাম আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আপনি একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আপনি দুঃখিত হইয়া... আমিও দুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল অত্যন্ত ঋণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছি। আমি দরিদ্র হইয়াও যাঁহাদের জন্য নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা খোয়াইয়া, শক্তির অতীত ঋণ করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যার জন্য প্রাণ মন দেহ যত্ন চিন্তা পরিশ্রম এক সঙ্গে জড়াইয়া ডুব দিয়াছিলাম, তাঁহারা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না—বুঝিয়াও বুঝিলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই আমার সাধের আশা, সাধের যত্ন, সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল—আমাকেও মারিয়া গেল। এখন ঋণ ও সুদের বিভীষিকায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। মহাজনেরা অর্থাৎ ঋণদাতারা আমার নিকট অনেক টাকা পাইবেন। আমি বই কে তাঁহাদিগকে টাকা দিবে? অথচ টাকা দিতে পারি না। সুতরাং তাঁহারা ঋণ পরিশোধের জন্য, যাহাতে বেশী টাকা আদায় হয়, সেইরূপ হিসাবে আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়াইলেন। আর বেশী কি বলিব, এখন আমি প্রাণ থাকিতেও মৃত। আজ যদি কেহ আমার এই দুর্ব্বিষহ ভার শিথিল করিয়া দেন, তা হইলে আমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকেও সন্তুষ্ট ও আপনাদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি। ঋণ যে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, তা যে ঋণ-বিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে।

আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন?" কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তা নয়, তা নিশ্চিত নয়। "সামান্য ভাড়ার খাতিরে" নয়, আমার পক্ষে অসামান্য ঋণের যন্ত্রণায় এই কার্য্য

হইয়াছে। আপনি ত জানেন "Debt is the worst kind of poverty." ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে এই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য্য করিব। আপনি জানেন, মুখের কথায় অনেকে আমাকে আকাশে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায়— ম্যাও ধরিবার বেলায় তাহারাই আবার আমাকে পাতালের নিম্নতম তলায় ফেলিয়া দিল। এখন বলুন দেখি আমার অপরাধ, না তাহাদের অপরাধ? দেশে ত অনেক রাজা, উজির, জমিদার ও বড়, মেজো, ছোট কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন, অনেকরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যদি—বেশী নয় দুই চারি আনা এমন কি দুই চারি পয়সাও মাসে মাসে দিয়া আমার সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কি আমি আজ ধনে প্রাণে সারা হইতাম? অথবা আমার যদি প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকিত, তাহা হইলেও আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতাম। আমার গন্তব্য পথে কাঁটা পড়িয়াছে। আমার মন আছে, ধন নাই; ভক্তি আছে, শক্তি নাই।

আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া মানবচরিত্রের কত রকম ভোজবাজী ভেল্কিবাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা থিয়েটার না হইলে বোধ হয় সংসার থিয়েটারের এই সকল সং রং দেখিতে পাইতাম না। একান্ত বশম্বদ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

উপেন্দ্রনাথ দাসের নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার (জাতীয় নব-রঙ্গালয়) বীণা-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ২৭ জানুয়ারি ১৮৮৯ (১৫ মাঘ ১২৯৫) তারিখে 'অনুসন্ধান' লিখিলেন :—

"নিউ ন্যাসন্যাল থিয়েটার।—বীণা রঙ্গমঞ্চে উক্ত কোম্পানীর দ্বারা আজকাল 'দাদা ও আমি,' 'শরৎ সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইতেছে। বিলাত-প্রত্যাগত

খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত থিয়েটারটি পরিচালিত।"

নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার ক্রমে হিরণ্ময়ী, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতির অভিনয় করিয়া, ছয় মাস পরে বীণা-রঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। এবার রাজকৃষ্ণ স্বয়ং বীণা-রঙ্গভূমির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, বালকের পরিবর্ত্তে অভিনেত্রী লইয়া রঙ্গভূমি পরিচালনায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ২৮ জুন ১৮৮৯ (১৫ আষাঢ় ১২৯৬) তারিখে 'অনুসন্ধান' ঘোষণা করিলেন :—

> "বীণা-রঙ্গভূমি।—সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় পুনরায় স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার 'বীণা-রঙ্গভূমির' ভার লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। কয়েক মাস বন্ধে নূতন নাটক লিখিয়া—সুনিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দ্বারা তাহা অভ্যাস করাইয়া, বর্ত্তমান মাসের শেষ তকই তিনি তাঁহার নিজের রঙ্গালয়টি আবার খুলিতেছেন। এবার স্ত্রীলোক লইয়া তাঁহার থিয়েটারে অভিনয় হইবে। অধিকন্তু আর্য্যনাট্যসমাজের সেই সুদক্ষ অভিনেতাগণও, শুনিলাম, উহাতে যোগ দিয়াছেন।"

পরবর্ত্তী জুলাই মাসে রাজকৃষ্ণ নব-রচিত 'মীরাবাই' নাটক লইয়া বীণা-রঙ্গভূমির দ্বারোন্মোচন করিলেন।

'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' এত দিন রাজকৃষ্ণকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে অভিনেত্রী লইয়া রাজকৃষ্ণ আসরে নামিয়াছেন সংবাদ পাইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে ২৬ জুলাই ১৮৮৯ তারিখে লিখিলেন :—

> "আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবু অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে যখন উপেন্দ্রবাবুকে অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটারগৃহে অভিনয় করিবার জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু ভাড়া দেন, তখন তাঁহার সঙ্গে

আমাদের এ বিষয় লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। সে সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু আমাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, ঋণদায়ে পড়িয়া আমি এই কার্য্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট আমরা ইহাও আভাস পাইয়াছিলাম যে, এইরূপ ভাড়া দিয়া তিনি ঋণমুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্বের ন্যায় নিজে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি নিজেই অভিনেত্রী লইয়া থিয়েটার খুলিলেন। যদিও তাঁহার এখনও সেই উত্তর যে, ঋণদায়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা কখনই আশা করি নাই যে, রাজকৃষ্ণ বাবুর মত লোক এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর এই কার্য্যে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। বীণা থিয়েটারের ঋণ শোধের কি তিনি আর কোন সদ্‌উপায় বাহির করিতে পারিলেন না?"

রাজকৃষ্ণ স্বীয় রঙ্গভূমির জন্য নব নব নাট্যগ্রন্থ—মীরাবাই, চমৎকার, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, জগা পাগ্‌লা প্রভৃতি লিখিলেন; কিন্তু অভিনেত্রী লইয়া সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়াও লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহার ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। নিরুপায় হইয়া তিনি সাধারণের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯০ (১৫ পৌষ ১২৯৭) তারিখের 'অনুসন্ধানে' বাহির হইল:—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

এই হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশের একজন কবি। দুর্ভাগ্যক্রমে কি এক কুক্ষণে তিনি কবিতা-কানন ছাড়িয়া, দেশীয় রঙ্গভূমির সংস্কার করিতে যান। আজ তাই তিনি সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া বিপন্ন অবস্থায় পতিত। এমন কি, এখন যদি দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে

কিছু কিছু সাহায্য না করেন, তবে আর তাঁহার কোন আশাই নাই। তাই আজ তিনি সাধারণের নিকট কৃপাপ্রার্থী। এখন সকলেই যাহার যেমন সাধ্য, রাজকৃষ্ণ বাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন, সাধারণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ। রাজকৃষ্ণবাবুর ঠিকানা ৩৮ নং মেছুয়া বাজার রোড, কলিকাতা।

রাজকৃষ্ণ রঙ্গভূমির ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ১২৯৭ সালের শেষাশেষি তাঁহার বড় সাধের বীণা-রঙ্গভূমি হস্তান্তরিত হইয়া গেল। তাঁহার শেষ দিনগুলি বড়ই দুঃখময়। এই দুর্দ্দিনে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ মাসিক এক শত টাকা বেতনে তাঁহাকে নিজেদের গ্রন্থকার করেন (ইং ১৮৯১)। তিনি ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য নরমেধ যজ্ঞ, লয়লা-মজনু, বনবীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, বেনজীর—বদ্‌রেমুনির রচনা করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

স্বনামধন্য রাজকৃষ্ণ জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ২৮ ফাল্গুন ১৩০০ (১১ মার্চ ১৮৯৪) তারিখে, মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ৩০এ ফাল্গুন 'অনুসন্ধান' পত্র যে প্রস্তাব লেখেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বঙ্গভাষা একটি রত্নহীন হইল—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় আর নাই। গত ২৮এ ফাল্গুন রবিবার, দ্বি-প্রহরের সময়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া—পুত্রপরিবারকে কাঁদাইয়া তিনি দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।
>
> অন্তরে যেন শেল বিঁধিয়াছে। এমন সুহৃদ্, এমন অকপট বন্ধু, এমন হিতৈষী—এমন ভাবে এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ যে আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।

গ্রন্থাবলী

রাজকৃষ্ণ দ্রুত এবং অনর্গল লিখিতে পারিতেন। তাঁহার সুহৃৎ ও সহকর্ম্মী শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন, "একবার আমি তাঁহাকে একদিন সন্ধ্যার সময় বলি যে কাল আমার সিন্ধুবধবিষয়ক একখানি নাটক চাই। তাহার ফলে পরদিন ১২॥টার সময় তাঁহার দশরথের মৃগয়া নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" স্বল্পপরিসর জীবনে রাজকৃষ্ণ যে-সকল কাব্য, নাটক-প্রহসনাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।* আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত

১। **বঙ্গভূষণ** (কবিতা)। ২৫ পৌষ ১২৮০ (১২ জানুয়ারি ১৮৭৪)। পৃ. ৭২।

"বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দ্দশপদী কবিতানুসারে···বিরচিত।"

২। **মহন্ত বিলাপ !!!** (কাব্য) ১২৮০ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৭৪)। পৃ. ১২।

ইহার এক খণ্ড ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে আছে।

---

* বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত রাজকৃষ্ণের যোগ ছিল। ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত রামায়ণ, বালকাণ্ডের আখ্যা-পত্রে উহার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

"Member of the Society of Bengali Literature, Calcutta ; Member of the Society of Literary Criticism, Jayadevapur, Dacca, Bengal ; Member of the Society for the Acquisition of Knowledge, Calcutta ; Member of the Good Will Fraternity, Calcutta ; etc., etc., etc."

৩। **কবিতাকৌমুদী** :

১ম ভাগ। ১২৮১ সাল (২০ জানুয়ারি ১৮৭৫)। পৃ. ৪৮।

২য় ভাগ। ১২৮১ সাল, ইং ১৮৭৫। পৃ. ৭২।

৪। **কাশীমবাজার-রাজবংশের বিবরণ**। ১ আশ্বিন ১২৮২, ইং ১৮৭৫। পৃ. ৬২।

৫। **পতিব্রতা** (নাট্যগীতি)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৮২ (৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫)। পৃ. ৬+৫০।

৬। **হিন্দী-বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়**। ইং ১৮৭৫ (?)।

৭। **ভারতে যুবরাজ** (কাব্য)। ইং ১৮৭৫ (৭ জানুয়ারি ১৮৭৬)। পৃ. ৪২।

ইহার পরিশিষ্টে দুইটি গীতের ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-কৃত স্বরলিপি আছে।

৮। **অবসর-সরোজিনী** (কাব্য):

১ম ভাগ। বৈশাখ ১২৮৩ (১৩ মে ১৮৭৬)। পৃ. ২৩৪।

২য় ভাগ। ১২৮৬ সাল (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ২৭১।

৩য়-৪র্থ ভাগ—গ্রন্থাবলীর ২য় ও ৪র্থ ভাগে প্রথম প্রকাশিত।

৯। **স্তবমালা** (কাব্য)। ১২৮৩ সাল (১৮ জুন ১৮৭৬)। পৃ. ২৪।

সংক্ষেপে পৌরাণিক সৃষ্টি প্রকরণের বর্ণনা। ইহার এক খণ্ড ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে আছে।

১০। **নাট্যসম্ভব** (উপরূপক)। ভাদ্র ১২৮৩ (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ১৪।

১১। **ভারত-ভাগ্য** (কবিতা)। (২৪ জানুয়ারি ১৮৭৭)। পৃ. ১২।

"মহারাণীর নূতন উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।" ('এডুকেশন গেজেট', ১২-১-৭৭)

১২। **রামায়ণ**। (সপ্তকাণ্ড)। ইং ১৮৭৭-৮৫।

"মহর্ষি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহাতে সর্ব্বসাধারণ, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাল্মীকির তেজস্বিনী প্রতিভা, কল্পনার ক্ষমতা, সৃষ্টি চাতুর্য্য, মনোমোহিনী বর্ণনা এবং কবিত্বের বৈচিত্র্য বুঝিতে পারেন, তাহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে কথা এই, মূলে যাদৃশ রস থাকে, অনুবাদে তাহা ঠিক সেইরূপ কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহাতে মূলের সহিত অনুবাদের ঘটনাদি সম্বন্ধীয় বৈলক্ষণ্য দোষ না ঘটে, আমরা সেইরূপ করিতেছি। ...এই পদ্য রামায়ণের টীকার জন্য রামায়ণসংক্রান্ত নানাবিধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করা হইয়াছে।"...বালকাণ্ড, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

১২৮৪ সালের বৈশাখ (মে ১৮৭৭) হইতে রামায়ণ খণ্ডশঃ বাহির হইতে সুরু হয়; ক্রমে খণ্ডগুলি একত্র করিয়া আখ্যা-পত্র ও পরিশিষ্টাদি সহ সাতটি কাণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে প্রচারিত হয়। প্রথম তিন ও শেষ কাণ্ডের প্রকাশকাল এইরূপ :—

বালকাণ্ড। নবেম্বর ১৮৭৭ (বাং ১২৮৪)। পৃ. ২২৮।
অযোধ্যাকাণ্ড। ভাদ্র ১২৮৫। পৃ. ৩৭৮।
আরণ্যকাণ্ড। চৈত্র ১২৮৬। পৃ. ১৩৬।...
উত্তরকাণ্ড। আষাঢ় ১২৯২, ইং ১৮৮৫।

১৩। **নিশীথ চিন্তা** (কাব্য)। আশ্বিন ১২৮৪ (১০ নবেম্বর ১৮৭৭)। পৃ. ৩৮।

ইহা রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে 'নিভৃত নিবাসে'র প্রথম সর্গ-রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৪। **অনলে বিজলী** (নাটক)। ১ বৈশাখ ১২৮৫ (৭ এপ্রিল ১৮৭৮)। পৃ. ১৫৫+স্বরলিপি।/০।

প্রধানতঃ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "উৎসাহ ও বিশেষ আনুকূল্য" এবং ঢাকা-জয়দেবপুর সাহিত্য-সমা[illegible]না সভার প্রতিষ্ঠাতা কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও মহারাণী শরৎসুন্দরীর আনুকূল্যে রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৫। **নিভৃত নিবাস,** ১ম খণ্ড (কাব্য)। ১২৮৫ সাল (২৯ জুন ১৮৭৮)। পৃ. ১২১+১ শুদ্ধিপত্র।

ইহাই রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলীর ১ম ভাগে সনি[illegible] 'নিভৃত নিবাসে'র ২-৫ সর্গ; ৬-৯ সর্গ প্রকৃতপক্ষে 'নিভৃত নিবাসে'র ২য় ভাগ-রূপে গ্রন্থাবলীতেই প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৬। **দ্বাদশ গোপাল** (প্রহসন)। ১২৮৫ সাল (১১ জুলাই ১৮৭৮)। পৃ. ২০।

১৭। **ভারত-গান**। ১২৮৫ সাল (১৮ জুলাই ১৮৭৯)। পৃ. ৫৪।

১৮। **দেবসঙ্গীত** (কাব্য)। ১২৮৬ সাল, ইং ১৮৭৯ (?)।

১৯। **ভারত-সান্ত্বনা** (কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক)। ১২৮৬ সাল, ইং ১৮৭৯ (?)।

২০। **লোহকারাগার** (নাটক)। ১২৮৬ সাল (২৮ জ[illegible]য়ারি ১৮৮০)। পৃ. ১১৬।

২১। **হিরণ্ময়ী** (উপন্যাস):

১ম খণ্ড। ১২৮৬ সাল (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ১৯২।
২য় খণ্ড। ১২৮৭ সাল (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮০)। পৃ. ১৯৩-৩৪০।

২২। **তারক-সংহার** (নাটক)। ১২৮৭ সাল (২০ জুলাই ১৮৮০)। পৃ. ১৮৭।

২৩। **ভারতকোষ**। ইং ১৮৮০-৯২।

"বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতত্ত্ব; ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সাহিত্য, সঙ্গীতশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আর্য্যগণের কর্ম্মকাণ্ড, প্রাচীন ভূগোল, ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি বিষয়ক অভিধান। ...শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত।"

ইহা প্রথমে খণ্ডশঃ প্রচারিত হয়। আলবার্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত প্রথম খণ্ডের (পৃ. ১-৭৬) প্রকাশকাল—১২৮৭ সাল (৭ আগষ্ট ১৮৮০)। 'ভারতকোষে'র খণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া তিন ভাগে প্রচার করিবার ব্যবস্থা হয়। এই তিন ভাগের প্রকাশকাল :—

১ম ভাগ (অ-ঙ)। ১৫ কার্ত্তিক ১২৮৯। পৃ. ৫৩৮।
২য় ভাগ (চ-ন)। ১২৯২ সাল। পৃ. ৫৩৯-১১১০।
৩য় ভাগ (প-হ)। ১২৯৯ সাল। পৃ. ১১১১-১৬৫০।

২৪ **খোসগল্প** (ইং ১৮৮০-৮৫):

(১) ঘোড়ার ডিম। ১২৮৭ (১৮ অক্টোবর ১৮৮০)। পৃ. ১২।
(২) কুপোকাৎ। ১২৮৭ (১৫ আগষ্ট ১৮৮১)। পৃ. ১২।
(৩) পাঁচ ঝাঁটা।? (ইং ১৮৮২?)।* পৃ. ১২।
(৪) ষোলবছরী পেত্নী। ১২৯০ (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)। পৃ. ২৪।
(৫) আদুরে ছেলে। ২ ফাল্গুন ১২৯১ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫)। পৃ. ২৪।
(৬) রসগোল্লা। ৩০ ফাল্গুন ১২৯১ (৩ মে ১৮৮৫)। পৃ. ১২।
(৭) গেঁজেল গদা। ৯ চৈত্র ১২৯১ (৬ মে ১৮৮৫)। পৃ. ১২।

* 'কল্পনা'র (বৈশাখ ১২৮৯) সমালোচিত।

(৮) এ মেয়ে পুরুষের বাবা। ১২ বৈশাখ ১২৯২ (২১ জুন ১৮৮৫)। পৃ. ১২।

(৯) টাকার তোড়া। ২০ বৈশাখ ১২৯২ (২১ জুন ১৮৮৫)। পৃ. ২০।

(১০) 'নতুন বৌ,' (১১) 'বোকা শিবে' :

এ দুইটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় নাই ; প্রথমে ৪র্থ বর্ষের 'বীণা'য় (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও মাঘ ১২৯৩) এবং পরে ৩য় ভাগ রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয়।

২৫। **শিশুকবিতা** (সচিত্র)। আশ্বিন ১২৮৮, ইং ১৮৮১। পৃ. ৩৪।

২৬। **হরধনুর্ভঙ্গ** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। ১২৮৮ সাল (২৮ জুলাই ১৮৮২)। পৃ. ১২০।

"বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত"। ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর বা আভিনয়িক ছন্দে লিখিত।

২৭। **রামের বনবাস** (নাটক)। ১২৮৯ সাল (১৫ আগষ্ট ১৮৮২)। পৃ. ১২৫।

২৮। **দুই শিকারী** (উপন্যাস)। ১২৮৯ সাল (১৭ আগষ্ট ১৮৮২)। পৃ. ৮৬।

২৯। **শ্মশান ও জীবন** (কাব্য)। ১২৯০ সাল (৫ জুলাই ১৮৮৩)। পৃ. ১৬।

৩০। **কেশব-বিয়োগ** (কাব্য)। ১২৯০ সাল (২৪ জানুয়ারি ১৮৮৪)। পৃ. জীবনী ৷৹ + ২৪ + পরিশিষ্ট ক-ঞ।

৩১। **যদুবংশধ্বংস** (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯০ সাল (১ মার্চ ১৮৮৪)। পৃ. ১২৪।

৩২। **তরণীসেনবধ** (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯১ সাল (১৫ জুলাই ১৮৮৪)। পৃ. ১০৪।

৩৩। **রাজা বিক্রমাদিত্য** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২৯১ সাল (২৫ আগষ্ট ১৮৮৪)। পৃ. ১৪৪।*

৩৪। **প্রহ্লাদ-চরিত্র** (পৌরাণিক নাটক)।

দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :— "গত বৎসর [১২৯১ সাল] আশ্বিন মাসে পূজার পরেই একখানি নাটক অভিনয় করিবার জন্য বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি প্রস্তুত হন। আমি তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকখানি লিখিয়া দি।···২৬এ আশ্বিন শনিবার রাত্রিতে ইহার প্রথম অভিনয় করেন। সে সময়ে আমার অবকাশ না থাকাতে প্রহ্লাদ-চরিত্রের অন্তর্গত গীতগুলির মধ্যে ছয়টি গীত লিখিয়া দিবার সময় পাই নাই। কিন্তু এদিকে শীঘ্র অভিনয় করিবার প্রয়োজন হওয়াতে উক্ত থিয়েটার কোম্পানি আমার ইচ্ছাক্রমে ছয়টি গীত রচনা করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। তার পর আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সময় স্বতন্ত্র ছয়টি গীত রচনা করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি।···"

---

* এই পুস্তকের মলাটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :— "মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'টেম্পষ্ট' (Tempest), হামলেট' (Hamlet) 'ম্যাকবেথ' (Macbeth), 'ওথেলো' (Othelo), 'জুলিয়স্ সিজার' (Julius Caesar), এবং 'রোমিও ও জুলিয়েট' (Romeo & Jullet) নাটক কএকখানি বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাকারে মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।" কিন্তু পুস্তকগুলি শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

এই নাটকখানি, খুব সম্ভব স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই,—২য় ভাগ রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলীতেই প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩৫। **রুসিয়ার ইতিহাস**। ২৫ আষাঢ় ১২৯২ (জুলাই ১৮৮৫)। পৃ. ১০২।

৩৬। **মহাভারত**। ইং ১৮৮৬-৯৩।

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে...সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যে অবিকল অনুবাদিত। (বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ গ্রন্থ হইতে নানাবিধ টীকাসমেত।)"

মহাভারত প্রথমে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের (পৃ. ৬৪) প্রকাশকাল—৩০ জুন ১৮৮৬। পরে খণ্ডগুলি একত্র করিয়া তিন ভাগে মহাভারত প্রচারিত হয় :—

আদিপর্ব্ব ও সভাপর্ব্ব। ফাল্গুন ১২৯৩। পৃ. ৩৫৬।

বনপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্ব। ?। পৃ. ৩৫৭-৬৬০।

উদ্যোগপর্ব্ব অবধি স্বর্গারোহণপর্ব্ব। ?। পৃ. ১৬০।

এই তিন ভাগের সমবায়ে মহাভারতের "গার্হস্থ্য সংস্করণ" প্রকাশিত হয়—১২৯৮ সালে।

মহাভারতের একটি রাজসংস্করণ প্রকাশের জন্য ভাওয়াল-রাজ তৎপ্রতিষ্ঠিত জয়দেবপুর সাহিত্য-সমালোচনী সভা হইতে রাজকৃষ্ণকে বার হাজার টাকা আনুকূল্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ৬ মাঘ ১২৯৫ (১৮ জানুয়ারি ১৮৮৯) তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভাওয়ালাধিপতি ও সাহিত্যসমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় আমার

পদ্যানুবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয় ১২,০০০৲ বার হাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সংখ্যানুক্রমে টাকা পাঠাইতেছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী ও 'বান্ধব' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১২৯৭ সালে (ইং ১৮৯০) মহাভারতের রাজসংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহা ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে উৎসর্গীকৃত ; উৎসর্গ-পত্রের তারিখ—"মহাষ্টমী, ৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৭ সাল।" রাজকৃষ্ণ রাজ-সংস্করণের কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৩০৮ সালে গুরু-দাস চট্টোপাধ্যায় "গার্হস্থ্য সংস্করণের" সাহায্যে রাজসংস্করণ মহাভারত সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করেন ; প্রকাশকের "বিজ্ঞাপন" এইরূপ :—

> স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়, ১২৯৩ সালের প্রারম্ভ হইতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সংস্করণের পুস্তকে টীকা টিপ্পনি কম থাকিত, এবং ইহার অক্ষরগুলিও ক্ষুদ্র ছিল। এই ন্যূনতার পরিহার-প্রয়াসে তিনি মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি অকালে লোকান্তরিত হওয়ায়, এই রাজকীয় সংস্করণ মহাভারতের কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনেক যত্ন ও পরিশ্রমের বস্তু একেবারে নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া, আমরা তাঁহার গার্হস্থ্য সংস্করণ মহাভারতের সাহায্যে, ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম।
>
> ভীষ্ম পর্ব্বের কিয়দংশ পর্য্যন্ত তিনি অতি বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার ইহলোকের কার্য্য শেষ হইবে বুঝিয়া, তিনি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে ব্যগ্র হন, এবং রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই শেষ অংশের রচনা সমাপ্ত করেন।

এজন্য অবশিষ্ট অংশ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহা সর্ব্বত্রই মূলের সম্পূর্ণ অনুগত ও একান্ত সুখপাঠ্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য যত্ন স্বীকারপূর্ব্বক মহাভারতের এই রাজসংস্করণ সম্পূর্ণ করিয়া, সাধারণের সমীপে উপস্থিত করিলাম।…১৪ই ভাদ্র ১৩০৮ সাল।

মহাভারতের পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; তিনি লেখেন :—

আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের দুইখানি অনুবাদ আছে; (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে; উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মূলানুযায়ী বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোকশিক্ষার্থই মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোকশিক্ষার্থ ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে; অথচ সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইবে। আপনার কৃত পদ্যানুবাদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অনুবাদ সকলের সুখগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য্য অতি গুরুতর; আপনার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি, তাং ৭ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

৩৭। **কবিতা।** আশ্বিন ১২৯৪ (২০ অক্টোবর ১৮৮৭)। পৃ. ৫৪৮

এই "Pocket Edition"টি অক্ষয়কুমার বড়াল-সম্পাদিত। তিনি পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"অনেকে বলেন, রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলী পড়িয়া উঠা বাঙ্গালী-জীবনে দুঃসাধ্য। তাঁহাদের জন্যই রাজকৃষ্ণ বাবুর এই সঙ্কলিত কবিতা-পুস্তকখানি প্রচারিত হইল।"

সূচিপত্র : **ধর্ম্ম** :—ভক্তের হরিনাম-গান, ভক্তের রোদন। **পুরাণ** :—হরিহর-মূর্ত্তি, কৈলাসে সরস্বতী, ভক্তিপরীক্ষা, সীতা ও সরমা, মন্দোদরী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী। **প্রেম** :—প্রেম, প্রণয়, সেটি "প্রণয়-রতন" লো, কোন নববিবাহিতা বন্ধুর প্রতি, পূর্ব্বরাগ, চিত্র, কে তুমি ?, মধুর মধুর, বিজলী, কমলে কমল, প্রিয়তমা হাসিল, নলিনী, মেরিয়ার প্রতি, তোমাতে আমাতে তেমনি প্রেম, সেই মুখখানি, আকর্ষণ, অদর্শনে, বিলাপ, ভালবাসার পরিণাম, যন্ত্রণার অবসান। **গাথা** :—জাগ্রত স্বপন, সরলা, বিজয়, নলিনী (গীতিকা)। **প্রকৃতি** :—গ্রীষ্ম, নিদাঘ-জলদ, বর্ষা, শরৎ, শারদীয় জলদখণ্ড, পূর্ণচন্দ্র, হেমন্ত, গঙ্গাতটে সন্ধ্যা, শীত, বসন্ত, বসন্ত (বিদ্যাপতির অনুকৃতি), প্রভাতে গিরিদর্শন, প্রভাত, মধ্যাহ্নদর্শন, সন্ধ্যাদর্শন, পৌর্ণমাসী রজনীদর্শন, নিশীথ, নির্ঝরদর্শন। **সমাজ** :—ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি, বঙ্গবিধবা, বঙ্গবধূর কুন্তল, দ্বাদশ গোপাল, বাঙ্গালী, বিদায়, সারস্বত-সম্মিলন, চাটুকার, পতির পত্নী-সংস্কার, প্রেমশিক্ষা, টহল, শুভ যোগ। **উদ্দীপনা** :—উদ্দীপনা, কালের শৃঙ্গবাদন, শবদাহন, স্বদেশ-প্রিয়ের শেষ দেখা, দৈববাণী, এই—সেই ভস্মরাশি, দুইখানি চিত্রপট, বিজয়া-দশমী, নিয়তি, প্রতিধ্বনি, স্মৃতি, দানবী নদী। **বিবিধ** :—ভুলিব না, বীণা, অভাগার বিধাতা, প্রাণের হাসি, হাসির বিষাদ, কৃষ্ণের মুরলী, মধুমক্ষিকা-দংশন, নিদ্রা, স্বপ্ন, অশ্রু, কল্পনা, শ্মশান, কেন ?, নলিনীর মৃত্যুতে, ভগ্নাশ্রম-দর্শন, গিরিবনান্তে সমাধি-দর্শন, জীবন-রহস্য, মৃত্যু-রহস্য, 'অনন্ত' কি ?

৩৮। **চন্দ্রহাস** (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯৫ সাল (১৬ জুন ১৮৮৮)। পৃ. ১১৫।

৩৯। **হরিদাস ঠাকুর** (নাটক)। শ্রাবণ [illegible] (২৫ জুলাই ১৮৮৮)। পৃ. ৯০।

৪০। গান। ১২৯৫ সাল (২১ আগস্ট ১৮৮৮)। পৃ. ২৫৪।
শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক সম্পাদিত।

৪১। **কলির প্রহ্লাদ** (ব্যঙ্গনাটক)। ১৫ ভাদ্র ১২৯৫ (২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ৭০।

৪২। **পূজার বাজার** (রহস্য কবিতা)। ১২৯৫ সাল (১৫ অক্টোবর ১৮৮৮)। পৃ. ৮।

৪৩। **কাণা কড়ি** (বিদ্রূপহাসক)। ১২৯৫ সাল (২৮ অক্টোবর ১৮৮)। পৃ. ২২।

৪৪। **অদ্ভুত ডাকাত** (উপন্যাস)। ৩ পৌষ ১২৯৫ (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯)। পৃ. ১৮৮।

৪৫। **মীরাবাই** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২৯৬ সাল, ইং ১৮৮৯ (?)। পৃ. ৮১।*

৪৬। **জ্যোতির্ম্ময়ী** (উপন্যাস)। ১৫ চৈত্র ১২৯৫ (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ১৯৪।

৪৭। **চমৎকার** (আশ্চর্য্য-ঘটনা-মূলক নাটক)। ইং ১৮৮৯ (?)†

---

* ১৫ শ্রাবণ ১২৯৩ (৩০ জুলাই ১৮৮৯) তারিখের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ :—"বীণা-রঙ্গভূমি। কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন নাটক 'মীরাবাই' উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল বড়ই দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে।"

† "বীণা রঙ্গভূমে 'চমৎকার'। সম্প্রতি বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের রঙ্গালয়ে 'চমৎকার' নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে।" 'অনুসন্ধান,' ৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৬ (২৯ নবেম্বর ১৮৮৯)।

৪৮। **খোকাবাবু** (প্রহসন)। ১২৯৬ সাল (২ মার্চ ১৮৯০)। পৃ. ১২।
৪৯। **বেলুনে বাঙালী বিবি** (প্রহসন)। ১২৯৬ সাল (২ মার্চ ১৮৯০)। পৃ. ১৩।
৫০। **ডাক্তার বাবু** (প্রহসন)। ১২৯৬ সাল (২৫ মার্চ ১৮৯০)। পৃ. ১৪।
৫১। **সত্যমঙ্গল** বা সত্যনারায়ণ-লীলা (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯৭ সাল (৯ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ৯৮।
৫২। **চতুরালী** (কৌতুক-নাট্যগীতি)। (১১ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ১২।*
৫৩। **চন্দ্রাবলী** (নাট্যগীতি)। ১২৯৭ সাল (২৬ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ২৬।
৫৪। **টাটকা-টোটকা** (প্রহসন)। ১২৯৭ সাল (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯০)। পৃ. ২০।
৫৫। **জগা পাগ্‌লা** বা জ্যান্তে মরা (প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ)। ১২৯৭ সাল (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯০)। পৃ. ৩২।
৫৬। **লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র** (সামাজিক ব্যঙ্গনাটক)। ? (৪ অক্টোবর ১৮৯০)। পৃ. ৬৪।
৫৭। **জুজু**! (প্রহসন)। ১২৯৭ সাল (৬ অক্টোবর ১৮৯০)। পৃ. ২৪।
৫৮। **কতিপয় কবিতা**। ইং ১৮৯০। পৃ. ৪২।
"ইংরাজী অনুবাদ ও টীকা সহিত।"

---

* "বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আদৌ একখানি কৌতুক-নাটগীতি (Comic opera) কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীতও হয় নাই। কিন্তু অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্ব্বপ্রথমে এই কমিক অপেরা 'চতুরালী' রচনা করিলাম।"

৫৯। **রাজা বংশধ্বজ** (নাটক)। ১২৯৭ সাল (১৫ জানুয়ারি ১২৯১)। পৃ. ২৯।

৬০। **হীরে মালিনী** (নাট্যগীতি)। ১২৯৭ (১৮ জানুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ২৯।

৬১। **লক্ষহীরা** (নাটক)। ১৯ পৌষ ১২৯৭ (২৫ জানুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ৯০।

৬২। **প্রহ্লাদ-মহিমা** বা প্রহ্লাদ-চরিত্র—২য় খণ্ড (হরিভক্তিমূলক নাটক)। ১২৯৭ সাল (২৮ জানুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ৫১।

৬৩। **নরমেধযজ্ঞ** (নাটক)। ১২৯৮ সাল (১ আগস্ট ১৮৯১)। পৃ. ১১১+।/০।

৬৪। **সরল কবিতা**। ১২৯৮ সাল (২৬ অক্টোবর ১৮৯১)। পৃ. ৩০।

"তরলবুদ্ধি শিশুদিগকে প্রথম কবিতা শিক্ষা দিবার যোগ্য একখানি সরল পদ্য পুস্তকের নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায়, আমি 'সরল কবিতা' নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিলাম।"

৬৫। **লয়লা-মজনু** (গীতি-নাটিকা)। ১২৯৮ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯১)। পৃ. ৬৮।

৬৬। **কল্কিপুরাণ**। ১২৯৯ সাল (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ১৪৩।

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে…সরল বাঙ্গালা পদ্যে অবিকল অনুবাদিত ও নানাবিধ অতি প্রয়োজনীয় টীকা সন্নিবেশিত।"

৬৭। **বনবীর** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ (৩ ডিসেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ১২৪।

৬৮। **ঋষ্যশৃঙ্গ** (গীতিনাট্য)। ১২৯৯ সাল (৩১ ডিসেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ৫৪।

৬৯। **প্রতিফল** (প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস)। কার্ত্তিক ১৩০০, ইং ১৮৯৩। পৃ. ৪৮।

৭০। **বেনজীর—বদ্‌রেমুনীর** (গীতিনাটিকা)। ১৩০০ সাল (২১ ডিসেম্বর ১৮৯৩)। পৃ. ১১৬।

গ্রন্থাবলী ঃ ১২৮৯ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইলে সমগ্র গ্রন্থাবলী কয়েক ভাগে প্রচার করিবার ব্যবস্থা হয়। এমন অনেক রচনা, যাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে ; যেমন, 'দুর্ব্বাসার পারণ', 'নিভৃত নিবাস' কাব্যের ২য় ভাগ (৬-৯ সর্গ), শারদোৎসব, কালচক্র প্রভৃতি। আবার কোন কোন পুস্তক গ্রন্থাবলীতে পরিত্যক্ত হইয়াছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মহন্ত-বিলাপে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী সাত ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সূচী :—

১ম ভাগ। চৈত্র ১২৯০ (১৫ এপ্রিল ১৮৮৪)।

(১) অবসর-সরোজিনী, ১ম ভাগ, (২) অবসর-সরোজিনী, ২য় ভাগ, (৩) শারদোৎসব কাব্য, (৪) ভারত-গান, (৫) স্তবমালা, (৬) ভারতে যুবরাজ, (৭) দেবসঙ্গীত, (৮) গিরিসন্দর্শন, কাব্য, (৯) কালচক্র, কাব্য, (১০) নিশীথ চিন্তা, (১১) নিভৃত নিবাস, ১ম ভাগ, (১২) নিভৃত নিবাস, ২য় ভাগ, (১৩) ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী (মূল ও অনুবাদ), (১৪) লৌহকারাগার, (১৫) পতিব্রতা, (১৬) অনলে বিজলী বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা, (১৭) ভারত-সান্ত্বনা, (১৮) নাট্য-সম্ভব, (১৯) উৎকট বিরহ—বিকট মিলন বা আগমনী-বিজয়া, ঔপন্যাসিক হাস্যনাট, (২০) দ্বাদশ গোপাল, (২১) তারকসংহার, (২২) হিরণ্ময়ী, ১ম ভাগ, (২৩) হিরণ্ময়ী, ২য় ভাগ, (২৪) কিরণময়ী (হিরণ্ময়ী উপন্যাসের পরিশিষ্ট)।

২য় ভাগ। ১২ পৌষ ১২৯২, ইং ১৮৮৫। পৃ. ৪২৪।

(১) প্রহ্লাদ-চরিত্র, (২) গঙ্গা-মহিমা, পৌরাণিক নাটক, (৩) যদুবংশধ্বংস, (৪) রাজা বিক্রমাদিত্য, (৫) বামন-ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটক, (৬) দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ, পৌরাণিক নাটক, (৭) হরধনুর্ভঙ্গ, (৮) রামের বনবাস, (৯) অবসর-সরোজিনী, ৩য় ভাগ, (১০) ষড়্‌ঋতু, কাব্য, সচিত্র ও (১১) 'অনন্ত' কি ?

৩য় ভাগ। ৩২ শ্রাবণ ১২৯৫, ইং ১৮৮৮।

(১) দুর্ব্বাসার পারণ, পৌরাণিক নাটক, (২) ভীষ্মের শরশয্যা, পৌরাণিক নাটক, (৩) তরণীসেনবধ, (৪) খোসগল্প : ঘোড়ার ডিম, কুপোকাৎ, পাঁচ ঝাঁটা, ষোলবছুরী পেত্নী, আদুরে ছেলে, রসগোল্লা, গেঁজেল গদা, এ মেয়ে পুরুষের বাবা, টাকার তোড়া, নতুন বৌ, বোকা শিবে।

৪র্থ ভাগ। ১ ফাল্গুন ১২৯৫, ইং ১৮৮৯। পৃ. ২৫৬।

(১) চন্দ্রহাস, (২) হরিদাস ঠাকুর, (৩) অবসর-সরোজিনী, ৪র্থ ভাগ, (৪) অশ্বায়নের কবিতাবলী, (৫) পঞ্জাবী কাহিনী, (৬) অদ্ভুত গল্প, (৭) সাময়িক কবিতা, (৮) বঙ্গভূষণ, (৯) আগমনী, কাব্য, (১০) সঙ্গীত-স্বপ্ন, কাব্য, (১১) হেঁয়ালি অভিনয়, (১২) [illegible]কারী, (১৩) চীনের কলসী, গল্প, (১৪) দুই সন্ন্যাসী, গল্প, (১৫) হরিহর লীলা, দৃশ্যকাব্য, (১৬) জন্মাষ্টমী, চিত্ররঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ, (১৭) প্রমদ্বরা, পৌরাণিকী গীতিনাটিকা।

৫ম ভাগ। ১২৯৮ সাল (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২)।

(১) সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, (২) লক্ষপতি, পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক, (৩) রাজা বংশধ্বজ, (৪) অদ্ভুত ডাকাত, (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা, পৌরাণিক নাটিকা,

(৬) গিরিগোবর্দ্ধন, পৌরাণিক নাটিকা, (৭) দুটি মনচোরা, উপনাট্য-গীতি, (৮) চতুরালী, (৯) খোকাবাবু, (১০) বেলুনে বাঙালী বিবি, (১১) জুজু !, (১২) প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র, ২য় খণ্ড, (১৩) লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, (১৪) কাণা কড়ি, (১৫) পূজার বাজার।

ষষ্ঠ ভাগ। ১২৯৮ সাল (২৭ মার্চ ১৮৯২)।

চমৎকার, চন্দ্রাবলী, জ্যোতির্ম্ময়ী, মীরাবাই, ডাক্তারবাবু, জগা পাগ্‌লা, টাট্‌কা-টোট্‌কা, কলির প্রহ্লাদ।

৭ম ভাগ। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, ইং ১৮৯৪। পৃ. ১৭১।

রুশিয়া, দৃষ্টান্তকলিকাশতক, হীরে মালিনী, পঞ্চরত্ন, ষড়্‌রত্ন সপ্তরত্ন, অষ্টরত্ন, নবরত্ন, লক্ষহীরা, মোহমুদ্গার, প্রতিফল, প্রশ্নোত্তর-সুধা-লহরী, শ্মশান ও জীবন, ব্রজবিহার।

নাট্যকার ও নব-ছন্দ-প্রবর্ত্তক

রাজকৃষ্ণ কেবল সুকবিই ছিলেন না, তিনি এক জন সুদক্ষ অভিনেতা ও খ্যাতনামা নাট্যকারও বটেন। তাঁহার রচনার মধ্যে নাট্যগ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়—বেঙ্গল, ন্যাশনাল, বীণা ও ষ্টার থিয়েটারের জন্যই তিনি প্রধানতঃ নাট্যগ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁহার রচিত "এক 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক সংখ্যা হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটার কোম্পানি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।" ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত তাঁহার 'নরমেধযজ্ঞে'র কথা এখনও অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। রাজকৃষ্ণের নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহার প্রথম নাট্যগ্রন্থ—'পতিব্রতা' একখানি পৌরাণিক

নাট্যগীতি, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় ; তখনও গিরিশ-চন্দ্রের কোন নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রাজকৃষ্ণকে রঙ্গালয়ে পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য-যুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ অভিনয়-সৌকর্য্যার্থ বাংলা নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণ বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এই ছন্দে 'হরধনুর্ভঙ্গ' নামে একখানি পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য রচনা করেন। আভিনয়িক ছন্দের উপযোগিতা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। ভূমিকাটি এইরূপ :—

> দুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে এই 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি লিখিত হইল। তাঁহাদের অনুরোধ, নাটকখানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভাল হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্য্যন্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্য আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের" দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।
>
> এ দেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত. মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ সেই চতুর্দ্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্যখানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয়

নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি *যেরূপ শুনিয়াছিলাম,* তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদ-বধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ নট-চূড়ামণি ৺বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐরূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, "এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গ-ভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন।" ইংলণ্ডেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়া ছিল। এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ" বাঙ্গালায় হইত কি না সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে "জলবৎ তরল" এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারি দিনের মধ্যে এক একখানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই "জলবৎ তরল" ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে উপযোগী সুতরাং এই হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের অধিকাংশ স্থলেই ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে।

আমি ১২৮৫ সালে 'নিভৃতনিবাস' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু খণ্ড কাব্য প্রভৃতিতে ইহা যেন "একঘেয়ে" হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া অধিক লিখি নাই। যাহা হউক, এ স্থলে সেই স্থান তুলিয়া দিয়াছি। (মৃত পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তভাবে) বিজয় বলিতেছেন :—

প্রিয়তমে!—মনোরমে!
উঠ উঠ, বেলা হ'ল ;
উঠ না হে,
উঠ না হে,
থাক শুয়ে—থাক শুয়ে।

আমি কি নির্দ্দয়,
হায়,
জাগাই তোমায় তাই,
থাক শুয়ে,
উঠিও না,
খুল না খুল না আঁখি,…

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ;
অগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন ;
সূর্য্যকরে বিদগ্ধ ধরণী।
ডাকে না বিহঙ্গ শাখে,
রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে।
প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাহি আর ;
মূর্চ্ছিত হইয়া যেন আকুল-হৃদয়া।

বহি'ছে গঙ্গার বারি ধীরি ধীরি গতি,
নির্জ্জন প্রদেশে।
তরী নাহি একখানি ;
কেমনে হ'বেন পার রাম রঘুমণি
লক্ষ্মণের সনে ?
অয়ি গঙ্গে পতিতপাবনি !
কর পার ভব-সিন্ধু-পার-কাণ্ডারীরে,
দয়াময়ি !

রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা কাব্যে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই সম্মান গিরিশচন্দ্রেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ'

আভিনয়িক ছন্দে রচিত হইয়া একই বৎসরে—১২৮৮ সালে প্রকাশিত ও কয়েকদিনের ব্যবধানে অভিনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় নাট্যকারই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ রচনায় স্বাধীনভাবে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, মনে করাই সঙ্গত হইবে। তবে এই ছন্দ গিরিশচন্দ্রের হস্তে যেরূপ সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না।

বাংলায় গদ্য-কবিতার সূচনা: বাংলায় গদ্য-কবিতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্ব্বপ্রথম সচেতন হন। তিনি ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৪) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শনে' "বর্ষার মেঘ" নামে একটি গদ্য-কবিতা প্রকাশ করেন। উহার শেষে এই পাদটীকা আছে :—

> যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

রাজকৃষ্ণের লিখিত "বর্ষার মেঘ (পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক পদ্য-গদ্য)" রচনাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

আকাশ নীল—অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিকৃশোভিনী দিগঙ্গনার অঞ্জলি হ'তে
ধীরে ধীরে বায়ু-স্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।
সূক্ষ্ম মেঘ বলিলাম কেন?
অনন্ত নীলাকাশপট্টের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় যে মেঘ,
সে কি বৃহৎ?—না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তস্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর

যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে,
আমি তাই।
আমি, আকাশ-কোলে
ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে
'নাই' বলিলেই হয়।
অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে?—
মহান্ কে?
তা কি জান না;—ঈশ্বর।
একই কথা—যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল।

এ কি হ'ল?
এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতে
ক্ষুদ্র মেঘ বৃহৎ—বৃহত্তর হ'ল!
বামনমূর্ত্তি বিরাট্‌মূর্ত্তিতে পরিণত হ'ল!
অহো, ক্ষুদ্র মেঘ এত বড়!
বুঝিয়াছি—
জগতে কেহই ক্ষুদ্র নয়।
ক্ষুদ্র কেন হইবে?
যিনি জগতের স্রষ্টা
তিনি ক্ষুদ্র হইলে
জগৎ জগদ্বাসী প্রাণী অপ্রাণী ক্ষুদ্র হইত,
সুতরাং কেহই ক্ষুদ্র নয়।
যাহাকে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পরমাণু বলে
তাহা না কি এত ক্ষুদ্র যে
অণুবীক্ষণ-যন্ত্র চক্ষে না ধরিলে
দেখা যায় না—বোঝা যায় না,
আবার অণুবীক্ষণও কখন কখন হারি মানে।
তবে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকের মতে
পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম আর কিছুই নাই।

কিন্তু আমার বিবেচনায়
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বড় ভ্রান্ত ;
নহিলে এমন কথাও কি বলে ?
কি আশ্চর্য্য !
সকলের চেয়ে পরামাণু ক্ষুদ্র !
পরমাণু সর্ব্বক্ষুদ্র হ'লে
সর্ব্ববৃহৎ কে ?

ভাই বৈজ্ঞানিক !
একবার বেস্ ক'রে ভেবে দেখ দেখি,—
তোমার বিজ্ঞানের পুঁজীপাটা কি লইয়া ?
পরমাণু লইয়া নয় ?
তোমার সূর্য্য কি ?
চন্দ্র কি ?
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি আদি গ্রহ কি ?
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ ইউরেনস্ কি ?
বিশ্বসংসার কি ?
ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড তার পর ব্রহ্মাণ্ড—
এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড,
সে সকলই বা কি ?
পরমাণু নয় কি ?
যদি পরমাণুই হ'ল,
তবে তুমি কোন্ লজ্জায়—কোন্ মুখে
পরমাণুকে ক্ষুদ্র বল ?
যদি বল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুযোগে

এই সকল বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,
কিন্তু পরমাণু নিজে ক্ষুদ্র,
তবে তুমি ভ্রমের অঙ্ক কসিতে খুব মজবুৎ।
ভাই, তুমি কি জান না,
যাদের সংযোগে বা একতায়
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়িতে পারে,
তা'রা কখনো ক্ষুদ্র ?
তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?—ঈশ্বর।
ও একই কথা—যে ঈশ্বর সেই পরমাণু।

নাটকে পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্য

এই কবিতা প্রকাশের অল্পদিন পরেই রাজকৃষ্ণ রায় নাটকেও পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকের "বিজ্ঞাপনে" রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—

> "আমি এদিকে ক্রমান্বয়ে হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বনবাস, যদুবংশ-ধ্বংস এবং তরণীসেন বধ এই চারিখানি নাটক যে ছন্দে লিখিয়াছি, উহা আভিনয়িক অমিত্রাক্ষর পদ্যচ্ছন্দ। গত ১২৮৫ সালে মৎপ্রণীত নিভৃতনিবাস কাব্যের এক স্থলে আমি ঐ ছন্দের কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। তখন ঐ ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক প্রকাশিত হয় নাই।...
>
> "সম্প্রতি এই 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকখানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্ত্তে নূতন ধরণের গদ্যে রচিত হইল। ইহা আভিনয়িক পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্য। দুই এক স্থলে আভিনয়িক পদ্যচ্ছন্দও আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ

পদ্য-পৌণ্ড্রিক গদ্যে কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। অভিনেতৃ-গণের পক্ষে পদ্য যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গদ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যস্ত হইবার সুবিধার জন্য এই নূতন ধরণের গদ্য নাটক লিখিলাম। আমার বিবেচনায় প্রচলিত ধরণের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌণ্ড্রিক ধরণে গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগ্ধৃতি বা বাক্পূর্ত্তির (Prompting) পক্ষে এইরূপ গদ্য-পঙ্ক্তি যেমন অভিনয়-ব্যাঘাত-নিবারণের সুগম উপায়, টানা গদ্য-পঙ্ক্তিতে তেমন হইতে পারে না।"

রচনার নিদর্শনস্বরূপ আভিনয়িক পদ্য-পৌণ্ড্রিক গদ্যে লিখিত রাজা বিক্রমাদিত্য' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিক্রম—ভর্তৃহরির ধন্য সংসার-বিরাগ।
এই বিরাগের ফল "অমরুশতক" গ্রন্থ।
এই গ্রন্থে রমণী-প্রেমের কুটিল চিত্র
এবং বিবেকের মূর্ত্তি সুন্দর চিত্রিত হয়েছে।
যার লেখনী এমন গ্রন্থ রচনা করেছে,
তাকে পুনর্ব্বার সংসারী করা দুঃসাধ্য।
অনেক বল্লেম—অনেক বুঝালেম,
কিন্তু স্রোত কোন মতেই ফিরলো না।
থাক্, আর বিরক্ত করবো না।
মধ্যে মধ্যে নিজেই এসে ভর্তৃহরিকে দেখে যাবো
এখন আর এখানে বিলম্ব করবো না,
মহিষীকে ব'লে এসেছি শীঘ্রই ফিরবো,
কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো,
মহিষী না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন। (পৃ. ১২৭)

রাজকৃষ্ণ রায় ও বাংলা-সাহিত্য

বঙ্গ-বীণাপাণির ঐকান্তিক সেবা করিয়া যে সকল সাহিত্য-সাধক বাংলা দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কবি এবং সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাদের অগ্রণী। সে সময় লোকে যাহা কল্পনা করিতে পারিত না, তাহাই করিতে গিয়া তাঁহাকে ঘোরতর দুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই। সাহিত্য হইতে নাটক, নাটক হইতে রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক-প্রকাশ—এগুলি তাঁহার জীবনের সুখকর পরিবর্ত্তন নহে। হাঁড়ি চড়াইয়া সাহিত্য-সাধনা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অতি দ্রুত রচনা করিতে হইয়াছে, অসংখ্য পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার তুল্য এত অধিক রচনা এত স্বল্পপরিসর জীবন-কালের মধ্যে আর কেহ বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহার অল্প লেখাই সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল, গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, গল্পে, অনুবাদে, উপন্যাসে তাঁহার সমান হাত ছিল; এবং তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও সাহস ছিল অপরিসীম। নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যেও তিনি যে মূল বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত কবিতায় অনুবাদ করিবার সাহস ও ধৈর্য্য দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইবার কথা। তবে অপরিচয় ও অজ্ঞতার দরুণই আজিকার বাঙালী পাঠক তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে, 'অবসর-সরোজিনী' পড়ে না বলিয়াই কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে সে জানে না, পড়িলে "ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি" প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না। যাঁহারা তাঁহার কাব্য-গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন যে, তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই ভারতের পরাধীনতার জন্য হা-হুতাশে ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাঁহার কতকগুলি কবিতা এখানে সঙ্কলিত হইল।

অবসর-সরোজিনী ঃ

ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি !

১

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে কবে ;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি !

২

যদি বল, কেন বল হে এমন ?
কেন বলি ?—তা'র আছে যে কারণ ;
কোন্ জাতি, বল, এদের মতন
আলস্য-নরকে ডুবিয়া রয় ?
কোন্ জাতি, ছাড়ি' বাণিজ্য ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা,
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,
শির পাতি' পর-পাদুকা বয় ?

৩

শত্রু দেয় গালি, লয় কর পাতি,'
শত্রু মারে লাথি—পেতে দেয় ছাতি,
পর-পদ-সেবা করি' দিবারাতি
কোন্ জাতি করে জীবন ক্ষয় ?
কোন্ জাতি, বল, বাঙ্গালির মত
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত ?

কলুষিত করি' জীবনের ব্রত,
পাশব জীবনে সুখিত হয় ?

৪

বনের বরাহ—সেও সুখে থাকে,
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
হইতে দেয় না জীবন-প্র—
নবজিলণ্ডের অসভ্য জাতিরা,
(অসভ্য কে বলে ?—সুসভ্য তাহারা)
তা'দের আকাশে স্বাধীনতা-তারা,
পর-পদ-পূজা করে না কভু ।

৫

কিন্তু, হায় হায় কি লজ্জার কথা !
বাঙ্গালিরি শুধু দেহের ক্ষীণতা,
বাঙ্গালিরি শুধু মনের হীনতা,
বাঙ্গালি-জীবন কলঙ্কময় !
বাঙ্গালি জাতিই বিহীন ভরসা,
তাই ইহাদের এত দুরদশা ;
এদের মতন কুকাজে লালসা
কা'দের ? এহেতু বলিতে হয় ;—

৬

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি ;
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি !

৭

একতা এদের অণুমাত্র নাই ;
তা' যদি থাকিত, তা' হ'লে সদাই
এ জাতিরে কেন দেখিবারে পাই
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত ?
একতা না হ'লে কিছুই হয় না,
একতা না হ'লে শকতি রয় না,
একতা হইলে হৃদয় সয় না
শত্রু-পদাঘাত হইয়া নত !

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,
শতটা বাঙ্গালি প্রাণ-ভয়ে ছুটে,
ঘুঁসির প্রহারে ভূমিতলে লুটে,
'দে রে জল' বলি' কাতর হয় !
জনেক বাঙ্গালি যদি মার খায়,
শতেক বাঙ্গালি দেখি' হাসে তা'য়,
শত্রু-গালিগুলা লাগে সুধাপ্রায়,
চোকে কানে মনে অনা'সে সয় !

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায় !
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে ধায় !
এরাই আবার গলা ছেড়ে গায় ;—
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে !
এরাই আবার লেখনী চালায় !
এরাই আবার হস্তরী ফলায় !

এরাই আবার সুসভ্য বলায় !
গরবে ভূতলে কাঁপা'য়ে চলে !

১০

সাধে কি বলি—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি !

১১

গিয়া দেখ দেখি অর্ণবের কূলে
কত জলযানে শ্বেত পা'ল তুলে,
সাহসিক চিতে, ভয় ডর ভুলে
বিদেশীরা চলে ব্যবসা তরে।
অন্থ দূরে থাক্ ; ভারত-গরিমা
বোম্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা,
বাঙ্গালিরা তা'র ঘেঁসে না ত্রিসীমা,
অথচ উন্নত-গরব করে !

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালির আছে,
অবিদ্যা এবে তা' বাণিজ্যের কাছে ;
অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তা'র পাছে
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তা'র !
তবুও বাঙ্গালি—অসার বাঙ্গালি !
(সাধে নিন্দা করি ?—সাধে দিই গালি ?)

বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বহিয়া দাসত্ব-আলস্য-ভার ?

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে ;
জয়ধ্বনি উঠে সুদূর গগনে,
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে ;
ইংলণ্ড-শাসন দূরপ্রসারিত,
ক্ষণ তরে রবি হয় না স্তিমিত,
যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত,
বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে।

১৪

কি ছিল ইংরাজ জান ত সকলে,
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,
কাঁচা মাস খে'ত, পূজিত ভূত ;
সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,
সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল,
করেছে ভারতে নিজ পদতল !
বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালি সকল
'নোটিব, নিগার' ওদের কাছে।

বাণিজ্য-প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
'ফ্লল বৃটনীয়া' গগন ছাইয়া,
ছাড়ি'ছে হুঙ্কার ঘোর গরজিয়া ;
কি আর ক্ষমতা এ হ'তে [illegible] ?

১৬

অনুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালি না কি ?
'না কি' কেন ?—তা'র কি আছে বাকী ?
পিতৃপিতামহে দিয়াছে ফাঁকি !
বিলাতি ব্যভারে উঠেছে মাতি'
বিলাতি আসন, বিলাতি বাসন,
বিলাতি অশন বিলাতি বসন,
সকলি বিলাতি, বাঙ্গালি এখন,—
খেতে ভালবাসে বিলাতি লাথি !

১৭

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
অনুকরণেতে কাটে বার মাস ;
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস
বাঙ্গালি জাতির গিয়াছে মিশে !
তবে কেন আজো আছে ঘুমাইয়া ?
আলস্য-শয়ন এখনি ত্যজিয়া,
ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়া,
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে ?

১৮

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
ত্যজিয়া বাঙ্গালি অনুকৃতি ছার

ভালবাসে! ছি ছি, এ কি রে বিচার!
বাঙ্গালির এ কি বিচিত্র মতি!
বিদ্যাশিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে?
আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
নিশি জাগি' মজ্জা আলোড়ন করে,
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি!

১৯

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি!

২০

বঙ্গবাসিগণ! কঠোর বচন
যা' কিছু বলিনু—ভালরি কারণ,
ভেবে দেখ মনে; ক'র না রাগ!
রাগ কর না দাসত্ব করিতে,
রাগ ত কর না 'নিগার' হইতে,
পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক-দাগ!

২১

এসব করিতে রাগ যদি নাই!
আমার কথায় রেগো না—দোহাই,
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা' হ'লে!
যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,

বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও,
নির্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও,
মনোবিহগেরে একতা পড়াও,
তা' হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,
গণনীয় হবে ধরণীতলে।

২২

নতুবা—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি।

স্মৃতি

১

স্মৃতি গো, যখন আমি সংসার-ভাবনা
পরিহরি, নিরজনে নিবসি নিশ্চিন্ত মনে
করিতে তোমার, দেবি, মানসে অর্চ্চনা,
জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা।
মনের নয়ন খুলি,' দেখাও ঘটনাগুলি,
একে একে করি' যবে অঙ্গুলি-চালনা,
তখন আমার চিত কভু প্রীত, কভু ভীত,
কখনো দুখিত, ভাবি' সে সব ঘটনা।

২

পিতৃমাতৃহীন আমি বিধিবিড়ম্বনে !
শৈশবে ছাড়িয়ে তাঁ'রা হ'ন মম আঁখিহারা ;
আকুল জীবন এবে শোকের তাড়নে !
কি সুখ আমার স্মৃতি, এ ভব ভবনে ?
বহু দিন গেল চ'লে, ভাসি আমি নেত্রজলে,
তুমি পুন তাঁহাদিগে আনি' দরশনে,
কাঁদাও অধিকতর, হৃদয় ব্যাকুল কর,
উথলে শোকের সিন্ধু নিশ্বাস-গর্জ্জনে !

৩

স্নেহের মূরতি মোর জনক জননী,
তোমার মায়াতে, স্মৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি,
প্রীতি-সহ শোক আসি' আবরে অমনি !
সে ভাব লিখিতে কভু পারে কি লেখনী ?
যতক্ষণ তুমি থাক, তাঁদিগেও কাছে রাখ,
কিন্তু, হায় মায়াবিনি, পলাও যেমতি,
তাঁরাও তোমার সনে, কি জানি, কি ভাবি মনে
চলি' যান ; কাঁদি একা—লুটাই ধরণী !

৪

আবার কখনো তুমি দেখাও আমায়,
শৈশব জীবন সম রবিতলে অনুপম,
কিছু নাই—সত্য কথা, সন্দেহ কি তা'য় ?
পাইলে শৈশবে, বল, অমরা কে চায় ?
শৈশবে যে কত সুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
সে সুখ বর্ণনা তবু কভু করা যায় ?

মানব-জীবনে যদি স্থখ লিখে থাকে বিধি,
তবে সেই স্থখ শুধু শৈশব দশায়।

৫

সংসারের বিষময় ভাবী চিন্তানল
জ্বলে না তখন হৃদে, সদাই আনন্দ-হ্রদে-
সন্তরি, আনন্দময় নিখিল ভূতল।
সফল নয়নে হেরি সকলি সফল।
পিতা মাতা সে সময়ে, স্নেহভরে কোলে ল'য়ে
মমতা করিয়ে মুখ চুম্বে অবিরল;
বালবন্ধুগণ-সহ ধূলি খেলি' অহ:
ফোটে রে মানস-সরে আনন্দ-কমল!

৬

শৈশবে যে স্থখ, আহা সে স্থখ সমান
কি স্থখ জগতে আর? রাজার রাজত্ব ছার
কিবা স্থখ লভে, ছাই বীরের পরাণ?
শৈশবেই করে বিধি সত্য স্থখ দান।
শৈশবে যে স্থখ আছে, সামান্য তাহার কাছে
যৌবনের স্থখ—সে যে কলঙ্ক-নিশান!
সোণা সহ পিতলের প্রভেদ যেমতি ঢের,
শৈশব-যৌবন-স্থখে তথা ব্যবধান।

৭

স্মৃতি গো, এখন মোর এসেছে যৌবন।
বিচিত্র কালের খেলা, হারায়েছি ছেলেবেলা,
এ জনমে—জন্মশোধ—পাব না কখন!

পিতল সম্বল এবে হারা'য়ে কাঞ্চন।
জানিতাম যদি আগে যৌবনে জীবনে লাগে
সংসারের বিষ-বাণ, তা' হ'লে তখন,
ছাড়'-ছাড়'-শৈশবেতে যত্ন করিতাম যেতে,
অদৃশ্যে শৈশব যথা করে পলায়ন।

৮

এখন সে আশা করা নিশার স্বপন।
ছুটিলে ধনুর তীর, ফেরে কি ফিরায়ে শির?
ভাটার প্রবাহ করে উজানে গমন?
কালের সাগর-গর্ভে ডুবেছে রতন!
কিন্তু, মায়াবিনী স্মৃতি, কেন তুমি নিতি নিতি,
হারান সে ধনে এবে কর প্রদর্শন?
শৈশব এখন, হায় মরু-মরীচিকা প্রায়,
কেন দেখাইয়া কর অন্তর পীড়ন?

৯

যাই হোক, এক দিকে যেমন কাঁদাও,
তেমনি গো পক্ষান্তরে ভাসাও সুখের সরে,
হাসাও বিষণ্ণ মুখ, হৃদয় নাচাও,
ভবিষ্য-মুকুর যবে সম্মুখে দেখাও!
আশারে লইয়ে সাথে, কত কি যে দেখি তা'তে,
তুমি পুন মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও;
রঙ্গ আরো বাড়ি' উঠে, সুখের তরঙ্গ ছুটে,
হোক্ বা না হোক্, কিন্তু দেখায়ে ভুলাও।

১০

স্মৃতি গো, আবার বলি, যদিও আমায়
ভাবি-সুখ-জলধিতে পার তু[illegible]সাইতে,
তবুও তাহাতে পুন দুখ দেখা যায়!
সুখ দুঃখ দুই জনে দোঁহার সহায়!
ভাবি অন্ধকারময়, সুখ দুঃখ দুই রয়,
প্রকৃতির বিধি এই, অন্যথা কোথা[illegible]
একই জলধিজল সুধা আর [illegible]লাহল
ধরেছিল; শশী অই কলঙ্ক সুধায়!

১১

চমকে হৃদয়, স্মৃতি, আবার যখন
দেখাও আমায় তুমি ভীষণ নরক-ভূমি—
অনন্ত-শোণিত-সিন্ধু করিছে গর্জ্জন;
তদুপরি দীপ্তশিখ ক্ষিপ্ত হুতাশন;
শাণিত প্রখর ধার অস্ত্ররাশি সারে সার
ঝকি'ছে অনলে, রক্তে লোহিতবরণ!
রক্তে ডুবি' পাপী যত, অস্ত্রেতে হ'য়ে আহত,
পুড়িয়া হুতাশে, করে হতাশে রোদন!—

১২

'পরিত্রাহি পরিত্রাহি!' শব্দ শোনা যায়,
কিন্তু কে করিবে ত্রাণ, পাতকীরে দয়া দান,
যমের নিয়মে হেন বিধান কোথায়?
অনন্ত জীবনে শাজা অনন্ত তথায়।
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ধ্বংস, মরিবে জান্তব বংশ
কোটি কোটি কোটি বার অসংখ্য সংখ্যায়;

পুন কোটি কোটি বার, সৃষ্টি হ'বে সবাকার,
কিন্তু রে পাপীর শাস্তি অনন্ত অক্ষয়।

১৩

পাপী দণ্ডিবার সেই নরক ভীষণ
দেখাও আমারে যবে, অতীব কাতর রবে
কেঁদে উঠি—আশঙ্কায় সশঙ্কিত মন!
পাপভক্ত, স্মৃতি, আমি,—কে আছে তেমন?
যা' হোক্, যদিও তুমি দেখায়ে নিরয়-ভূমি
আমারে আকুল কর ; তা' হ'তে ভীষণ
অধীনতা-যন্ত্রণায় যেরূপ জ্বলিছি, হায়,
তা' সহ নরক-জ্বালা হয় কি তুলন?

১৪

অর্ব্বুদ নরক-ক্লেশ যদি এক হয়,
কিন্তু পর-অধীনতা যেরূপ ধরে ক্ষমতা,
অর্ব্বুদ নরক-জ্বালা কোথা পড়ি' রয়!
শূল সহ ক্ষুদ্র কাঁটা তুলিত কি হয়?
অয়ি স্মৃতি, দেখ ভেবে, ভারতবাসীরা এবে
পরাধীন হ'য়ে, হায়, কত জ্বালা সয়!
অসংখ্য নরক-ভূমি 'য়েছে ভারতভূমি,
শমন-নিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয়।

১৫

কি লাভ ধরিয়া তবে অধীন জীবন?
খেতে শুতে দিনে রেতে আশা কা'র দুঃখ পেতে,
পরের পাদুকা শিরে করিয়া বহন?
এ হ'তে নরক, স্মৃতি, সুখের ভবন।

যাহারা পাতকী হয়, তারাই নরকে যায়,
প্রতি পলে সয় বটে অসহ্য পীড়ন ;
তা' হ'তে পাতকী যারা, এ ভারতে এবে তারা
পরাধীন হ'তে করে জনম গ্রহণ !

১৬

তবে আর কিবা সুখ থাকিয়া হেথায় ?
বরঞ্চ নরকে র'ব, শমন-পীড়ন স'ব,
ডুবিব শোণিতে পুড়ি' অনল-শিখায় ;
সেও ভাল ; এ যাতনা সহা নাহি যায় !
তুমিও তা' হ'লে স্মৃতি, পরাধীনতার ভীতি
দেখায়ে কি পারিবে গো, কাঁদাতে আমায় ?
ভুলিব তোমায় আমি, ভুলিব ভারত-ভূমি,
অধীনতা-নিষ্পীড়ন ভুলিব তথায় ।

শূন্যকৌটা

১

একদা বিরক্ত হ'য়ে জন-কোলাহলে
চলিলাম শান্তি লাভে বিজন কাননে ;
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে ;
বসিলাম স্থির হ'য়ে চিন্তামগ্ন মনে ।
ব'সে আছি ; অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত
পিছনে—অনতিদূরে পড়িল নয়নে
একটি সুচারু কৌটা বিজন কাননে ।

২

নিরজন বনে কৌটা! বিচিত্র ব্যাপার!
কুতূহলী হ'য়ে সেটি কুড়ায়ে নিলাম।
খুলিলাম তাড়াতাড়ি, ভিতরে তাহার
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
কিছু নাই—শূন্যময়; কিন্তু হেন বোধ হয়,
আছিল রতন তা'য়, দেখি' জানিলাম,
যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম।

৩

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ
এ কৌটারে, আনি, এই অটবী মাঝার,
আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন,
খালি কৌটা ফেলে গেছে আঁটিয়া আবার।
বিবিধ রঞ্জনে আঁকা কৌটা এবে ধূলিমাখা,
রতন হারায়ে যেন মলিন আকার;
বাসী ফুল্ল ফুল যথা পল্লব মাঝার।

৪

নিরখি' কৌটায়, মনে হইল উদয়
ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী।—
স্বাধীনতা-রত্নহারা—এবে শূন্যময়—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!
চিত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত
হইল মানসে; হায়, দুখের কাহিনী!—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!

ভুলিব না

১

হীরকের মালা গগনের গলে
ঝিকিমিকি করি' জলিয়া উঠে ;
ধীর সমীরণ গগনের তলে
চলি' চলি' ফুল-সুরভি লুঠে।

২

তামসবসনা গভীর যামিনী
মুখখানি ঢাকি' আঁচল-তলে,
কোন্ অভিমানে হয়েছে মানিনী,
ভাসায়ে নয়ন শিশির-জলে ?

৩

আঁধারের স্রোত চারি ধারে ধায়,
আলোক-আভাস নাহিক আর,
আঁধারের কোলে জগত ঘুমায়,
আকাশে ঝুলিছে আঁধার-ভার।

৪

বাতায়ন খুলি', আপনার মনে
কত কি ভাবিয়া র'য়েছি ব'সে ;
কত নিশি চিন্তা আসি' ক্ষণে ক্ষণে,
পুনঃ ক্ষণে ক্ষণে যাইছে ভেসে।

৫

ভাবিনু আকাশ, ভাবিনু পাতাল,
ভাবিনু মরত, জগৎ-ধাম,

ভাবিনু ভিখারি, ভাবিনু ভূপাল,
ভাবিনু অদৃষ্ট, মানব-নাম,

৬

চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, দীপ্ত গ্রহাবলী,
সর্ব্বোচ্চ হিমাদ্রি, বালুকা-কণা,
রাজার মুকুট, ভিক্ষুকের ঝুলি,
ভেকের মস্তক, ফণীর ফণা,

৭

ভাবিনু আমি কে ?—ভাবিনু তুমি কে ?
ভাবিনু আমার তোমার মন,
ভাবিনু জনম, ভাবিনু মরণ,
ভাবিনু রাজার বিপুল ধন,

৮

নারীর নয়নে পুরুষের রূপ,
পুরুষের চোখে কিরূপ নারী,
তন্ন তন্ন করি' ভাবিতে লাগিনু,
উথলি' উঠিল ভাবনা-বারি,

৯

ভাবিনু স্বরগ, ভাবিনু নরক,
পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অসুখ, সুখ,
ভাবিনু প্রশংসা, ভাবিনু অযশ,
ভাবিনু হসিত, বিষণ্ণ মুখ।

১০

একে অন্ধকার, তাহাতে আবার
সংখ্যাতীত চিন্তা এরূপে মোরে

করিল আকুল, নারিলাম আর
চিন্তারে হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে।

১১

এই সব চিন্তা অন্ধকার-সনে
একীভূত হ'য়ে মিলা'য়ে গেল,
অন্ধকার যাহা, এই সবো তাহা,
এই নব ভাব মনেতে এল।

১২

যা' কিছু ভাবিনু, সবি অন্ধকার,
অন্ধকার আর কিছুই নয়,
উজ্জ্বল আলোক—তাও অন্ধকার,
অন্ধকারে বিশ্ব সমষ্টিচয়।

১৩

গঠিত অনন্ত কালের কারণে,
মহাশিক্ষা, অহ, আজের ঘটনা।
সম্বন্ধ য'দিন শরীর জীবনে,
এই অন্ধকার কভু ভুলিব না।

মধুর মধুর

১

মধুর মধুর বহি'ছে বায়,
মধুর কুসুম দুলি'ছে তা'য়,
আমার হৃদয় তাহার সনে
হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়।

মধুর পাখীর মধুর গান,
মধুর গানের মধুর তান,
আমার হৃদয় তাহার সনে
আপন মনে কতই গায়।
মধুর মধুর চলি'ছে মেঘ,
মধুর পবনে মধুর বেগ,
আমার হৃদয় তাহার সনে
এ দিক্ ও দিক্ সে দিক্ ধায়।
মধুর নদীর মধুর জল,
মধুর গাছের মধুর ফল,
আমার হৃদয় তা'দের সনে
মধুর মতন মিশিয়া যায়!

২

মধুর মতন মিশিয়া যায়?
মধুর মতন মিশিয়া যায়।
ওই যে দেখ নদীর তটে
রূপের ছটার ঘটা ওঠে
তাই নিরখি' হৃদয় মোর;
নদীর মধুর জলের মত,
গাছের মধুর ফলের মত,
মধুর মধুর মধুর মত
মধুর নেশায় মধুর ঘোর।

৩

আ মরি কি শোভার ডালি,
জলের ধারে তড়িৎ-কেলি!

আ মরি কি মধুর হাসি,
পরাণ দিয়ে ভালবাসি,
    গগন-শশী ওই রূপসী ?
উঁ হুঁ—গগন-শশী নয়,
সে শশী কি এমন হয় ?
নিশার মসী সে চাঁদ হরে,
দিনের বেলায় পালায় দূরে,
    মলিন মুখে মিলায় হাসি।

৪

আজের এ চাঁদ নূতনতর,
দিনের বেলায় উজ্জ্বল কর
ছড়িয়ে দিয়ে, দাঁড়ায়ে হাসে,
শোভার শোভা প্রভায় ভাসে,
    কে গ'ড়েছে এমন চাঁদ ?
বালাই নিয়ে ম'রে যাই ;
এ চাঁদের আর তুল্য নাই,
এ চাঁদ যথা স্বর্গ তথা
সোনার চাঁদে কনকলতা,
    মনের কথা,—নূতন ছাঁদ।

বীণা

* * * *

১

আবার যখন হৃদয় কাঁদিবে,
    তখন তোমারে লইয়া করে,

ভারতের প্রতি শ্মশানে যাইয়ে,
বাজাব তোমারে করুণ স্বরে।
ঝঙ্কারিবে তুমি অসুচ্চ স্বননে,
অসুচ্চ স্বরেতে আমি গা'ব গান ;
শ্মশানের ভূমি নয়নের জলে
ভিজাইয়া তৃপ্ত করিব পরাণ।
যত দূর শক্তি—ততই কাঁদিব,
অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিবে ;
দেহের শোণিত অশ্রুরাশি হ'য়ে,
শ্মশানের ভূমে অজস্র ঝরিবে !

১০

গা'ব এই গান (তাহার সহিত
সমস্বরে তুই বাজিবি, বীণে !)
ভারত-ভূমির সবি অন্তর্হিত,
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে !
স্বাধীনতা বল—আনন্দই বল—
বীরত্বই বল—গৌরবই বল—
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে।

১১

যা' আছে, তা শুধু অসংখ্য শ্মশান,
আগেকার চেয়ে গণনায় বেশী,
যেখানেই যাই রে, সেখানে শ্মশান,
শ্মশানে গড়ায় ভারতবাসী !
ওই যে দেখিছ রাজসৌধচয়—
রাজসৌধ নয়, ও সব শ্মশান ;

ওই যে দেখিছ বিলাস-আলয়,—
বিলাপ-আলয়! গভীর শ্মশান!
বিদ্যালয় ওই হাজার হাজার,
ধনীর ভবন, দীনের কুটীর,
প্রণয়ীর ঘর—প্রেমের বাজার,
ভারত-ভূমির অন্তর বাহির
শ্মশান—শ্মশান—ভীষণ শ্মশান!
প্রেতত্ব লভেছে ভারত-সন্তান!

মর্ম্মান্তিক ভালবাসা

* * * *

৫

কামিনী হাসিয়া তবে বলে ;—
"শুনেছ কি বাতাসের নাম?
পাতার দোলায় সে লো দোলে,
ফুলে ফুলে লভিয়া বিরাম।
অনন্ত আকাশ তা'র পথ
ঝাউ গাছ বাঁশরী তাহার,
ছোট বড় মেঘ তা'র রথ
গিরিগুহা বিজন আগার!
তা'র মত নাই লো খেলুড়ে,
বিশেষ সে জানে প্রেম-খেলা ;—
কি বা কোঠা, কি পাতার কুঁড়ে,
যাওয়া আসা করে সে দু' বেলা।

রাজগৃহে রাজার কুমারী,
　　কুঁড়ে ঘরে গরিবের মেয়ে,
সমভাবে ভালবাসে তা'রে,
　　হেসে হেসে প্রাণ খুলে দিয়ে।
আমার সে রস-নটবর
　　করে লো রসের ছড়াছড়ি ;
রাঙা বউ দেখিলে নয়নে,
　　তার কাছে ছোটে তাড়াতাড়ি।
সরস রসের গান গেয়ে,
　　ঘোমটা খুলিয়ে দেয় তা'র ;
কপালের চুলগুলি নেড়ে,
　　চাঁদমুখ দেখে কত বার।
যে তা'রে না ভালবাসে, সই,
　　টানে ধ'রে তা'র লো আঁচল,
তা'তেও নারাজ হ'লে, সই !
　　গায়ে ধরে করিয়ে কৌশল !
তা'তেও নারাজ যদি হয়,
　　আর বড় তা'রে লো সাধে না ;
পা-ধরার দাদ তুলে লয়,
　　চোকে দিয়ে বালুকার কণা।"

আক্ষেপ

(গীতি)

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

কি আর গাইব,　　　কা'রে বা শুনা'ব
　　প্রাণভরা ভালবাসা ?

সুরভরা বীণা খসিয়ে পড়িল,
হৃদয়ে লুকা'ল আশা।
থাক্ থাক্, বীণে! নীরব হইয়ে,
আমিও নীরব এবে ;
মরমের তার গিয়েছে ছিঁড়িয়ে,
কে আর বাঁধিয়ে দেবে!
মনেই রহিল মনের বাসনা
মুখে না ফুটিল ভাষা ;
সুরভরা বীণা সহিত ভাঙ্গিল
বুকভরা ভালবাসা!
প্রাণের কোকিলা! আর কি গাইবি
আমার গানের তানে ?
সাধের হাসনি আর কি হাসিবি
প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে ?
না ফুটিতে ফুল, খসিল মুকুল,
মিশা'ল ছবির ছায়া ;
কে হেন নিঠুর এ কাজ করিল,
নাই কি রে দয়া মায়া!

যে পদে

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

(আস্থায়ী)

যে পদে ষট্‌পদগণ
কোকনদ ভাবি' মনে,

উড়িয়া উড়িয়া বসে
স্থমধুর গুঞ্জরণে ;
(অন্তরা)
যে পদে, ভকতগণ
রকত চন্দন ঢালে,
যে পদ বিরাজ করে
শঙ্করের হৃদাসনে ;
(সঞ্চারী)
যে পদে সম্পদ ফলে,
বিপদ বিপদে পড়ে,
যে পদে সে মোক্ষপদ
ডাকে লক্ষ পাপিগণে ;
(আভোগ)
হে শারদে এ শরদে,
সে পদ পেয়েছি আজি,
পূজিব মনের সাধে,
বীণা-ফুল অরপণে ।

অদর্শনে

১

যদিও উভয়ে এবে আছি বহুদূরে,
জীবন-সঙ্গিনি !
কিন্তু আমাদের প্রেম, আমা দোঁহাকার
জীবন-বন্ধনী

পলকের তরে নহে দূরে,
দু'টি ফুল গাঁথা এক ডোরে
দিবস রজনী।
প্রেম কভু তফাতে থাকে না,
রবি সম ডুবিতে জানে না।

২

কি উষায়, কি দিবায়, কি সন্ধ্যায়, কি নিশায়,
কি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে
তুমি শুধু জাগ মোর মনে।
ভাবনা আমার
ভাবে অনিবার
তোমারে, ললনে!
তুমি বই কিছু নাই অনন্ত ভুবনে।
আমি বটে আছি হেথা,
কিন্তু মোর প্রাণ কোথা?—
তোমার সদনে।

৩

যদিও ভানুর তনুখানি
লুকায় জলদ কালো, তবু সেথা আছে আলো,
ওরে আলোময়ি!
যদিও এখন
দূরে আছি দুই জনে, সমুখে আঁধার,
তবু তা'র মাঝে, প্রিয়তমে!

ভরপুর আলোক সঞ্চার ;
আছে কি আঁধার কভু প্রেমে ?
বিচ্ছেদে আঁধার !
দূরে আছি ;—এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তো নয়,
এ বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে প্রেম আলোময় ।

শারদীয় জলদখণ্ড

১

জলগর্ভ বরষায় দেখেছি গগনগায়
তোমারে, জলদ, আমি রজনী দিবায় ;
সে রূপ এখন্ কই ? বদল হ'য়েছে অই ;
সে রূপ এ নব রূপে হারে তুলনায় !
দেখিতেছি ঘন ঘন, তুমিই যে সেই ঘন,
এরূপ বিশ্বাস বশ করে না আমায় ;
বাস্তবিক, তুমি সেই, সম্মুখে যা হেরি এই ?
তুমিই কি সেই এই গগনের গায় ?
বল, রে জলদ, বল, সুধাই তোমায় ?

২

আঁখি ভ'রে প্রাণ খুলে, উঁচুপানে মুখ তুলে
এবে রে তোমারে হেরি—আশা না ফুরায় ;
তখন হেরিলে পরে, তোমারে গগন'পরে,
আজের এ সুখ তুমি দিতে কি আমায় ?
কালিমাখা ভয়ঙ্কর, নভোগ্রাসি-কলেবর,
যে দিকে তাকাই—দেখি সে দিকে তোমায় ।

গরজিতে ঘোর ডাকে, জলধারা লাখে লাখে,
পড়িত প্রবল বেগে ধরণীর গায়।
আতঙ্কে যেতাম ছুটে, ধারাগুলো গায়ে ফুটে
জ্বালাইত—তাড়াইত আশ্রয় যথায়।
তুমিই কি সেই এই গগনের গায়?

৩

দু'দিন না যেতে যেতে, রূপের পসার পেতে,
ভুলাইলে, বহুরূপী, নিমিষে আমায়;
একেবারে রূপান্তর, কিছুই তেমনতর
এ শরতে, জলধর, নাই রে তোমায়।
বরষায় এইখানে, চেয়েছি তোমার পানে,
আজিও রে এইখানে আঁখি মোর চায়;
সেই তুমি আঁখি সেই; কিন্তু সেই ভাব নেই,
আজের ভাবের ভাব কি ক'ব কথায়?
সরে না মনের ভাব ও তোর শোভায়।

৪

সে দিন দেখেছি তোরে আকাশের গায়,
যত দূর দৃষ্টি যায়, অভিন্ন অসীম কায়;
সে ভীষণ রূপ ভাল লাগে না আমায়।
আজের যে রূপ তোর, মানস করিল ভোর,
ফেরে না নয়ন-ঘোড় ত্যজিয়ে তোমায়।
নূতন নূতন বই, পুরাতনে সুখী নই,
নূতন জিনিষ পেলে, নয়ন জুড়ায়।
রে জলদ, তাই আজ, নূতন নূতন সাজ,
কে বল, পরালে তোর মনোহর গায়?

আমার মনের কথা, মনেই র'য়েছে গাঁথা,
কি আশ্চর্য্য, কে কহিল এ কথা তাহায়?
অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ সেই, সন্দেহ কি তায়?

৫

মরি, কি সুন্দর দেহ, অতুল আনন্দ-গেহ,
অনন্ত আকাশ মাঝে ধীরে ভেসে যায়;
সুনীল সাগর-নীরে ভাসে কি রে ধীরে ধীরে
গিরি-চূড়া?—অসম্ভব, কে বিশ্বাসে তা'য়?
ভারতে কি রাম আছে, ভাসাবে শিলায়?
ও নয় ভূধর-খণ্ড, ও যে রে বাষ্পের পিণ্ড,
দেখিতে ওজনে ভারী, কিন্তু লঘু-কায়,
বিজ্ঞানের কথা এই; সে কথায় কাজ নেই,
বিজ্ঞান নীরস শাস্ত্র, কে তাহারে চায়?
কবি যাহা বলে ওরে, বিশ্বাসি তাহায়।

৬

ভারত-গৌরব-রবি কালিদাস মহাকবি
আঁকিল যেরূপে ওরে দৈবী তুলিকায়;
ব্রিটনীয় কবি শেলি তেজাল সুরঙ ঢালি'
আঁকিল যেরূপে ওরে, তাই চিত চায়।
বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক একেবারে অরসিক,
সুধারে গরল করে; ভাল যেটি পায়,
সেটিরে খারাপ করে, তবে রে কেমনে তা'রে
ভাল বলি?—কবি-শত্রু—ধিক্ সে জনায়?

৭

শরতের জলধর, কবিকুল-প্রিয়বর
তুই রে ; কবিই তোরে সুন্দর সাজায় ;
বিজ্ঞানবিতের কর করে তোরে জর জর,
এমন বিদ্বেষী নর আছে কি ধরায় ?
যা'রে দেখে সুখ লভি, যা'রে প্রিয়তর ভাবি,
যা'র মনোহর ছবি মোহিছে আমায় ;
কবিকুল যা'র তরে সদাই ভ্রমণ করে,
বৈজ্ঞানিক অরসিক বাষ্প বলে তায় ?
নকুল অহির ভাব তাই দু'জনায়।

৮

ভাবুক জনের চিত, কর তুমি বিমোহিত,
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধরি, নব নব কায় ;
ভব-রঙ্গ-ভূমি মত বদলিছ অবিরত ;
বহুক্ষণ একভাবে দেখি না তোমায়।
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায় ?
কখন মুকুট পর, কভু ম্লান কলেবর,
কখন বিজলী-হার চমকে গলায় ;
কভু শোভ স্তরে স্তরে, কভু এক কলেবরে,
কভু এ সুন্দর দেহ আকাশে মিলায় ;
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায় !

৯

অস্তগামী দিবাকর ঢালি নানারঙি কর,
তোরে ল'য়ে কত রঙে আকাশে খেলায় ;
সে কালের ভাব হেরি,' রেতে ছায়াবাজীকারী

রসায়ন-দীপে ছবি দেয়ালে খেলায় ;
রবি, তুই শিক্ষা তা'র—সন্দেহ কি তায় ?
তোরি মত, জলধর, মনে মোর ভাবান্তর,
কতই ঘটিছে—আমি কি কব কথায় ?
কভু ভাবি মনে মনে, ব'সে আছি সিংহাসনে,
কখন এ দেহ মোর ধূলায় লুটায় !
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় !

১০

আদর্শ করিয়ে তোরে, এ অনন্ত ভব ঘোরে,
ঘুরিছে আমার মন প্রতি লহমায় ;
কখন ভূতলে ছুটে, কখন আকাশে উঠে,
কখন সাগর-জলে হাবুডুবু খায় !
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় !
কেবল আমিই নই, বাঙ্গালি মাত্রেই অই,
নিরেট পাগল, মেঘ, সন্দেহ কি তায় !
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত-মুখ,
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায় !
নিরেট পাগল এরা বিশাল ধরায় ।
বালক-ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত,
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়,
আকাশ-কুসুম সম শেষটা দাঁড়ায় !
কারে বলে দেশোন্নতি, নাহি জানে এক রতি,
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায় ;
দরিদ্র স্বজাতি যারা নিরাহারে যায় মারা,

ভুলেও তাদের পানে ক্ষণেক না চায় :
কিন্তু তৈল ঢালে খালি তৈলাক্ত মাথায় !

১১

কিসের, কিসের বাধা ? সাহেবে চাহিলে চাঁদা,
সহস্র অযুত লক্ষ অনা'সে বিলায় ;
হায়, এ কি অবিচার, কার টাকা হয় কার,
পরধনে পোদ্দারীর এই ব্যবসায় !
ধনীরা প্রজার ধনে ধনিত্ব ফলায় !
'রাজা', 'রায় বাহাদুর' লভিতে বাঙ্গালি শূর,
ছি ছি রে, জীবন কাটে 'ইংরেজ-সেবায় !'
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিয়ে,
চতুর ইংরেজ বেস্ চাতুরী খেলায় !
বাঙ্গালি বিষম বোকা বিশাল ধরায় !

১২

বাঙ্গালি বিষম খেপা, বধূর বিননী-খোঁপা
সাদরে ধরিয়ে, ফুল বসায় তাহায় !
এদিকে নিজের শিরে, ছি ছি রে, ছি ছি রে ছি ছে
বিলাতি পাদুকা, ধিক্, ব'য়ে ল'য়ে যায় !
বাঙ্গালি পাগল শুধু !—অধম ধরায় !
বাঙ্গালির কত গুণ, মুখে মাখে কালি চুণ,
স্বজাতির মন্দ বই ভাল নাহি চায় ;
হাত পা সকলি আছে, তবু বিলাতের কাছে,
কি লজ্জা, ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানা চায় !
এমন নিরেট বোকা দেখেছ কোথায় ?

বাঙ্গালি নিরেট বোকা, বুকে ভয়—মুখে রোখা,
সকল লক্ষণগুলি পাগলের প্রায়।
কত কাল এই ভাবে বাঙ্গালি-কুলের যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায়?
রে মেঘ, বরষাকালে, কি ছিলে গগন-ভালে,
এবে বা কেমন তুমি আকাশের গায়;
কত কাল এই ভাবে কিন্তু বাঙ্গালির যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায়?
না ফিরিলে,—কে ফিরাবে?—কে হেন ধরায়?

শারদোৎসব

নিদ্রাভঙ্গে মেনকার বিলাপ

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কেন আজি হেরিলাম এরূপ স্বপনাবেশে,
একা দ্বারে ভবদারা দাঁড়ায়ে দুখিনী বেশে!
দেখিলাম ভবানীর নয়নে ঝরিছে নীর,
পশিয়াছে মুখ-শশী বিষাদ-রাহুর গ্রাসে!
সুবর্ণ জিনিয়া কায়, বিবর্ণ হ'য়েছে, হায়,
বিমলার দেহে মলা তাও দেখিলাম;
বিরহিত বাঘছাল, গলায় কপাল-মাল,
ভূতল-লম্বিত জটা হয়েছে চিকন কেশে!
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, হেরিনু র'য়েছে ঝুলি,
ক্ষুধায় আকুলা, কথা সরে না মুখে;—

শুধু আধ আধ বোলে,
"ও মা, ভিক্ষা দে মা!" বোলে,
প্রাণ-উমা কোথা গেল ভাসায়ে শোক-সরসে!

আরতি

রাগিণী গৌরী—তাল আড়া।

প্রদোষ আগত হেরি,' কনক-প্রদীপ ধরি',
পশ্চিমে দাঁড়ায়ে রবি, তারারে আরতি করে।
মরি সে প্রদীপালোকে, কি শোভা হ'ল ভূলোকে,
অপার স্বরগ-শোভা সাজে হিম-মহীধরে।
প্রদোষ হরিষ চিতে, বিশ্বরূপ ধুনাচিতে,
ঢালিতেছে ধুনারাশি আঁধারিয়া চরাচরে;—
ফুল-পরিমল-মাখা, সমীর শীতল পাখা,
বীজনি'ছ ধীরে ধীরে শিবানীর কলেবরে।
লতিকা, পাদপকুল, অঞ্জলি ভরিয়ে ফুল,
বরষিছে উমা-পদে অটল ভকতি-ভরে;—
প্রপাত, ঝরণা, ধুনী, করিছে বদনধ্বনি,
শ্রবণ-বিবরে যেন সুধার সুধার ঝরে।

রাগিণী ইমন্‌-কল্যাণ—তাল আড়া।

আহা কি অতুল শোভা আজি রে গিরি-ভবনে;
ভূধরে শারদা-শশী, শারদ-শশী গগনে!
ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশবিহারী তারা,
বিকসিয়ে আঁখি-তারা দেখে তারা সুখী মনে।

কামিনী যামিনী আজি, চন্দ্রিকা-বসনে সাজি,'
নিশির শিশিরে ভিজি, হেরি'ছে উমায় ;—
কুমুদী ফুটিয়ে জলে, নমে তারা-পদ-তলে,
চকোরেরা কুতূহলে চাহে উমা-শশী পানে।

উৎসব-দর্শনে

১

ও কি ও কি! কেন এত কোলাহল ?
ঢাক, ঢোল, কাড়া বাজিছে মাদল
এ বঙ্গে কি হেতু ? কি ঘটা এমন
উপস্থিত ? কেন আনন্দে মগন
দীনা বাঙ্গালার তনয় সবে ?
যাদের হৃদয়, যাদের মানস
অধীনতা-বিষে হ'য়েছে অবশ,
যাদের শরীর, যাদের জীবন
ক্ষণে সহিতেছে শতেক পীড়ন,
কে জানে তাদের এ দিন হবে ?

২

কেন বঙ্গবাসী মেতেছে উৎসবে ?
বুঝি না ;—বুঝেছি, আর কোথা যাবে ?
এসেছে শরত ; আনন্দ-লহরী—
স্থির বঙ্গহৃদে তাই বিভাবরী
মধুর আরাবে খেলিছে ওই !

আনন্দ-আধার, ভকতি-আকর,
বঙ্গবাসীদের নয়ন-সুন্দর
দেবী ভগবতী দিব্যরূপময়
পরাধীনী বঙ্গ-হৃদয়ে উদয়,
বঙ্গসুতকুল সুখী রে তাই।

৩

শারদ উৎসবে তাই এত ঘটা,
কে না জানে? বল ক'ব আমি কটা?
তাই বাদ্য বাজে, তাই কোলাহল,
তাই সুখী বঙ্গ-তনয় সকল,
তাই বঙ্গে দেখি নবীন সব।
নিরখি যা' কিছু তা'ই শোভাময়,
যা' শুনি, তাতেই মধুস্রাব হয়,
আঁমারো যেন রে নয়ন শ্রবণ
শরদাগমনে হ'য়েচে নূতন,
নহিলে এমন কেন অনুভব?

৪

কিন্তু, হায়, কেন বঙ্গসুতগণ!
এ উৎসব-উৎসে হ'য়েছ মগন?
প্রকৃত উৎসব যাহা হ'লে হয়,
তোমাদের তাহা হ'য়েছে বিলয়,
এ উৎসব শুধু ছেলেমি করা!
বলিব না আমি, বুঝে লও মনে,
বঞ্চিত তোমরা র'য়েছ কি ধনে ;

কালে যদি পায় সে ধন লভিতে,
উৎসব করিও হরষিত চিতে,
নাচিয়া কুঁদিয়া কাঁপায়ে ধরা।

৫

নতুবা নীরব—নিশ্চয় নীরব
হও, বঙ্গবাসী, ছাড় রে উৎসব ;
বিষ-বাণ বিদ্ধ হৃদয়ে যাদের,
কোন সুখ ভাল লাগে কি তাদের ?
কি হেতু তোমরা প্রফুল্ল তবে ?
বুঝেছি সে বিষে হয়েছ পাগল,
জ্ঞান নাশিয়াছে সেই হলাহল,
নহিলে কি হেতু তোমাদের চিত
(কি আশ্চর্য্য !) এত দেখি আমোদিত ?
কি ভাবে কি ভেবে মেতেছ সবে ?

৬

দূরে ছুড়ে ফেল কাড়া, ঢোল, ঢাক,
আছাড়িয়া ভাঙো দীপ, ঘণ্টা, শাঁখ,
উন্মীলিত আঁখি নিমীলিত কর,
যে দুখে ডুবেছ, সেই দুখ স্মর,
হৃত-ধন-লাভে কর যতন ;
যে দেবীরে পূজ এত ঘটা ক'রে,
ভক্তি যদি থাকে, ভাব না অন্তরে ;—
যদি তিনি কভু দেন শুভ দিন,
ফিরে দেন হৃত-ধন সমীচীন,
তবে এ উৎসবে হয়ো মগন।

৭

ক্ষিপ্ত বঙ্গবাসী, প্রশমিত হও,
হৃত-ধন-লাভে অবহিত রও,
বৃথা আড়ম্বর কর পরিহার,
আগে কর হৃত-রতন উদ্ধার,
শারদ-উৎসব করিও পরে ;
তা না ক'রে শুধু এরূপ করিলে
কি লাভ ? ভাল না সে কথা স্মরিলে ?
আগে উদ্‌যাপন কর সেই ব্রত,
তাঁর পর হয়ো মহোৎসবে রত,
নতুবা এ উৎসব কি লাভ ক'রে ?

ভারত গান

১

ললিত—আড়াঠেকা

কি গাইব আজি, হায়, কি আছে ভারতে আর ?
হু হু করে প্রাণ মন, ধূধূ করে চারি ধার !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
শূন্যময় সবি দেখি, শূন্যে রব হাহাকার ।
ভারত—ভারত নয়, কেবল শূন্যতাময়,
কায়ার কেবল ছায়া, নাহিক জীবন ;—
তাই আজি খেদে কই,—বেদের ভারত কই ?
অধীন ভারতে, হায়, এ যে শুধু অশ্রুধার !

২৭

গৌরী—একতালা

দিবস বিগত, তবুও, ভারত !
নহিল বিগত দুখ তোমার ?
রজনী আইল, আবার ছাইল
শোকের উচ্ছাস মুখ তোমার।
পূরব আকাশে আঁধার ধায়,
বদন তোমার আঁধার তায়,
তপত করিছে শীতল বায়
দুখ-নিপীড়িত বুক তোমার।
শিশির-শীকর ঝরে ধীরে ধীরে,
শরীর তোমার ভাসে আঁখি-নীরে,
আরো কত দিন, ওরে দুখিনি রে,
দুখ-নীরে পড়ি দিবি সাঁতার !

৬৮

সাহানা—ধামার

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন ;
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন !
কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অন্য জন।
কিন্তু কি দুখের কথা, জানি না কেন একতা
ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন ;—
হায়, কত দিন আর রসাস্বাদ একতার
লবে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরযে ধরিয়া মন ?

৭১

বিভাস—(কীর্ত্তনাঙ্গ)

নিশিদিন, ভারত ! রোয়সি কিস লিয়ে
ভূ'পর শোয়সি কাহে,
গভীর দীঘল শ্বাস মুহু মুহু তেজসি,
নিয়ত দহসি দুখ-দাহে ?
বরষা আওল, পুন ফিরি যাওল,
শুখাওল ঘন-জল-ধারা,
তব ইহ শোক-ঘন আজুতক বরখন
করতহি আঁশু অপারা।
বিহি তুহেঁ বাম ভেল, সব সুখ ঘুচি গেল
শোক-শেল বিন্ধল ছাতি ;
সুরয উজল কর বরখে নভস পর,
তবু সোই দীঘল রাতি !
কব বিহি শুভ দিঠি বিথারব তঝু'পর,
কব নিশি হোয়ব ভোর ?
কব তুহু মিঠি বুলি বরখি' হরখভরে,
হাঁম সবে লেয়বি কোর ?

৮৪

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা

তোমাদের এ কি বিবেচনা,
ঘরের তুল পরকে দিয়ে,
কাপড় চাদর কেন কেনা

আপনার মায়ে ভুলে গিয়ে,
পরের মায়ের উপাসনা,
কাজে কাজেই আজন্মকাল
ঘুচ্‌ল না কো ছেঁড়া টেনা।
কড়া মূলের ঝোড়াখানেক
পিতল কেনো দিয়ে সোণা,
তোমরা যে কি বুদ্ধিমান্‌,
তা এত দিনে গেল চেনা।

৮৫

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা

(ওরে) মনে মুখে তফাৎ কেন ?
(ওরে) এই তফাতে পরের হাতে
ফতে হ'ল সিংহাসন।
সভায় গিয়ে মুখের কথায়
দেখাও খুলে খোলা প্রাণ,
(কিন্তু) কাজের বেলায় আর নড় না,
কাঠে গড়া পুতুল যেন।
দিনে রেতে খেতে শুতে
সময় কাটাও যেন তেন,
স্বার্থী হয়ে অর্থ দিয়ে
ফক্কিকারী খেতাব কেনো !
পরের পায়ের ধূলা চেটে
মিছে বাড়াও নিজের মান,

(ছি ছি) নিজের টাকা পরকে দিয়ে
চাকর সেজে ফিরে আন।

৮৭

(রামপ্রসাদী সুর)

খাম্বাজ-জংলা—একতালা

মন্ বসে না দেশের হিতে,
বাগান-ভোজে যাও রে ম'জে,
গরিবগুলি পায় না খেতে।
গেজেটে নাম উঠ্‌বে ব'লে
টাকা ঢাল চাঁদার খাতে,
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও,
ক্ষুধিত ব'সে খালি পাতে!
হুজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও,
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে,
কাজের বেলায় কাণা হ'লে,
দেশটা গেল অধঃপাতে।

খোস্ গল্প

কুপোকাৎ

সন্ধ্যে হ'ল, ডুবে গেল রাঙা রঙের রবি;
পূব আকাশের একটি পাশে উঠলো ভাঙা চাঁদ।
শাদা-কাল-রঙ-মাখানো সন্ধ্যে রাণীর ছবি,—
শাদা টানা—কালো পোড়েন সুতোয় বোনা ফাঁদ॥

ঘোমটা খুলে, মুখটি তুলে পুকুর-ভরা জলে
　　হেসেছিল সরোজবালা রবির পানে চেয়ে।
অবিরত ঠাট্টা কত ঘোম্‌টা নাড়া-ছলে
　　করেছিল কুমুদীরে সুখের সময় পেয়ে॥
যার গরবে গরবিনী কমলিনী ধনী,
　　এখন তো তার নাই কো দেখা, একা দুখে কাঁদে।
কাজেই এখন সময় পেয়ে কচি কুমুদিনী
　　পদ্মিনীরে ঠাট্টা করে খাট্টামাখা ছাঁদে॥
কুমুদিনীর কচি মুখে কচি হাসি খেলে;
　　কমলিনীর বুকে যেন ফুটচে বিষের শলা।
বাতাস লেগে, রেগে রেগে বল্‌ছে যেন দুলে,—
　　"থাক্‌ লো ওলো কুমুদি ছুঁড়ি! দেখবো সকাল বেলা!"
কবি বলে, মেয়েছেলের এক জায়গায় থেকে,
　　এমন্ ক'রে ঝগড়া করা সাজে কি গো?—ছি ছি!
তোমাদের কাছে ঝি বউড়ী ঝগড়া করা শিখে,
　　দিবানিশি করে কেবল ঢেঁকির কচ্‌কচি॥
এই—সন্ধ্যে বেলায় গোপালপুরের মাঝের পাড়ায় মাজ।
ছোট—মুদির দোকান একটি, তাতে ঝাঁপ বন্ধ আজ॥
সেই—দোকান্‌খানির দোকানদারের নামটি গউর নাগ।
তার—গড়ন ছোট, বেঁটেখেঁটে, গালে তিলের দাগ॥
ভাল—গোঁফ্‌ জোড়াটা, বুকের পাটা, হাতের গুলি মোটা।
তার—চক্ষু দু'টি ছোট ছোট, কিন্তু যেন ফোটা॥
আজ—ন দিন ধ'রে জ্বর হ'য়েছে, কেই বা যাবে হাট?
আজ—খদ্দেরকে কেই বা বেচে?—বন্ধ দোকান পাট॥
ছিল—যা'কিছু তার দোকানঘরে আগের হাটের কেনা।

সবি—বিকিয়ে গেছে, কেবল আছে, গাম্‌লা খালি ধামা ॥
লোকটা ভাল গউর মুদি গাঁয়ের লোকে বলে।
যেমন, তার মাস্থ রেখে, শাদা চালে চলে ॥
ধর্ম্মভীরু গউর মুদি ঠিক্ হিসেবে থাকে।
পাকীর ওজন বোলে কাঁচা দেয় না গউর কা'কে ॥
বল্‌বে যেটি—কর্‌বে সেটি—একটি কথায় দর।
কিন্‌তে ইচ্ছে হ'লে কেনো ; নইলে চল ঘর ॥
অল্প লাভে গউর ভাবে,—"এতেই আমার ঢের।
কাজ কি আমার কাটা দাড়ী ?—কাজ কি [illegible] সের ?
কাজ কি আমার জুওচ্চুরি ?—কাজ কি ঠোঙা [illegible] ?
কাজ কি আমার পচা জিনিষ, উপর ভালয় চাপা ?
ধর্ম্মপথে চল্‌লে পরে কম্ম হ'বে খাঁটি।
ফ'স্‌কে যা'বে পাপের গেরো, ছাড়বে যমে লাঠি ॥"
এ সব গুণে গাঁয়ের লোকে ভাল তারে কয় ;
কাজেই গউর মুদির ভাল রোজগারটাও হয় ॥

গউর নাগের ছোট ভাই অন্য গায়ে থাকে।
জর শুনেও সে আস্‌তে নারে বেচা কেনার পাকে ॥
গউর নাগের গড়ন যেমন, ছোটটিরো তাই।
গোঁফ জোড়াটি নতুন কেবল, তিলটি গালে নাই ॥
বড়র বয়েস বছর তিরিশ, বছর পঁচিশ ছোট।
ছোট বেশী দিন-খাটুনে, বড় কিছু মাটো ॥
গউর বড়, নিতাই ছোট, ছু'টিই মানুষ বেশ।
দুই ভেয়েরি সাদাসিদে চাল চলন্ আর বেশ ॥
নিস্তারিণী নামে নারী গউর নাগের জায়া।
গুণের কথা ব'ল্‌ব কি তার ?—কায়ার যেন ছায়া ॥

বয়েস হ'বে বছর কুড়ি, গোছাভরা চুল।
রূপের কথা ব'লব কি তা'র?—টাটকা ফোটা ফুল ॥
নিটোল গড়ন, সুডোল চলন, কয় সে ধীরে কথা।
পতির সনে সুখে থাকে, নাইকো সতীন সতা ॥
সরল আঁখি, হাস্যমুখী, ছলচাতুরীহীনা।
কান জুড়োনো গলার আওয়াজ, বাজে যেন বীণা ॥"
রূপোর তাবিজ, পঁইচে, নোঙা, গোট, দু'গাছি মল।
সোনার মধ্যে ভরি তিনের চিক্, কাটা ডায়মল্ ॥
নিস্তারিণী তাতেই সুখী, তাতেই সাজে বেশ।
স্বামীর উপর নাইকো ওজর, নাইকো রাগের লেশ ॥
মোটা গছের কস্তাপেড়ে শাড়ী ভাল বাসে।
শান্তিপুরে পাতলা ডুরে দেখ্‌লে লাজে হাসে ॥

আফিস্‌ওয়ালা অনেক আছে গোপালপুরের মাঝ।
কলম্-পেশা কি দুর্দ্দশা, তাই বাবুদের কাজ।
গবর্মেণ্টের আফিসেতে কারো কলম্-পেশা।
সওদাগরী আফিসেতে কারো ভাতের আশা ॥
ছুটি ছাটা পেলে তা'রা আসে যখন বাড়ী।
মাগের তরে ব্যাগে ভ'রে আনে পাতলা শাড়ী ॥
চোকে যেটি নতুন পড়ে' অম্নি কেনে সেটি।
দেশী চালের মুখে দিয়ে গোবরগোলা মাটি ॥
হাড়ে মাসে 'অনুকরণ' যা'দের জড়াজড়ি।
দেশের লোকে খাবে কি আর তাদের টাকাকড়ি?
বিলেত থেকে প্রতি দিনে কত জিনিষ আসে।
ঘরের টাকা পরকে দিয়ে, সে সব আনে বাসে ॥
বাবু সাজেন ট্যাস ফিরিঙ্গী, গিন্নী ফিরিঙ্গিণী!

কচুবনের কেষ্ট নরেন, প্যারী তরঙ্গিণী !
গউর নাগের নিস্তারিণী তেমনতর নয়।
দেখলে তারে, মনমাঝারে শ্রদ্ধাভক্তি হয় ॥
সন্ধ্যে এসে চ'লে গেল ;—এল আঁধার [illegible] ।
ঘরে ঘরে জ্ব'লছে খালি তেলের পিদীপ [illegible] ॥
ব'লে গেছে জয় ডাক্তার নিস্তারিণীর কা[illegible]
খাইয়ে দিতে একটা আরক, শিশির ভিত[illegible]আছে ॥
শিশির মুখে ছিপি আঁটা, গালার ছাপা তায়।
'one mark for one hour' 'Shake the bottle' গায় ॥
শিশির গায়ের অন্য দিকে কাগজ-কাটা ফালি !
সেই ফালিতে কাঁচিকাটা তিন মার্কা খালি ॥
শিশির মুখে আঁটা ছিপি পেরেক দিয়ে খুলে।
খাইয়ে দিলে নিস্তারিণী এক মার্কা ঢেলে ॥
ওষুদ খেয়ে গউর মুদি ওয়াক্ ওয়াক্ করে।
নিস্তারিণী আক্-টিক্লি মুখের কাছে ধরে ॥
নেবুর পাতা স্তুঁকে স্তুঁকে থাম্‌লো বমির জোর।
খানিক পরে গউর নাগের বাড়্‌লো ঘুমের ঘোর ॥
পাশ ফেরে না—আর নড়ে না—চোক্ চায় না [illegible]।
ধীরে ধীরে নিশেষ পড়ে, বুক্‌টো যেন ভার ॥
এই রকমে ঘণ্টাখানেক সময় চ'লে গেল।
গউর মুদি ক্রমে ক্রমে এলো হ'য়ে এল ॥
হাতটি তুলে পাটি তুলে রাখে যে দিক্ পানে।
সেই দিকে তা' প'ড়ে থাকে ; কিছুই সে না জানে ॥
তাই না দেখে নিস্তারিণী হলো আকুলপারা।
ফোটো ফোটো চোক দু'টিতে ছুট্‌লো জলের ধারা ॥

কি ক'রবে যে—কি ব'ল্‌বে যে, কূল কিনারা নাই।
আঁৎকে উঠে—চ'মকে উঠে কাঁদচে সর্ব্বদাই॥
একে রাত্তি, তাতে পতি মর-মর-প্রায়।
নিস্তারিণীর কি যে হ'লো, ব'লবো তা' আর কায়!
কে গো এমন ব্যথার ব্যথী ভূমণ্ডলে আছে।
নিস্তারিণীর দুঃখের কথা ব'লবো গে তার কাছে?
বিধাতার এ সৃষ্টিমাঝে রকম রকম লোক।
কেউ বা সুখে কালটা কাটায়, কেউ বা করে শোক॥
কেউ বা চড়ে গাড়ী ঘোড়া, কেউ বা পায়ে হাঁটে।
কেউ শোয় গো ছেঁড়া কাঁথায়, কেউ বা ছাপর খাটে॥
কারো পাতে ছানা মাখন গড়াগড়ি যায়।
কেউ বা চোকে ফেনে-ভাতে দেখ্‌তে নাহি পায়॥
কেউ বা হাসে প্রাণটা ভ'রে, কেউ বা কেবল কাঁদে।
ভিক্ষে করে কেউ, কেউ বা টাকার তোড়া বাঁধে॥
এমন আবার কেউ বা আছে, দীনের সে কেউ নয়।
সাহেব সুবো চাইলে চাঁদা কল্পতরু হয়॥
সাহেব যেন চোদ্দপুরুষ, দেব্‌তা বাপের ঠাকুর।
দেশী হ'য়ে দেশের লোকে ভাবে যেন কুকুর॥
খুব গোপনে দান ক'র্‌বে বলে শাস্ত্রকারে।
ডান হাতের দান বাঁ হাত যেন জানতে নাহি পারে॥
তেমন্‌তর বাঙলা দেশে ক'জন করে দান?
তেমন্‌তর বাঙ্‌লা দেশে কয় বাঙালির প্রাণ?
গেজেটেতে নাম উঠবে, প'ড়বে লাটের চোকে।
'দাতা বাবু' 'রাজা' খেতাব পা'বেন হাসিমুখে॥
'রায় বাহাদুর' কেউ বা হ'বেন, কেউ বা 'মহারাজ'।

ভুঁইশুদ্ধ রাজরাজড়ার ধামাধরার কাজ।
দেখচি এবার, বদ্দি ভায়া! তোমার পোহাবারো।
বিষ্ণুতেলের চড়াও খোলা, মশলা যোগাড় কর॥
বাঙলাদেশের 'রায় বাহাদুর' 'রাজা' 'মহারাজা'।
তোমার তেলে সাহেব প্রভুর কর্‌বে জুতো সোজা!
'রায় বাহাদুর' 'মহারাজা' 'রাজা' ছাড়া আর।
'খাঁ বাহাদুর' 'নবাব সাহেব' তোমার খরিদ্দার॥
'K. C. S. I.', 'C. S. I.', আর 'C. I. E.', খেতাবধারী।
বদ্দি ভায়া! বিষ্ণুতেলের এরাও গোঁড়া ভারী!
তাও বলি ফের, এমন ক'জন মেয়ে পুরুষ আছে।
যায় না তারা একটিবারো বিষ্ণুতেলের কাছে॥

কি বল্‌তে কি বল্‌ছি আমি; কাজের কথা কই।
নিস্তারিণীর ব্যথার ব্যথী খুঁজ্‌লে মেলে কই?
গোপালপুরের ঘরে ঘরে কতই মানুষ ওই।
নিস্তারিণীর ব্যথার ব্যথী কিন্তু মেলে কই?
আজ শনিবার! চাকুরে ভায়ার সোণায় সোহাগা।
আফিস্ ক'রে, এসে ঘরে, দিচ্ছে গোঁফে তা!
পত্নী ব'সে যত্ন ক'রে তুষ্‌ছে পতির মন।
আধ-ঘোমটা মুখটি তুলে হাসছে অনুক্ষণ॥
পতির দুঃখে নিস্তারিণী কাঁদে দোকান্‌ঘরে।
এরা কি তার ব্যথার ব্যথা?—কও সত্যি কোরে॥
ওই দেখ গো, দশ ইয়ারে বোঠকখানায় ব'সে।
গা দুলিয়ে তবলা বাঁয়ায় দিচ্ছে চাঁটি ক'সে॥
বোতল বোতল ব্রাণ্ডি বিয়ার নিচ্চে পেটে বাসা।
চক্ষু দু'টি মিটির মিটির, খোস্ গোলাপী নেসা॥

আমোদ করে রাসব-স্বরে পচা খেঁউড় গেয়ে।
পথের পাশে গাছের পাখী চেঁচিয়ে ওঠে ভয়ে॥
এদের মাঝে কেউ কি দুখী নিস্তারিণীর দুখে?
একটিও নয়—তা হ'লে কি এত হাসি মুখে?
নিস্তারিণীর দুখের দুখী কেউ নাই কি তবে?
আছেন—আছেন ভগবান্ এই অসহায় ভবে॥
নিস্তারিণি! ডাক্ গো তাঁরে করুণগলে তোর।
তাঁর করুণায় ঘুচ্‌বে, বাছা! তোর এই বিপদঘোর॥
এমন্ কালে জয় ডাক্তার ভিন্ গাঁ হ'তে এসে।
দেখ্‌তে রুগী, গউর মুদির দোকানঘরে পশে॥
ক'দিন ধ'রে জয় ডাক্তার কচ্ছে আনাগোনা।
নেয় না ভিজিট্—সে ভিজিট্ ওষুধ সাগুদানা॥
আজ্‌কে তা'রে নিস্তারিণী দেখ্‌তে পেয়ে দুঃখে।
ঘোমটা টেনে কেঁদে কেঁদে বলে অধোমুখে॥—
"ওগো আমার এ কি হ'ল।" ফুটলো না আর কথা।
চোখের জলে বক্ষ ভাসে—উথ্‌লে ওঠে ব্যথা॥
জয় ডাক্তার তখন বলে,—"নাইকো কোন ভয়।
ভাল হবে, যদিও এ রোগ তেমন সরল নয়॥"

দশ বিশটে রুগী সেরে, গাঁয়ে এখন পশার ক'রে,
জয় ডাক্তার যশ নিয়েছে বেশী।
লোকটা ভাল ওষুদ পালায়, কিন্তু ভরা মনের মলায়,
লম্পটতা দোষে বড়ই দোষী॥
বয়েস বছর তিরিশ ঘেঁসে, কয় সে কথা হেঁসে হেঁসে,
অবর সবর মদ ভাঙ্‌টা খায়।

ঝী বউড়ী দেখ্‌লে পরে, অম্‌নি যেন নোলা সরে,
বদ্‌ নজরে তাদের পানে চায় ॥
তারি দোষে নিস্তারিণী, আজকে এত বিষাদিনী,
তারি দোষে সরল গউর আজকে বেহুঁস্‌ এত।
কি জানি কি ইচ্ছে কোরে, কড়া ওষুধ শিশি ভোরে,
দিয়েছিল, তাই খেয়ে ত গউর মড়ার মত ॥
হায়, ভগবান্‌! এ কি দেখি, যাদের হাতে জীবন রাখি,
দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করি যাদের উপরেতে।
তাদের কি এ কাণ্ডখানা! বড়ই কঠিন মানুষ চেনা,
মনে মুখে তফাৎ এত মানুষ মানুষেতে ॥

নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি চৌকী দিলে এনে।
জয় ডাক্তার ব'স্‌লো তাতে পাছার কাপড় টেনে ॥
গউর মুদি বেহুঁস্‌ এত.—যেন মড়ার মত।
আস্তে শুধু নিশেষ পড়ে, অঙ্গ অবশ যত ॥
প্রাণের জায়া কাঁদছে কাছে, জয় ডাক্তার ঘরে।
অচৈতন্য গউর মুদি বুঝ্‌বে কেমন ক'রে?
জয় ডাক্তার হাত বুলিয়ে গউর মুদির গায়।
ভাঙাচোরা কথা ব'লে মুখ্‌ সিটকে চায় ॥
তাই না দেখে নিস্তারিণী আরো ব্যাকুল হলো।
মনে ভাবে—"স্বামী বুঝি আমায় ছেড়ে গেলো ॥"
মন্দখানা মনের ভিতর আগে পড়ে এসে।
"হে হরি! কি ক'ল্লে!" ব'লে চোখের জলে ভাসে ॥
এমন কালে জয় ডাক্তার মনের কথা কয়।—
"নিস্তারিণি! কেঁদ না কো—নাইকো কোন ভয়।

যদি আমার একটি কথা রাখ্‌তে পার তুমি।
স্বামী তোমার সেরে যাবে, ওষুধ দেব আমি॥
গরীব মানুষ তোমরা বড়, চাই নে টাকা কড়ি।
এমন ওষুধ অমি দেবো, খরচ টাকার কাঁড়ি॥
আগে ভেবেছিলেম আমি রোগ শক্ত নয়।
কিন্তু এখন চোখে দেখে সন্দ মনে হয়॥
স্বামীর তোমার পূর্ণ বিকার, রক্ষে পাওয়া ভার।
কিন্তু যদি কথা রাখ, ক'রবো প্রতিকার॥"

"কি ক'রবো গো বল" কেঁদে নিস্তারিণী বলে।
জয় ডাক্তার বলে,—"এস আড়াল পানে চ'লে॥"
জয় ডাক্তার আগে গেল, নিস্তারিণী পাছে।
জয় ডাক্তার ধীরে ধীরে বলে কানের কাছে॥—
"নিস্তারিণি! বল্‌বো কি আর, মনে বুঝে নাও।
তোমায় বড় ভাল বাসি;—আমার পানে চাও॥
স্বামী তোমার ভাল হবে—চাই নে টাকা কড়ি।
নিস্তারিণি!—নিস্তারিণি!—তোমার পায়ে পড়ি॥"
এই কথা না কানে শুনে নিস্তারিণী ভয়।
কেমনতর হয়ে গেল পাঙাসপানা হয়ে॥
হায় গো, একে স্বামীর শোকে শুকিয়ে গেছে মুখ।
তাতে আবার এই কথাতে ফেটে গেল বুক॥
কি বল্‌বে যে—কি কর্‌বে যে—অবাক্ হয়ে গেল।
আকাশ ফেড়ে যেন তেড়ে বজ্র মাথায় প'লো॥

মহাপাপী জয় ডাক্তার পিশাচ অবতার।
হাত বাড়িয়ে ধ'র্‌তে গেল আঁচলখানি তার॥

"ছুঁয়ো না গো বাবু আমায়—তোমার পায়ে পড়ি।
স্বামী গেল—আমিও এবার গলায় দেবো দড়ি॥"
এমন সময় দোকানঘরের বাইরে যেন কা'রে।
বল্‌লে কে গো "আসুন মশায়" চেনো চেনো স্বরে॥
নিস্তারিণী বুঝলো সে স্বর, ঠাকুর-পো আবার এল।
"ও ঠাকুর-পো!" ব'লে সতী ভুঁয়ে প'ড়ে গেল॥
জয় ডাক্তার চ'ম্‌কে ওঠে—ভ্যাবাচ্যাকা লাগে।
হাতে হাতে পাপকর্ম্মের ফলটা মনে জাগে॥
বেরিয়ে যাবে মনে ভাবে, কিন্তু উপায় নাই।
পথ বন্ধ,—দোয়ার গোড়ায় গউর মুদির ভাই॥
মনে ভাবে,—"নিস্তারিণী মূর্চ্ছা প'ড়ে আছে।
দেখ্‌বে না কো—লুকিয়ে থাকি—পালিয়ে যাব পাছে॥"
তলাছেঁড়া কুপো ছিল দোকানঘরের কোণে।
জয় ডাক্তার লুকোয় গিয়ে সেইটে গায়ে টেনে॥
যেমন কুপো তেম্নি হলো;—নাই ডাক্তার ঘরে।
ঘরে বেহুঁস গউর—বেহুঁস নিস্তারিণী দোরে॥
নিধিপুরের শ্যাম বদ্দি, সঙ্গে নিয়ে তাঁকে।
এমন কালে নিতাই মুদি দোকানঘরে ঢোকে॥
মিটির মিটির জ্ব'লচে আলো; নাই কো কারু কথা।
নিতাই দেখে, দোয়ার গোড়ায় গড়ায় কনকলতা॥
ঘরের ভিতর প্রাণের দাদা বেহুঁস্ হ'য়ে প'ড়ে।
তাই না দেখে ছোট ভেয়ের পরাণ গেল উড়ে॥
আকুল হ'য়ে নিতাই ডাকে—"ও বৌ, ও বৌ" ব'লে।
নিস্তারিণী চেতন হ'ল—চক্ষু নাহি খোলে॥
হঠাৎ কেঁদে উঠে বলে,—"বাবু মহাশয়!

জীবন দেবো—বাঁচাও স্বামী,—এ কাজ আমার নয় ॥
ভদ্র তুমি—গরিব আমি—গরীব নোকের জায়া।
আমি তোমার মেয়ে, বাবু! নাই কি দয়া মায়া?"
ভ্রাতৃজায়ার মুখে শুনে এমনতর কথা।
নিতাই বলে,—"বৌ কি বলে! কে এখানে কোথা?
কি ব'ল্‌চো বৌ?—নিতাই আমি, বারেক দেখ চেয়ে।
কেন এমন ব'ক্‌চো তুমি পাগল-পারা হ'য়ে?"
নিস্তারিণী দেখ্‌লে চেয়ে, ঠাকুর-পো তার বটে।
জয় ডাক্তার যা' বলেছে, ব'ল্লে তা' মুখ ফুটে ॥
তাই না শুনে নিতাই নাগের চক্ষু হোলো লাল।
দারুণ রাগে শরীর কাঁপে মূর্ত্তি যেন কাল ॥
কোবরেজকে নিতাই বলে,—"ব'স দাদার কাছে।
দেখি আমি জয় ডাক্তার লুকিয়ে কোথায় আছে ॥"
এই-না ব'লে, নিতাই মুদি দোকানঘরে খোঁজে।
কুপোর ভিতর জয় ডাক্তার ভয়ে ঘামে ভেজে ॥
থথরিয়ে শরীর কাঁপে, কুপো কাঁপে তায়।
নিতাই নাগের চক্ষু গিয়ে প'ড়লো কুপোর গায় ॥
দৌড়ে গিয়ে নিতাই মুদি কাঁপা কুপোর কাছে।
নেড়ে চেড়ে বলে,—"শালা এই যে এতে আছে ॥
ও শালা!—ও শালার ব্যাটা! এই কাজ কি তোর?
সাধুগিরি ফলিয়েছিলি, ওরে ছুঁচো চোর!
যেমন কম্ম কোল্লি, শালা! তেম্নি পাবি ফল।
বাইরে ফলাস্ ভালমানুষি, মনের ভিতর মল!
হাড় গুঁড়োবো আজকে রে তোর ক'রে মুগুর-পেটা।
পাপ কাজ কি ছাপা থাকে, ওরে শালার ব্যাটা!"

এই-না ব'লে নিতাই কোপে কুপোয় মারে লাথ।
লাথির চোটে চামড়া ফেটে অম্নি কুপোকাৎ!
কুপোয়-ঢোকা জয় ডাক্তার উল্টে পড়ে ভূঁয়ে।
লাথির উপর আবার লাথি!—চেঁচায় ভূঁয়ে শুয়ে॥
জয় ডাক্তার ব'ল্‌বে কি যে, খুঁজে নাহি পায়।
"ঘাট হ'য়েছে" ব'লে ধরে নিতাই মুদির পায়॥
নিতাই বলে,—"খৎ দে নাকে—বল্ বোকে মা।
তবে শালা বাঁচবি প্রাণে,—নইলে তুলি পা॥
বদ্‌মাইসি ক'র্‌বি ব'লে ওষুধ দিলি কড়া।
তাইতে আমার দাদার দশা প্রাণ থাক্‌তে মড়া॥
বল্ দাদাকে কর্‌বি ভাল, ম'লে দায়ী হবি।
খৎ লিখে দে তেম্নি ক'রে, যদি বেঁচে রবি॥"
জয় ডাক্তার প্রাণের দায়ে নাকে দিয়ে খৎ।
'গউর ম'লে দায়ী আমি' লিখে দিলে খৎ॥
বদ্‌মাইসি বই তো না তার সঙ্গে ওষুধ ছিল।
খাইয়ে দিলে দু তিন মোড়া গউর ভাল হ'ল॥
কবি বলে, পাপকর্ম্মের ফলটা হাতে হাত।
লাথির চোটে ভাগ্যে ঘটে এম্নি কুপোকাৎ!

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫১*

মনোমোহন বসু

১৮৩১—১৯১২

মনোমোহন বসু

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— মাঘ ১৩৫২

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২৭. ১. ৫৭

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-সকল বঙ্গ-মনীষী বিভ্রান্ত বাঙ্গালী-জাতিকে আত্মস্থ হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন বসু একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার প্রতিটি চিন্তা ও কর্ম্মের মূল উৎস ছিল—স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম। তাই তাঁহার লেখনী এক দিকে যেমন সে-যুগের বিপথগামী বাঙ্গালী জাতিকে কশাঘাত করিতে দ্বিধা করে নাই, অন্য দিকে তেমনি তাহার সম্মুখে একটি মহৎ আদর্শ উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখন এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সে-যুগের বাঙ্গালীরাও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। হিন্দুমেলায় প্রদত্ত মনোমোহনের জাতীয়-ভাবোদ্দীপক ওজঃপূর্ণ বক্তৃতাবলী, 'হরিশ্চন্দ্র' ও অন্যান্য নাটক এবং জাতীয় সঙ্গীতাদি বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। বাঙ্গালীর জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে ইহাদের প্রত্যেকটির স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। তাঁহার

"দিনের দিন্, সবে দীন, হয়ে পরাধীন!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!"

সঙ্গীতটি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ইহার পর ৭০ বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু যে-সব সমস্যার কথা এই সঙ্গীতটির বিষয়, আজিও তাহার সমাধান হয় নাই।

জন্ম

মনোমোহনের পিতার নাম—দেবনারায়ণ বসু; তাঁহার নিবাস—২৪ পরগণার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। ইহার ১৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামে ক্ষুদ্র

গ্রামে মাতামহালয়ে মনোমোহনের জন্ম হয়। অনেকে তাঁহার জন্ম-তারিখ—আষাঢ় ১২৩৪ সাল বলিয়া [illegible], কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ৩০ আষাঢ় ১২৩৮ (১৪ জুলাই ১৮৩১)। আমরা মনোমোহনের স্বহস্তে লেখা একখানি ডায়ারি বা দিনলিপি পা[illegible] ; তাহাতে তিনি স্বীয় জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

খৃঃ অব্দ ১৮৮৬

> এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর ৪ চারি মাস—যেহেতু সন ১২৩৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম রথের পর দ্বিতীয় রথের মধ্যে যে বুধবার, সেই বুধবারে আমার জন্ম। তিথি ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শুক্লা পঞ্চমী। ঠিকুজী ছিল, হারাইয়া গিয়াছে।

ডায়ারিতে লিখিত জন্ম-তারিখটি যে নির্ভুল, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। মনোমোহন তৎসম্পাদিত 'মধ্য[illegible]ত্রে (২য়-৩য় বর্ষ, ইং ১৮৭৩-৭৪) "সমাজচিত্র ইত্যাদি। অথবা [illegible]লের জীবন" লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই বাল[illegible]নের কথা। "কেঁড়েল" নাম গ্রহণ করিয়া তিনি এই সময়ে 'না[illegible]মের অভিনয়' নামে একখানি প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন। "[illegible]ড়লের জীবনে" তিনি যে জন্ম-বিবরণ দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, ডায়ারির উপরিলিখিত অংশের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :—

> "সপ্তদশ ত্রিপঞ্চাশৎ শকাব্দাঃ, আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রথম বিমানযাত্রার দুই দিবসান্তে, ঘোরা, গভীরা, 'জলধরপটলাবৃতা' তাহাতে যেন তিমিরাবগুণ্ঠন-ধারিণী যামিনী ঠাকুরাণী প্রথম দশ দণ্ড পতিসোহাগিনী থাকিবার পর এক্ষণে বিরহিণী, সুতরাং নিতান্ত বিষাদিনী হইয়া মুখ আঁধার

করিয়া রহিয়াছেন ; হেন কালে টিপ টিপ্‌নী বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, তিনি যেন—অশ্রুপাত করিলেন ! তাঁহার অন্তরের তাপ জানিতে পারিয়া অনুচর বাদুড় ভায়া তিন্তিড়ীশাখা ছাড়িয়া বিশাল দুটী পাখা নাড়িয়া বাতাস করিতে লাগিল ; তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ চির-সখা পেচক মহাশয় মধুর স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন ; সানায়ের যুড়ি যেমন বিরাম ব্যতীত একঘেয়ে 'পোঁ' শব্দ ছাড়িতে থাকে, গায়কপ্রধান পেচকের সঙ্গে ঝিল্লিও তেমনি অবিশ্রান্ত অক্লান্ত স্বর সংযোগ করিল ! গ্রাম্য চৌর, চৌকীদারের সহিত ভাগের বন্দোবস্ত করিয়া সচকিত অতি ত্রস্ত সন্ধি-শলাকা (সিঁধকাটী) হস্তে আস্তে আস্তে গৃহস্থের গবাক্ষনীচে দাগ দিতেছে, সেই শুভ লগ্নে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে মাতামহভবনে কর্কট রাশিতে আমি (কেঁড়েল) ধরণীপৃষ্ঠে প্রথম অবতীর্ণ হইয়া 'ট্যাঁ ট্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়াছিলাম। আমি চতুর্থ গর্ভের সন্তান। এই আমার জন্মবৃত্তান্ত বা জন্মকোষ্ঠী !"—'মধ্যস্থ'—৪ঠা আশ্বিন—১২৮০ ।

বাল্য-জীবন

"সমাজচিত্র অথবা কেঁড়েলের জীবন" হইতে আমরা মনোমোহনের বাল্যজীবনের কথা যেটুকু জানিতে পারি, তাহা "কেঁড়েলের" ভাষায় সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমি কুলীন কায়স্থ-কুল-সম্ভূত। মাতামহ মহাশয়ও কুলীন। তিনি কলিকাতা জেনার‍্যাল পোষ্ট অফিসের খাজাঞ্চি এবং আমার পিতা মহাশয় কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত

কোম্পানীর ডাকের ঠিকাদার ছিলেন। [illegible] হইতেই ডাকের ঠিকাগ্রহণ প্রথার প্রথম সূত্রপাত হয়। তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে এদেশের সমস্ত রাজবর্ত্মই তাঁহার ঠিকা-ভুক্ত হওনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ কাল তাহা শুনিল না—অকালেই পিতাকে হরণ করিয়া লইল। সে শোচনীয় ঘটনা নিশ্চিন্তপুরে নয়, আমাদের নিজ বাটীতেই ঘটে।...তিন বৎসর বয়সের সময় পিতার পরলোক হয়।......

মা ও পিসীমা বলিতেন, আমি ৫।৬ মাসে বসিতে, ৭ মাসেই হামাগুড়ি দিতে, ১০।১১ মাসেই দাঁড়াইতে এবং এক বৎসরের পরেই চলিতে পারিয়াছিলাম।...তৎকালে সমস্ত বঙ্গদেশমধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রথা ছিল, যে, পুত্র সন্তান পঞ্চমবর্ষীয় হইলে ভাল একটা দিন দেখিয়া হাতে খড়ি দেওয়া হইত।... যৎকালে আমার হাতে খড়ি হইবার বয়স, আমি তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বর্ণমালা প্রভৃতি লেখা পড়া ছাড়াই[illegible] উঠিয়াছিলাম।... শুদ্ধ ইহা নহে, আমি তখন দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষি[illegible] প্রহ্লাদচরিত্র পুথি অবলীলাক্রমে পড়িতাম।...আমাদের নি[illegible]াটীতেই পাঠ-শালা ছিল; তাহাতেই লিখিতাম পড়িতাম।...

ছয় বৎসর বয়সের সময় আমি এবং আমার মধ্যমাগ্রজ জননীর সহিত নিশ্চিন্তপুরে গেলাম।......কৃষ্ণনগর জিলার অন্তর্গত [illegible] ক্ষুদ্র, কিন্তু ভদ্র গ্রামে আমার মাতামহ বাস করিতেন। আমাদিগের নিজ গ্রাম হইতে নিশ্চিন্তপুর ষোল ক্রোশ উত্তর দিগে স্থিত।...সে বার ঘটনাসূত্রে চারি বৎসরের অধিক কালও মামার বাড়ী থাকি।...

হরিশ গুরু মহাশয় গেলেন, আমার চিত্ত অত্যন্ত উদাস

হইল। আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের পরামর্শে আমার মাতামহী কহিলেন, "তুই কেন টোলে পড়তে যা না?" আমি এই নূতন বিদ্যার নাম শুনিয়া উৎসাহে নাচিয়া উঠিলাম— অবিলম্বে রাধামোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করিলাম।......এক বৎসর কাল অত্যন্ত মনোভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছিলাম, তাহার পর অত অনুরাগ ছিল না।"

"কেঁড়েলের জীবন" হইতে মনোমোহনের বাল্য-জীবনের আর কোন কথা জানা যায় না।

মনোমোহন অতঃপর মাতামহালয় হইতে ছোট জাগুলিয়ায় ফিরিয়া আসেন। তথায় কিছু দিন ইংরেজী পড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইলে তিনি জেনারাল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিউশনে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে) প্রবেশ করেন। মনোমোহন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি একবার রচনা-প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। রচনার বিষয় ছিল— ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

শৈশব হইতেই মনোমোহন কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হন। পাঠক-মহলে তখন 'প্রভাকরের' প্রবল প্রতিপত্তি। মনোমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার

প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শোনা যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও তাঁহার কোন কোন রচনা স্থান লাভ করিয়াছিল। রচনা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিলে মনোমোহন নিজেই একখানি সাময়িক-পত্র পরিচালন করিতে অগ্রসর হইলেন। এই পত্রিকাখানির নাম—

'সংবাদ বিভাকর'।

ইহা একখানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ জুন ১৮৫২ (৩ আষাঢ় ১২৫৯, মঙ্গলবা)। ইহার আবির্ভাবে পরবর্ত্তী ১৭ই জুন তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

> "আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, গত পরশ্বাবধি শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কোং কর্ত্তৃক 'সংবাদ বিভাকর' নামক অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র অর্দ্ধ মুদ্রা মাসিক মূল্যে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে নবীন সম্পাদকদিগের অভিপ্রায় এবং পত্রের রচনা উত্তম হইয়াছে...... ।"

এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই 'সংবাদ বিভাকরে'র প্রচার বন্ধ হয়। ৯ মে ১৮৫৩ তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে প্রকাশ,—

> The Bibhakar has ceased to exist since the commencement of the new Bengallee year.

কিন্তু যে পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়া সংবাদপত্রসেবী হিসাবে মনোমোহন বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন, তাহার কথা এইখানেই বলা প্রয়োজন। ইহা একখানি সাপ্তাহিক (পরে মাসিক) পত্র; নাম—

'মধ্যস্থ'।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে—১২৭৯ সালের ২রা বৈশাখ (১৩ এপ্রিল ১৮৭২) হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি

প্রচারিত হয়। পত্রের শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নবীনভাবাক্ষপলান্নসান্নবেঽষবীয়ঃসাপীঃ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের "প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমি কোনো পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই; কাহারো সহিত প্রণয় বা বিবাদ করিতে আসি নাই; ব্যক্তি-বিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতেও আসি নাই; আমি আমোদজনক নীতি-প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি—এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি—এই দোহাই পাড়িতে আসিয়াছি, যে,—'স্থির হও; উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম! কিন্তু একটু মন্থরগতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদক্ষেপ কর; সমযাত্রীদের কুড়াইয়া লও;—সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও?—সঙ্গী-হারা কেন হও? উন্নতির পথে বিঘ্ন-দস্যু অনেক আছে, একা একা গেলে অগ্রবর্ত্তী পরবর্ত্তী সকলেরি বিপদ্; গমনে বিলম্ব হয়, তাও ভাল, কিন্তু একত্র হও! কিছু বিলম্বে গেলে হানি হইবে না, অতএব সময় বুঝিয়া পথ দেখিয়া চল—অত রাতা-রাতি অত দৌড়াদৌড়ি, অত ব্যস্তসমস্ততার আবশ্যক কি?'......

......এই সব সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজকীয় ও অন্যান্য সামান্য বিষয়াদি সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, তত্তাবৎ বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই—ফলেন পরিচীয়তে!"

দ্বিতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা (৯ কার্ত্তিক ১২৮০) পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক আকারে চলিবার পর 'মধ্যস্থ' অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক-পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদকের স্বাস্থ্যভঙ্গই পত্রিকার এই রূপান্তরের কারণ। মাসিক আকারে 'মধ্যস্থ' প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল। বার বার অসুস্থ হইয়া মনোমোহন শেষে পত্রিকা রহিত করিতে বাধ্য হন। ইহার শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৮২।

'মধ্যস্থ' একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছল। ইহার গ্রাহকসংখ্যা নগণ্য ছিল না। ইহাতে কবিতা, উপন্যাস, বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, এমন কি, রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত।

চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা

বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যাহাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়—পরানুচিকীর্ষার পরিবর্ত্তে যাহাতে আত্মনির্ভরতা বা স্বাবলম্বনবৃত্তির উন্মেষ হয়, তদুদ্দেশ্যে চৈত্র বা হিন্দুমেলা জন্মলাভ করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। ১২৭৩ সালে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলাতে এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি প্রতি বৎসর—প্রধানতঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন উদ্যানে—এই মেলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। মেলার মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বদেশীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি বিষয়ের আলোচনায় মেলার কর্ত্তৃপক্ষ অগ্রণী হন।

মনোমোহন এই জাতীয়-মেলার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন।

তিনি ইহার বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে-সকল জাতীয়-ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা দিতেন, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইত। এগুলি বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুমেলার অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সভা—ন্যাশনাল সোসাইটির সহিতও মনোমোহন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এখানেও সমাজের নানা জটিল সমস্যা সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দিতেন এবং ইহার বিভিন্ন আন্দোলন ও জনহিতকর কার্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন। তাঁহার 'মধ্যস্থ' বাংলা ভাষায় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার মুখপত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলা চলে। জাতীয়-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বলেন :—

> "স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্ন-বারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে! তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা!" নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে সে ফল না পাই, অন্ততঃ

"স্বাবলম্বন" নামা মধুর ফুলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না! ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।······

এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগনের হস্ত-সম্ভূত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।···

প্রথম। অসম্বদ্ধ হিন্দু সমাজের-মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও তাহাতে অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দেওয়া এবং তাহার জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা প্রথম শ্রেণীর কার্য্য। তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ব্বক্ষণেই বলা গিয়াছে, সুতরাং পৌনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যও অতি গুরুতর; অর্থাৎ এক মেলার সময় হইতে অপর মেলার দিন পর্য্যন্ত সম্বৎসরমধ্যে হিন্দুসমাজের যে কিছু উন্নতি বা দুর্গতি হইয়াছে, বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া মেলার দিবসে এই শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ তাহা সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বিজ্ঞাপন করিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পবিত্র বিদ্যোৎসাহ কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত দেশস্থ মহাশয়েরা স্বজাতীয় ও স্বাবলম্বিত শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করাই এই বিভাগের বিশেষ কার্য্য হইবেক।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম "প্রদর্শন বিভাগ।" তাঁহারা মেলায় প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্যজাতসমূহ সংগ্রহ করিবেন।

পঞ্চম, সঙ্গীত বিভাগ। যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধপ্রকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণিমণ্ডলীর গুণ প্রকাশ, যন্ত্রাদির প্রদর্শন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে দেশে সুধারার প্রবর্ত্তনা হয়, এই শ্রেণীর তাহাই মুখ্য কর্ম্ম হইবেক।"

মেলার উদ্দেশ্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত ও ইহার কার্য্যভার বিভিন্ন মণ্ডলীর উপর অর্পিত হয়। মনোমোহন উক্ত বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে আরও বলেন :—

"ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ অধ্যক্ষগণ মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক বল-কৌশল-নিষ্পন্ন বিষয় প্রদর্শনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং এবং যথাসাধ্য পুরস্কারাদি দানপূর্ব্বক যাহাতে দেশমধ্যে ব্যায়াম শিক্ষার প্রারম্ভ হয়—যাহাতে "ভেতো বাঙ্গালী" আর "ভীরু বাঙ্গালী" বলিয়া অপর দেশের লোকেরা ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিতে আর না পারে, তৎসাধন পক্ষে যত্নশীল হইবেন।"

নাট্যজীবন

হিন্দুমেলার ন্যায় নাট্যকলার উন্নতিকল্পেও মনোমোহনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সে কালে কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের বস্তু ছিল। কিন্তু ই শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর রুচিরও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী ইংরেজী নাটক অভিনয়ে মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অভিনয় জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। ইংরেজী নাট্যসাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক,

ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাটকাভিনয়ের উৎসাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে নাটকাভিনয় ও নাটক-রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল। কয়েক জন অভিজাত বাঙ্গালী নাটকাদি রচনা করাইয়া নিজ ভবনে বা উদ্যানবাটিকায় তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। বাংলা নাটকের অভিনয় শহরের ন্যায় মফস্বলেও ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের অভাব দিন দিন অনুভূত হইতে লাগিল। এই অভাব যাঁহারা তৎকালে মোচন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন,—মনোমোহন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত 'রামাভিষেক নাটক,' 'সতী নাটক,' 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' সে-যুগে বিলক্ষণ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এগুলি তিনি বৌবাজার বঙ্গ-নাট্যালয়ের জন্য রচনা করিলেও, মফস্বলে অনেক সখের থিয়েটারে বহু বার অভিনীত হইয়াছিল।

কিন্তু ধনিগৃহে অনুষ্ঠিত সখের থিয়েটারে সাধারণের অবাধ গতি ছিল না। নাটকাভিনয়দর্শনে সাধারণে যাহাতে বিশুদ্ধ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইল (ডিসেম্বর ১৮৭২)। হিন্দুমেলা তখন বাঙ্গালীর মনে জাতীয় ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। এই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং রঙ্গালয়ের নাম দিয়াছিলেন—ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যশালা। এই জাতীয়-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মূলে মনোমোহনের কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। তিনি ইহার কর্ত্তৃপক্ষকে নানা ভাবে—কখন মৌখিক, কখন বা 'মধ্যস্থ' মারফৎ লিখিত পরামর্শ

দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থের কাজ করিতেন। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে মনোমোহন যে মত পোষণ করিতেন, এ-যুগেও তাহা প্রণিধানযোগ্য। জাতীয় নাট্যশালার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় তিনি একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন :—

......"দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটী গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গ-ভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কথা দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহু কালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালি, মরিচা, তর্জ্জা, ভজন, কীর্ত্তন, ঢব, আখ্ড়াই, হাফ্ আখ্ড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন—অধিক কি, যে দেশে দিন্‌ভিকারী ও রাত্‌ভিকারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না, সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এত দূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ

লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতাপ্রযুক্ত? কদাচ নহে। স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবে যে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না! যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান, কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ও পক্ষে আবার বর্ত্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসঙ্গতি বা অপকর্ষতাই একটি মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলত যে কয়টী গান হইবে, সে কয়টী যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপ-কথনাদি বিবৃত হউক। এরূপে কোনো কোনো অভিনেতৃসম্প্রদায় যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। ভরসা করি, জাতীয় নাট্যসমাজ সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া এ বিষয়ের অঙ্গরাগ বাড়াইয়া তুলেন।

আমার বক্তব্য দ্বিতীয় বিষয় এই যে, উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, রঙ্গ-

ভূমিতে সত্যকার স্ত্রী অভিনেত্রী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অভিনয়াই অংশগুলি কোনো মতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনীত হইতে পারে না। এ কথা আমরা আংশিকরূপে স্বীকার করি। কি আকৃতি, কি প্রকৃতি, কি স্বর, কিছুতেই কর্কশ ও রুক্ষস্বভাবী পুরুষেরা কোমলাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া ও মধুরভাষিণী কামিনীগণের ন্যায় হইতে পারে না। সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্ব্বপ্রকারেই ভাল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেমন উত্তম হইল, অন্যান্য বিচার্য্য যে বিষয় আছে, তাহাতেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। দৃশ্য-মনোহারিত্ব ও আমোদ-সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু সমাজের ধর্ম্মনীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় কি না, তাহা কি আর বহু বাক্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে? এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে এই রাজধানীতে —এত সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোনো সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শত বর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এদেশে নাটকাভিনয়রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধক ধর্ম্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে

আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃ-সমাজ অবলম্বন না করেন! অধিক আর বলিতে চাহি না।”

রচনাবলী

মনোমোহন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নাটকের সংখ্যাই অধিক। সর্ব্বপ্রকার গান রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ইহার নিদর্শন 'মনোমোহন-গীতাবলী'তে বিদ্যমান। তাঁহার রচিত শিশুপাঠ্য সরল 'পদ্যমালা' আজিও শিশুদের আনন্দ বর্দ্ধন করে। আমরা মনোমোহনের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **রামাভিষেক নাটক**। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ (ইং ১৮৬৭)।

২। **প্রণয়পরীক্ষা নাটক**। ভাদ্র ১২৭৬ (সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)।

৩। **পদ্যমালা** :

১ম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ইং ১৮৭০)। পৃ. ৩৪।

২য় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (১৮৮২)।

৩য় ভাগ। ১৩০০ সাল (২৭ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ১০৭।

শিশুপাঠ্য সরল পদ্যগ্রন্থ।

৪। **সতী নাটক**। ১৮ মাঘ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৪ সাল) একটি অতিরেক অঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে।

৫। **হিন্দু আচার ব্যবহার,** ১ম ভাগ—পারিবারিক।

ফাল্গুন ১৭৯৪ শক (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ৬৮।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই পুস্তক পরিবর্দ্ধিত আকারে 'হিন্দু-আচার-ব্যবহার—পারিবারিক ও সামাজিক' নামে প্রকাশিত হয়।

৬। **বক্তৃতামালা**। বৈশাখ ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১১২।

সূচী :—দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় বক্তৃতা (চৈত্র-সংক্রান্তি, শনিবার ১৭৮৯ শক)। তৃতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় মেলার কর্ত্তব্যবিষয়ক ও উৎসাহ-সূচক বক্তৃতা (৩০শে চৈত্র ১৭৯০ শক)। হিন্দুমেলার উৎসাহ-সূচক বক্তৃতা (৩০শে মাঘ ১২৭৮ সাল)। বারুইপুর-মেলার বক্তৃতা (১২৭৮ সাল, ফাল্গুন-সংক্রান্তি)। বিদ্যালয়ের ছাত্র ; ছাত্রের প্রতি কর্ত্তব্য (ছোটজাগুলিয়া-হিতৈষী সভায় বিবৃত, পৌষ ১৭৮৮ শক)।

৭। **নাগাশ্রমের অভিনয়** (প্রহসন)। ১৭৯৬ শক (২৮ জানুয়ারি ১৮৭৫)। পৃ. ১১০।

ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-হিসাবে "কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র" এই নাম আছে।

৮। **হরিশ্চন্দ্র নাটক**। পৌষ ১২৮১ (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। পৃ. ১৫৭।

৯। **পার্থ-পরাজয় নাটক**। অর্থাৎ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব। ফাল্গুন ১৮০২ শক (১২ মার্চ ১৮৮১)। পৃ. ৮৪ + ১১।

১০। **মনোমোহন-গীতাবলী**। অর্থাৎ বাবু মনোমোহন বসু-কৃত হাফ্ আখ্ড়াই, কবি, নাটক, গীতাভিনয়, পাঁচালি প্রভৃতি বিবিধ গান। মাঘ ১২৯৩ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭)। পৃ. ২৪৬।

১১। **রাসলীলা নাটক**। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ (মে ১৮৮৯)। পৃ. ১০৪।

১২। **আনন্দময় নাটক**। আষাঢ় ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ১১৬।

১৩। **দুলীন** (ঐতিহাসিক নবন্যাস)। ভাদ্র ১৮১৩ শক (ইং ১৮৯১)।

১৪। **সত্যনারায়ণ-কথা**। কার্ত্তিক ১৩২৮ (ইং ১৯২১)।

শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"আমার পূজ্যপাদ পিতামহ কবি-নাট্যকার স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই সত্যনারায়ণকথা রচনা করেন।"

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

'সংবাদ প্রভাকর,' 'মধ্যস্থ,' 'গান ও গল্প,' 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি পত্রে মনোমোহনের বহু গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার অনেকগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'নাট্য-মন্দির' পত্রে (১৩১৭-১৮) ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত তাঁহার রচিত "সতীর অভিমান" নাটকখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অপ্রকাশিত ডায়ারি

শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর সৌজন্যে তদীয় পিতামহ মনোমোহনের একখানি অপ্রকাশিত ডায়ারি বা দিনলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসরের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই দিনলিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

২৩শে কার্ত্তিক—১২৯৩। সোমবার

অদ্য সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ষ্টেট্‌সোম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশ নিমিত্ত M স্বাক্ষরিত একখানি প্রেরিত পত্র পাঠাইলাম। তাহার বিষয় ও উদ্দেশ্য এই ;—"ধর্ম্মবীর মহম্মদ" নামে একখানি বাঙ্গলা নাটক (অতুলকৃষ্ণ মিত্র-লিখিত) বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। মুসলমানদের আপত্তি হেতু সেই দুই ভাগবিশিষ্ট পুস্তকের অবিক্রীত তাবৎ খণ্ড গুরুদাস বাবু নবাব আবদুল লতিব খাঁ বাহাদুরের নিকট ধ্বংসাভিপ্রায়ে প্রেরণ করেন। নবাব

তদ্বিষয় ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করাতে কোনো কোনো বাঙ্গালা সংবাদপত্র-সম্পাদক ও ইংরাজী কাগজের কতিপয় পত্র-প্রেরক এতদুপলক্ষে তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলেন। যৎকালে গুরুদাস বাবু নবাবের বাড়ীতে যান, তখন আমার বন্ধুতম (রুদ্র) বেণীবাবুর সহিত আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং সদাত্মীয় গুরুদাস বাবুর এতদ্বিষয়ক তাবদ্ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সুতরাং বিগত শনিবারের ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে একজন পত্রপ্রেরক ঐ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতকগুলি কাল্পনিক অযথা কথা যাহা ছাপাইয়াছিল, সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ঐ প্রেরিত পত্র পাঠাইলাম।

২৩শে মাঘ, রবিবার ১২৯৬

…প্রথম বার যখন কাশীতে আসি, সে ৩৮ বৎসরের কথা। তখন ইঁহার [শীতলপ্রসাদ গুপ্ত] সহিত খুব আত্মীয়তা ও প্রণয় হইয়াছিল। পরে তিনি এলাহাবাদে গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে বহু কাল তথায় সপরিবারে বাস করিতেছেন।…

…ইনি কয় বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে আমাকে এতন্মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, "বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে কন্যাদায় এখন মহাবিপদ্ হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত ও অসম্ভবরূপে ঋণগ্রস্ত না হইলে আর মেয়ে পার করা ঘটে না, ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই উচিত। আমি এলাহাবাদে তজ্জন্য একটি সভা স্থাপনের যত্ন করিতেছি। কিন্তু রাজধানী কলিকাতায় একটি মহা উদ্যোগ না হইলে নিয়তর স্থাপনের চেষ্টায় কি হইবে। আপনি ঈশ্বরানুগ্রহে এক্ষণে কলিকাতায় একজন গণ্যমান্য লোক, তথায় বড় বড় লোকের সাহায্যে মুন্সি প্যারীলালের অনুকরণে যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন তো স্বীয় সমাজের অশেষ মঙ্গল করা হয়।" ইত্যাদি ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি পীড়িত অবস্থায় প্রায়ই স্বীয় গ্রামে থাকিতাম। এ যদি আরো কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমার মধ্যস্থ কাগচের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যখন জাতীয় সভায়

আমি একজন প্রধান বক্তা ও সাহায্যকারীরূপে গণ্য হইতাম এবং যখন প্রায় সকল বড় লোকের সহিত সদ্ভাব ও তাঁহাদের নিকট যাতায়াত ছিল, তখন এই মহৎ বিষয়ের এরূপ মহৎ প্রস্তাব হইত, তাহা হইলে হয়তো কতকটা করিয়া ফেলা যাইত। তাহাও সন্দেহের বিষয়, কেন না, আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বাঙ্গালীর দ্বারা বচন বৈ প্রকৃত কোনো ভাল কার্য সিদ্ধ হওয়া এখনও বহুদূরবর্ত্তী কাল সাপেক্ষ। বহু বহু পুরুষানুক্রমিক জাড্য, ঔদাস্য ও স্বার্থপরায়ণতা চলিয়া আসিয়া হাড়ে হাড়ে স্বদেশহিতৈষিতায় বিপরীত ভাব ঘুন ধরার ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছে, এখন কি দুই চারি পাতা ইংরাজী পড়িয়া সেই সব পৈতৃক রোগ একদিনে সারিতে পারে; তবে এইরূপ চেষ্টা ও শিক্ষা ও অভ্যাস ক্রমশ হইতে হইতে দেশের ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া ভালর দিগে দাঁড়াইতে পারে। অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়, চেষ্টা চাই, চেষ্টা না করিলে ধাতু সংশোধন হইবে কেন ?…

[সন ১২৯৮ সাল ১৪ই পৌষ স্ত্রী-বিয়োগরূপ নিদারুণ ঘটনা হইবার কয় দিন পরে নিম্নস্থ গান স্বেচ্ছায় হয়]

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল ঠেকা।

কোথা গেলে, আমায় একা ফেলে, সংসার তুফানে ঘোরে ?
বিলম্ব করো না প্রিয়ে, সাথে নে যেতে আমারে !
তোমা ভিন্ন শূন্য দেহে, রহিতে এই শূন্য গেহে,
কিছুতে প্রাণ না চাহে, পুত্রস্নেহে কিবা করে ?*

---

* সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম না। ইহা "শোক-সঙ্গীত" নামে ২৫ ভাদ্র ১৩০১ তারিখের 'অনুসন্ধান' পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

[তাহার কিছু দিন পরে রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ এই গানটী হইল]

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ তেতালা।

ছি ছি রে, স্মর্‌ণ! তোর্ স্বভাব কেমন!
দোষ নাহি ধর, শুধু গুণ তার, কর হৃদে উদ্দীপন্?

১

তুমি বল দোষ কৈ ?—আমি বলি দোষ তো ঐ,*
অন্য দোষ পেলে কি হই, এরূপে শোকে মগন্?

২

সাথী রেখে পলাইল, ইথে কি দোষ্ না হইল?
কারে সঁপে দিয়ে গেল, যারে বলিতে আপন্?
তেজিবে মন ছিল যদি, তবে কেন বাল্যকালাবধি
নিরবধি প্রেম-নিধি, দিয়ে করিল যতন?

৩

সে কি সামান্য প্রণয়, যাহাতে পতি-হৃদয়,
চাঞ্চল্য ত্যজি তন্ময় হয়ে সমর্পিল মন্।
সে পতিরে এ অকালে, কি ব'লে সে গেল ফেলে,
সাথে নিয়ে যেতে চ'লে, তার কি হ'লো এমন্?

৪

কাঁদিয়া কাটই নিশা, দিবসে হারাই দিশা,
শান্তি, শক্তি, বুদ্ধি কৃশা, জীবনে যেন মরণ!
বটে নিজ কর্ম্মফলে, এ অনলে মর্ম্ম জ্বলে,
কিন্তু সতীধর্ম্ম বলে, করে না কেন মোচন?

---

* দোষ যে নাই, ছিল না বলিতেছ, তাহাই আমার নিকট দোষ। কেন না, দোষ থাকিলে বা পাইলে এত পাগল হইতাম না।

মনোমোহন লাইব্রেরি

আনুমানিক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন কলিকাতায় 'মনোমোহন লাইব্রেরি' নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুস্তকালয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ১৭ এপ্রিল ১৯০৩ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' হইতে একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি :—

মনোমোহন লাইব্রেরী

বিশ বৎসরের অধিক হইল ঈশ্বরের কৃপায় আমরা বরাবর অতি সুলভ মূল্যে স্কুল, কলেজপাঠ্য পুস্তক, ম্যাপ, নাটক, নভেল, শাস্ত্র, বটতলার গ্রন্থ প্রভৃতি সরবরাহ করিতেছি। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে লিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠ্য ও ব্যাখ্যা সকল ছাপা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বোচ্চ কমিশনে গ্রাহকগণকে দিয়া থাকি। যাহার যেরূপে সুবিধা, তাহাতে পাঠাই। মনোমোহন বসু—২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

জীবন-সায়াহ্নে মনোমোহন কিছু দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩০২, ১৩০৫ ও ১৩০৬ সালে তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৩০৩ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

মনোমোহনের আয়ুঃসূর্য্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ (২১ মাঘ ১৩১৮) রবিবার তারিখে ৮১ বৎসর বয়সে

ত'ন্তুক পাড়ার (বর্ত্তমানে মনোমোহন বসু ষ্ট্রীট) বাটীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'হিতবাদী' যে শোকসংবাদ প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

আমরা গত বারে বঙ্গের বর্ষীয়ান্ লেখক, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয়ের বিয়োগবার্ত্তা পাঠকদিগকে প্রদান করিয়াছি। কিন্তু সময়াভাবে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কোন পরিচয় দিতে পারি নাই। গতপূর্ব্ব রবিবার অপরাহ্নকালে তিনি লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৪ বৎসর [?] হইয়াছিল। কয়েক দিন রোগ ভোগ করিয়া পুত্র পৌত্র পরিজন এবং বান্ধবমণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মনোমোহন অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে মনোমোহন বাবুর ন্যায় দীর্ঘজীবী ব্যক্তি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বঙ্গের অতীত ও বর্ত্তমান সাহিত্যযুগদ্বয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যুতে পুরাতনের সহিত নূতনের—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সংযোগগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল। সাহিত্যক্ষেত্রে মনোমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুর সতীর্থ ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সাহিত্যগুরু কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহারও সাহিত্যাচার্য্য ছিলেন। মনোমোহনের কবিতায় গুপ্ত কবির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্ত কবির কবিতার ন্যায় তাঁহার কবিতানিচয় খাঁটি বাঙ্গলা কবিতা,—তাহাতে পাশ্চাত্য কবিতার 'বোটকা' গন্ধ নাই। তাঁহার রচিত শিশুপাঠ্য পদ্যমালা—শিশুদিগের কণ্ঠে শিশির-জড়িত শেফালির মালা, তেমনই কোমল, কমনীয় এবং পবিত্র।

বঙ্কিম-যুগে সাহিত্য চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াও মনোমোহন বাবু নিজ সাধনা ও শক্তিবলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, গদ্য ও পদ্য রচনায় সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত সতী নাটক, হরিশ্চন্দ্র, রামাভিষেক, প্রণয়পরীক্ষা, রাসলীলা প্রভৃতি নাটক তাঁহার শক্তিমত্তার পরিচায়ক। রসাবতারণায়, বিশেষতঃ করুণ ও হাস্যরসের অবতারণায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছিলেন। তাঁহার নাটক পড়িয়া ও উহার অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী হাসিয়াছে এবং কাঁদিয়াছে। তিনি স্বপ্রণীত নাটকসমূহের নূতন চরিত্র চিত্রিত করিয়া এবং পৌরাণিক পুরাতন চরিত্র নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। 'সতী-নাটকে'র শান্তে পাগলা, 'রামাভি-ষেকে'র দশরথ সাহিত্যে প্রেমভক্তি প্রীতির অপূর্ব্ব চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তৎপ্রণীত 'দুলিন' উপন্যাস পাঠে বঙ্গের অনেক পাঠক মুগ্ধ হইয়াছেন।

মনোমোহন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশবৎসল হিন্দু ছিলেন। তিনি নিজ ধর্ম্ম ও সমাজকে কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন আর কেমন করিয়াই বা সেই সমাজের মস্তকে ধর্ম্ম ও মহিমার মুকুট পরাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা পাঠক তাঁহার "হিন্দু আচার ব্যবহার" ও "বক্তৃতামালা' পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" বাহির হইবার পূর্ব্বে মনোমোহন বাবু "মধ্যস্থ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার করিয়া জনসমাজে যশস্বী ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হন। মনোমোহন বাবু একরূপ অনন্যসহায় হইয়াই এই সংবাদপত্র সম্পাদন ও পরিচালন করিতেন। 'মধ্যস্থ' সম্পাদন কার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে তিনি

শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। তজ্জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উক্ত পত্রের সম্পাদন কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মনোমোহন বাবু গান রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত গান শুনিয়া অনেকে প্রীত ও পুলকিত হইতেন। মনোমোহন বাবু যে সময়ে পরিণত-বয়স্ক, সেই সময়ে কলিকাতার হাফ-আখড়াই নামক সঙ্গীতসমর খুব প্রচলিত ছিল। তিনি এই সকল সঙ্গীত-যুদ্ধে উপস্থিত জবাব দিয়া প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতেন। এই সকল গীতি-যুদ্ধে তিনি এরূপ গীতরচনা-কৌশল এবং ভাব-সমাবেশ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন যে, গুণগ্রাহী পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

শুনিতে পাই, একবার কাশীধামে হাফ আখড়াইয়ের আসরে গুরু-শিষ্যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। মনোমোহন নিজগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত গীতিরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশীর হাফ আখড়াইয়ে 'শিষ্যবিদ্যাই গরীয়সী' হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহনের গুণপণায় এরূপ প্রীতি ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গীতক্ষেত্রে স্বয়ং হারি মানিয়া শিষ্যের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবু গুণবান্ ব্যক্তি হইলেও নিরহঙ্কার ছিলেন। তাঁহার বিনয়, সরলতা ও প্রকৃতির মধুরতা তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয় করিয়াছিল। কেহ তাঁহাকে দিয়া গান রচনা করাইয়া লইতে চাহিলে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। মনোমোহনের স্বদেশানুরাগ বড় প্রবল ছিল। তিনি চিরদিন স্বদেশের ও স্বজাতির দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবনের একটি মহতী সাধনাস্বরূপ হইয়াছিল। "দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন", "উন্নতি উন্নতি, উল্লাস ভারতী, কেন দিবা রাতি

বল রে" প্রভৃতি গানে তাঁহার স্বদেশানুরাগের দিব্য প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

দীর্ঘজীবীদিগের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, মনোমোহন বাবুর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল; তিনি জীবনে অনেক শোক তাপ সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আধিব্যাধি, যন্ত্রণা ও শোকের দাবদাহ তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি স্থির, ধীর ও গম্ভীরপ্রকৃতির পুরুষ ছিলেন—দুঃখে দুর্দ্দিনে তিনি মেরুর ন্যায় অটল এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া থাকিতেন। নিদারুণ পুত্রশোকে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইলেও তিনি নীরবে সে শোক সহ্য করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার সজ্জন-সমাজের সৌজন্য ও উদারতার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন বঙ্গের বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল।—"হিতবাদী" ৪ঠা ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩১৮ সাল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মনোমোহনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৫ আশ্বিন ১৩২৫ তারিখে পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চিত্রখানি মনোমোহন বাবুর পৌত্র [illegible] শিল্পী অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

মনোমোহন বসু ও বাংলা সাহিত্য

কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের যে শিষ্যসম্প্রদায় বাংলাসাহিত্যের নানা বিভাগে যশস্বী হইয়া আজও পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া আছেন, কবি মনোমোহন বসু তাঁহাদের পুরোভাগে না থাকিলেও তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু যদি সদর রক্ষা করিয়া থাকেন, কবি মনোমোহন খিড়কি-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। যাত্রাগান, পাঁচালী ও হাফ-

আখড়াই প্রভৃতি রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বস্তুতঃ, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রভৃতির পর বাংলা দেশের উল্লেখযোগ্য লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই ওই জাতীয় রচনার রেওয়াজ পুরামাত্রায় বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই কীর্ত্তি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই ; জাতীয়তা-উদ্বোধক কয়েকটি গানের জন্যই তিনি আজও পর্য্যন্ত আমাদের স্মরণীয় হইয়া আছেন। জাতীয় মেলা বা হিন্দুমেলাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য যে কয় জন দেশপ্রাণ বাঙালী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের একজন। তাঁহার বহু বক্তৃতা ও গানে সে-যুগের বাঙালী উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। ক্ষীণ দুর্ব্বল বাঙালীজাতিকে স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া উন্নত করিবার জন্যও তিনি কম প্রয়াস করেন নাই। "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" গান এক সময় বাঙালীমাত্রকেই স্বদেশী পণ্যের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মনোমোহন বসুর সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় দিবার জন্য আমরা এখানে তাঁহার প্রায় সর্ব্ববিধ রচনা হইতেই কিছু কিছু নিদর্শন তুলিয়া দিলাম এবং তাঁহার দুইটি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিলাম।

ঈশ্বর-বিষয়ক

(তরুণ বয়সে ভ্রমণকালে রচিত)

আমি যথা তথা যাই, বিভু, তব গুণ গাই।
দেখিয়ে তোমার* ভব, নয়ন জুড়াই॥
কি স্বদেশে কি সুদূরে, এক স্থানে কিম্বা ঘুরে
নিরখি যা তব পুরে, বিচিত্র সব তাই! ১॥

---

* স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ভিন্ন এই প্রকারের যত শব্দ (....................) অজন্ত উচ্চারণে গাইতে ও পড়িতে হইবে।

ভীষণ ভূধর রাজ্য, ভীষণ জলধি কার্য্য,
তবু তায়, হেরি আশ্চর্য্য, মাধুর্য্য সদাই ॥
তরুহীন্ মরু ভীষণ, তরুময় বন তেমন,
চারু ভাব, তবু কেমন, সে ভীষণে পাই ॥
নদ নদী হ্রদ দরী, একতানে প্রাণ ভরি,
তব মহিমা মাধুরী, গাইছে সবাই। ৪ ॥
বিহঙ্গ পতঙ্গ গান, সর্ব্বত্র সুধা সমান,
জুড়াতে পথিকপ্রাণ, তুল্য তার নাই। ৫ ॥
এ বিভব, বভধব! মানব তরে কি সব?
ভাবিয়া এ দয়া তব, আপনা হারাই। ৬ ॥
ঐই ক'রো ভব ঘুরে, নাহি হই ভব-ঘুরে,
নিত্য-চিন্তামণি-পুরে, যেতে যেন পাই। ৭ ॥

হাফ্-আখ্ড়াই

মহড়া।

ও মা কালিকে, শ্যাম্কে রথে দেখে, প্রাণে মরে রাই বিষাদে।
আম্‌রা শরণ্যে শ্রীপদে, রাখ মা বিপদে, মা গো! হ'য়ে বরদে!
ব্রজে বিমল কালশশী, উজ্জল দিবা নিশি,
অন্ধকার্ হবে গো তার্ বিচ্ছেদে।

তেহারান।

ঐ চলে কৃষ্ণধন মথুরায়, কি হবে?

চিতেন।

বিমানে হেরিয়া হরি, ব্রজসুন্দরী গোপী সব;
চলে অধীরে, কাত্যায়নীর্ শ্রীমন্দিরে, করে কাতরে হাহা রব!

(ফুকা)

শিরোমণি-হারা, যেন ভুজঙ্গিনী। নিরাশায়্ হায়, আকুল প্রাণি ॥
বহে নয়নে অশ্রুজল্, লুণ্ঠিতা ধরাতল্, ঐ গো,
যেন ভূতলে প'ড়ে স্থিরা দামিনী!

(ডবল ফুকা)

ভক্তিভাবে পদ-কমলে, সকলে ;—
গদ গদ স্তুতিবাণী, রক্ষা কর ভবরাণী, মা গো,
প্রাণের্ হরি, অক্রূর্ মুনি, হ'রে ল'য়ে চলে ॥

(মেল্‌তা)

দে মা দে কৃষ্ণধন্ আ'জ্ ভিক্ষা দে!

সখীসম্বাদ

মহড়া।

রাধা ব'লে অই, বাঁশী বাজে গো সই, কিসে ধৈর্য্য হই, এখন্ আর্?
শ্যামসুন্দর মাধবে, বসন্ত উৎসবে, সই রে! তুষিব সবে!
গাঁথি চিকণ বনমালা, সাজাব চিকণ্ কালা,
পূরাব মনোসাধ্ আ'জ্ সদাকার্!

তেহারান।

ঐ বাজে মোহন্ বাঁশী বিপিনে, চল্ গো সই!

চিতেন।

সরস বসন্ত ঋতু, উদয় হইল গোকুলে।
মন্দ মলয় সমীরণে, বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ-প্রেমাকুল্ সকলে ॥

(ফুকা)

যত তরুলতা, শোভে নব দলে।
আকুল্ হয়্ প্রাণ্, রসাল্ মুকুলে॥
কিবা কুহরে পীকবর্, সিহরে কলেবর্,
সই রে! অলি নিরন্তর্, গুঞ্জরে ফুলে ফুলে!

(ডবল ফুকা)

কি বিলম শশী গগনে; সখি রে, দেখ গগনে।
বিগলিত সুধারাশি, মরি কি সুখের নিশি, সই রে!
হেরিতে শ্যাম্ কালশশী, চল কুঞ্জবনে॥

(মেল্তা)

এ সময় গৃহে কি রয়্ মন্ আমার্?

বসন্তের সুরে সখীসম্বাদ

মহড়া।

নবীন্ সন্ন্যাসী কেন হে সাজিলে?
হ'য়ে বিবাগী, কোথায় হরি চলিলে?
হায়্, নয়ন-রঞ্জন, দলিত অঞ্জন, সে কাল বরণ নাই;
কেন্ন বিভূতি মাখিয়ে, শ্রীঅঙ্গ ঢাকিয়ে,
সজল জলদরূপ্ লুকালে?

(খা'দ্)

ত্যেজি পীতাম্বর্, পীতাম্বর্! কেন বাঘাম্বর্, পরিলে?

(ফুকা)

ডিমি ডিমি স্বরে, করে ডম্বুর্ আ'জ্ বাজিছে ;
সদা ঢুলু ঢুলু আঁখি ঢুলিছে ; ব্রজনাথ্ হে ;
কিবা জটিল জটাধর্, সেজেছে নটবর্,
যেন নিজে হর্, ব্রজে উদয়্ হ'য়েছে !

(ডবল ফুকা)

বদনে ববম্বম্ রব্, শুনি অবিশ্রাম্—ত্যেজে রাধার্ নাম্ !
মোহন্ বনমালা ফেলে, রুদ্রাক্ষহার্ দোলে গলে,
শ্যাম্ হে, ধুতুরা আর্ বিল্বদলে, শোভা অনুপম্ !

(মেল্‌তা)

গোকুলে এ কি রূপ্ আ'জ্ দেখালে !

তেহারান।

এ বেশে, এ বয়সে, কোথায়্ যাও বল না ?

চিতেন।

কমলবদন কেন, দেখি মলিন্ আ'জ্ ব্রজরাজ্ ?
ব্রজের্ মোহন্ বেশ্ ত্যজ্য করি, বংশীধারি, কেন ধ'রেছ নূতন্ সাজ্ ?

(ফুকা)

কেন যেতে যেতে, অমন্ ক'রে হে, ফিরে চাও ?
ও কেউ দেখ্‌বে ব'লে, যেন শঙ্কা পাও ! ব্রজনাথ্ হে,
নাহি চন্দ্রাস্যে সুহাস্য, ভাব্ যেন ঔদাস্য, এ কি রহস্য, এ দাসীরে বলে যাও

(ডবল ফুকা)

মধুর অধরে নাই মধুর বাঁশরী, কেন মুরারি ?
চরণে নাই নূপুর বেড়া, কটিতে নাই পীতধড়া,
শ্যাম্ হে, শিরে শিখিপুচ্ছচূড়া, নাহি হেরি হরি !

(মেল্‌তা)

রাখাল্‌রাজ্ রাখাল্‌সাজ্ কি ত্যেজিলে ?

আসরী খেস্‌সা খেঁউড়

মহড়া।

কি যুগল্ মূর্ত্তি ! ভেলা কীর্ত্তি সহরে দেখাও !
চুণোগলির্ সাহেব্ বিবী, যেমন্ দেবা তেম্‌নি দেবী,
রকম্ বেশ, কিন্তু শেষ্, থা'ক্‌লে হয়্—ওঁরস্ ভাগ্‌নে হ'বে
পাছে লজ্জা পাও !

চিতেন।

পাড়াগেঁয়ে জংলি আমায়্ হায়, কও কথায়্ ক ... !
নিশি দিবা, দাসীর্ এত সেবা, সকল ভেসে ... !

(ফুকা)

অসভ্য ব'লে, ত্যেজিলে, আর আমায়্ নাহি চাও !
ঠাকুরঝিরে, নিয়ে গাড়ী ক'রে, তাই বেড়াতে যাও !
কোমর ঘেরা ঘাগ্‌রা পরায়ে, আয়ার সাজ্ সাজায়ে,

(মেল্‌তা)

তারে হোটেল ঘরে নিয়ে খানা খাও !

দ্বিতীয় সখীসম্বাদ

মহড়া।

বিনয় করি শ্যাম্, গৃহে ফিরে যাও।
ব্রজরাজ, পাবে লাজ,
এক্‌বার্ ভাংতে গে রাধার্ মান্, ভেঙেছ আপ্‌নার্ মান্;
আবার্ কি সেই হত-মান্ হ'তে চাও?
যেও না আমার্ মাথা খাও।
আহা মরি! আর হরি, কেঁদো না!
থাক দুদিন্ স'য়ে, যাবে সেধে নিয়ে, রাগের্ মাথায় গিয়ে,
এখন্ সেধো না!
বঁধু, এক্‌বার্ তো গিয়েছ, পায় ধ'রে সেধেছ,
বারেবার্ পদাঘাত আর্ কেন খাও?

চিতেন।

চতুরালি বনমালি খা'ট্‌বে না এবার্!
রাধা জেনেছে কপট প্রেম্ যেমন্ হে তোমার্!
ভেবেছ কি, ছাই মেখে ভুলাবে?
তোমার্ বাঁকা নয়ন্, বাঁকা ভঙ্গী চরণ, ভৃগু-চিহ্ন ধার[illegible], কিসে লুকাবে?
হেরে তোমারে সমক্ষে, চিন্‌বে রাই কটাক্ষে,
পরীক্ষে ক'রে কেন লোক্ হাসাও?

ওস্তাদি সুরে খেস্‌সা

মহড়া।

সাঁচ্চা কুলীনের্ বাচ্ছা, আচ্ছা মান্ রাখ্‌লে তাই কুলের!
ছিল, বাকী যেটুক্, হ'লো সেটুক, দেশে দশে পেলে টের!

হায়্ হায়্, সূর্য্যের্ গায় ছেপ ফেল্‌তে, এদের নিজের [illegible]ই প'ড়লো ফের!
পরের যাত্রা ভাংতে বাছা, আপনার্ নাক্ করেছেন বোঁচা!
কেঁচোর্ চার্ খুঁড়তে গিয়ে, বেরুলো সাপ ফুঁফিয়ে,
তার বিষে ছট্‌ফটিয়ে, ভার্ এখন বাঁচা!
এখন্ কল্‌সী দড়ি আঘাটা বৈ, উপায় আর্ দেখিনে এর!

চিতেন।

সে দিন্ এজ্‌লাসে বেহায়া-চন্দ্র, আর্জ্জি দিয়েছে;—
তাদের্ অন্দরে আসামী ঢুকে, ঘরের বে-আবরু ক'রেছে!
এক্তারের্ লোক্ কলঙ্ক, নালিসের মোক্তার্ হ'য়েছে!
ওঁছারাম্ ছোঁচা পাজি, তুচ্ছদাস্ ধিক্ বাবাজী,
এরা সব সাজন্ সাজি, সাক্ষ্য দিয়েছে!
হ'লো দাদীর সঙ্গে বাদীর হাজত্, হুকুম্ জারী হুজুরের্!

অন্তরা।

এই সব চুলোচুলি, ঠুলোঠুলি, ঢলাঢলি গাঁয়;
কেবল দলাদলি এর গোড়ায়, আছে হায়, দুই পাড়ায়।
কিন্তু কুলের দলেই ফুলের ভাগ বেশী!
মেতে যায় যেন ঠিক্ ভূতে পায়, জ্ঞান্ হারায়, গার্ জ্বালায়!

পর-চিতেন।

কুলীন্ চোম্‌রা এঁড়ে, মৌলিক্ বেঁড়ে, দু দল্ দু পাড়ায়!
এড়ে, ল্যাজের্ গ্যাদায় হুম্‌রে বেড়ায়, তেড়ে তাই বেঁড়ের পাড়ায়্ যায়্!
বারোয়ারি উপলক্ষ, রণ্-দক্ষ দু-পক্ষই সমান্!
ওর্ মধ্যে কিছু নরম্, বেঁড়েরা সভ্য রকম্,

এঁড়েদের্ মেজাজ্ গরম্, শরম্ তো নির্ব্বাণ্ !
বেঁড়ে, যেমন্ ঠাণ্ডা, লুচি মণ্ডা, পূজায়্ তেম্নি জোগায়্ ঢের্ !

পর-অন্তরা।

এঁড়ের পূজোর্ ঘটা, ভেড়া পাঁটা, মহিষ্ কাটা শেষ্ !
তখন্ বীর-মাতুনি ঘোর্ আবেশ্, অসুর্ বেশ্ কাঁপায়্ দেশ্ !
(তায় আবার) হয়্, সুধা-চক্কর্ টক্কর্ দিয়ে বেস্ !
পাড়ায়, সবাই ভোলা বোম্-মহেশ ! কেউ নিরেস্, নয়্ বিশেষ্।

পর-পর চিতেন।

দেখে, চণ্ড-মুণ্ড-নাশিনী মার্ মুণ্ড ঘুরে যায়্ !
মায়ের্ মুখখানি গ'ড়েছে তেম্নি, মা যেন কাঁ'দ্ছেন্ ঐ জ্বালায় !
ভাসানেতে সং বেরুলো, তাও হ'লো তেম্নি জবড়্জং !
মরি কি রঙের সং, বিলাতী নাচের ঢং,
না'চলো না সাহেব্ বিবি, ছিঁড়ে পড়্লো টং।
তাতে দুয়ো খেয়ে, ক্ষেপে গিয়ে, ভাংলে গে সং বেঁড়েদের্ !

দ্বিতীয় রথের গান (১২৬৮)

(তেওট—মহড়া)

নব নীরদবরণ হরি—দেখ রথোপরি, ওগো কিশোরি !
রূপে মন্মথ-মনোলোভা, আ মরি, হেরি কি শোভা,
কিবা, ত্রিভঙ্গ শ্যাম-অঙ্গ-মাধুরী !
ব্রজে উদয় আ'জ কালাচাঁদ্, পূরিল মনোসাধ্, জুড়াবে হেরে
নয়ন্ চকোরী !

(ঐ—খাদ)

পুলকিত, আ'জ সব, দরশন্ করি শ্রীহরি !

(ধামাল—ফুকা)

গুঞ্জরবে অলি গুঞ্জে কুঞ্জ কাননে।

প্রেমাকুল্, যত বিহঙ্গকুল্, রাই গো, সুখে কুহু রব্ করিছে পিকগণে !

(তেওট—ঐ)

যাই চল কুঞ্জবন্ ; আ'স্‌বেন্ কুঞ্জে আ'জ বং[illegible] !

উঠ রাধে, আর্ কেন গো বিষাদে ; মনোসাধে, কা[illegible]দে ল'য়ে

জুড়াব জীবন্ !

(ছুটকিলে—ঐ)

যতনে সাজাব, সেই নিকুঞ্জ কানন্। তোমায়্ তে[illegible] ক'রে শ্যামের্

বামে বসাব !

ও সেই মধুর্ কুঞ্জে, বন-ফুল তুলিয়ে ; মনোমত চারু হার [illegible]থিয়ে ;

রাধা শ্যামের্ যুগল্ অঙ্গে পরাব !

প্রেমময়ি ! যুগল রূপ নয়নে সবে দেখিব—রাধা শ্যাম্ নয়[illegible]ন

স[illegible] হেরিব !

(তেওট—মেল্‌তা)

সেই নিকুঞ্জ রাসস্থলে, যতেক গোপীমণ্ডলে,

ল'য়ে ত্রিভঙ্গে দাঁড়াবে ভঙ্গী করি !

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—প্রার্থনা

(মহড়া)

ভকত-রঞ্জন্, বিপদ-ভঞ্জন্, ওহে জনার্দ্দন্ !

আমি ভক্তিহীন, অকিঞ্চন, পূরাও দীনের্ আকিঞ্চন্ !

(ফুকা)

শুনেছি হে শ্রীমাধব, দীননাথ নাম তব, দীন ক্ষুদ্র পুণ্য-শূন্য
আমি অভাজন্ ;
নিজ গুণে কৃপানিধি, কৃপাদান কর যদি, তরি তবে ভব-নদী
ধরি শ্রীচরণ্ !
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, এই বাঞ্ছা করি আমি, চিত-গামী হ'য়ে
কর ধন্য এ জীবন্ !
বপু মম—ব্রজ সম, হৃদয়—নিকুঞ্জধাম, প্রীতি-পুষ্পে মনোরম
করিব সাজন্ !
মতি, গতি, রতি—বেল্, যুথী জাতি ; মল্লিকা, মালতী—
শ্রদ্ধা, ভকতি ;
হবে চিত-অনুরাগ্—কাঞ্চন-পরাগ্ ; বৈরাগ্য—কদম্ব বিকশিবে তথি !
প্রেম—পিক কুহু রবে, কিবা কুহরিবে !
শান্তি, শম—সারী, শুক, কি সুখ অর্পিবে !
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, সে কুঞ্জধামে ; কিশোরী লইয়ে বামে, দাঁড়াইবে হে !
হবে, কিবা শোভা, মনোলোভা, হৃদে সে নব মাধুরী !
যেন, নব-নীল-নীরধরে, সৌদামিনী—রাই কিশোরী !
আমার মনঃ মত্ত শিখী নৃত্য করিবে সে রূপ হেরি !

(মেল্‌তা)

ও সেই যুগল্ সাজে, হৃদয় মাঝে, উদয় হ'য়ে, জুড়াও জীবন !

রাগিণী কেদারা, তাল ঢিমা তেতালা

প্রণয়-বারিধি-মাঝে সুখ-নিধি যদি চাহ ;
এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ !

একান্তে যে একে মজে, কভু না দ্বিতীয় ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে, বিরাজে সে অহরহ ! ১ ।
নতুবা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে,
বিরাগ তার ঘটে সোহাগে, যাতনা সহে দুঃসহ ! ২ ।

—পরীক্ষা নাটক ।

রাগিণী টড়ী, তাল ঢিমা তেতালা

জয় হর শশিশেখর !
জয় যোগীশ্বর, ত্রিপুর-তনু-হর, সর্ব্বগুণাকর, স্বয়ম্ভু শঙ্কর !
ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন সুবেশকারী, বৃষেশ-বাহন পিনাকধারী,
পিশাচ-মণ্ডিত শ্মশানচারী, ভূতি-বিভূষিত সতীশ সুন্দর ! ১ ।
ব্যোমকেশ শিরে পাবন বারি, কৈলাস-কানন-শৈল-বিহারী,
তুমি আশুতোষ কলুষ-হারী, তুমি বারাণসি-সরসি-ভাস্কর ! ২ ।

—সতী নাটক ।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা

সখি, প্রেম্ যে জেনেছে ; পেয়েছে সুখ্, ভুগেছে দুখ্,
স্বর্গে রসাতলে গেছে !
প্রণয় পবিত্র নিধি, অমৃতে গড়েছে বিধি,
বিরহ-বিপত্তি যদি না থাকিত পাছে পাছে ! ১ ।
যতনে পায় রতনে, প্রেম জন্মে অযতনে,
কিন্তু যতনে এ ধনে, রাখে বা কার সাধ্য আছে ? ২ ।
কীট্ জন্মে মধুর ফলে ; মধুর প্রেমে যারা গলে,
অগ্নি যেন তলে তলে, বিচ্ছেদ্ কীট্ সঙ্গ নিয়েছে ! ৩ ।

—হরিশ্চন্দ্র গীতাভিনয় ।

রাগিণী টড়ী, তাল বাঁকী।

রণ-সাজে পদ্মিনী দল চলে রে!
ভ্রুকুটী-নয়না—মার মার, মার মার, রবে কি ভীষণ-বদনা!
পদভরে কম্পিতা ধরা টলে রে!
প্রচণ্ডা প্রায়; সমর-উন্মাদিনী, অসিচর্ম্ম-ধারিণী—
ভয়ঙ্কর শেল শূল ধনুঃশর রে, শোভে করতলে, রে! ১।
সুন্দরী সব; মাতঙ্গ-বিহারিণী—মেঘে যেন দামিনী;
অশ্ব-পিঠে লক্ষ শশী পশি যেন রে—খেলে রণস্থলে রে! ২।

—পার্থপরাজয় নাটক।

রাগিণী সিন্ধু, তাল একতালা

মা! কাতরে তার তারিণি!
দুর্গতিহরা, ত্রাহি মে তারা, পরাৎপরা, ভক্ত-ভয়-হারিণি!
ত্রিদেব-শরণ্য, ত্রিলোক-বরেণ্য; তব পদে দাসী শরণাপন্ন;
অনন্যগতি মা অতি বিপন্ন; প্রসন্ন হও জননি! ১।
সতী-দেহ পতি জন্য পরিহরি, সতী-ধর্ম্ম প্রচারিলে মর্ত্ত্যপুরী,
সতী স্ত্রীর মর্ম্ম তো জান সতীশ্বরী—যে দুখে দহে প্রাণি—
পিতা পুত্রে দ্বন্দ্ব করিয়ে শ্রবণ, হুতাশে শোষণ হ'তেছে জীবন,
অকূল পাথারে কর মা তারণ, দিয়ে চরণ-তরণী! ২।

—ঐ নাটক।

রাগিণী মোল্লার, তাল ঢিমা তেতালা

সই! ঐ বুঝি শ্যাম্ আমার্ গগনে!
ভর্ করি পবনে, আসিছে বিমানে—দুখিনীরে এত দিনে, বুঝি
প'ড়েছে মনে!

সাধের এ নবঘন, চিকণ কালিয়ে ;
হেলিয়ে, দুলিয়ে, আসিছে এখানে ! ১ ।
চকিত, স্তম্ভিত— যেন লা[illegible]সে মনে !
চরণে বিক্রীতা জনে, লাজ কি কা[illegible] ? ২ ।
এ কি এ কি দেখি গো সই, কৈ কাছে এলো কৈ ?
স'রে স'রে যায় যে ঐ, বধিয়ে জীবনে ! ৩ ।
কেন কেন হেন হ'লো— চলি গেল কি মনে ?
তৃষিতা চাতকী রাধায়, না তুষে প্রেম্‌-জীবনে ? ৪ ।
—পাঁচালী ।

রাগিণী বাহার, তাল ঢিমা তেতালা

সই ! যে জ্বালা সৈ, হায়্‌ ! তা কারে কই ?
প্রেম্‌ তো ঘুচে গেছে, মুখের্‌ আলাপ মিছে আছে—
ঘর্‌ করা সার্‌ গোচে গাচে—জ্যান্তে মরা হ'য়ে রই ! ১ ।
রমণীর্‌ বল্‌ অভিমান, সে বল্‌ রাখবার্‌ নাহি স্থান্‌,
যে সা'ধবে যে রা'খবে সে মান্‌, সে তো সদা হতজ্ঞান্‌—
কুসঙ্গে রয়্‌ কুরঙ্গে, মদের্‌ হ্রদে ঢেলে প্রাণ্‌ !
সেই বিষে সব জ্ব'লে গেল, সর্ব্বনেশে বুঝলে কৈ ? ২ ।
বিয়ের বেলা কি উল্লাস— বর ক'রেছে বি, এ, পাস্‌ !
বাগবাগিচে বেচে বাবা, দান্‌ দিলেন্‌ তাই পূরিয়ে আশ্‌ !
কে জানে, সেই গুণধর্‌ সা'জ্‌বে বাঁদর্‌—সুরাদাস্‌ !
আশার্‌ গাছে তুলে পিছে কেড়ে নিলে সুখের্‌ মৈ ! ৩ ।
—পাঁচালী ।

ছড়া

"চাতকী পাতকী" আর "বিশ্বাস-ঘাতকী" !

ও মা ! ওমা ! সে আবার কি ?—ছি ছি অমন কথা বলিস্‌নে সখি !
প্রাণের জ্বালা এতই বা কি ?—হ'লো জ্বালা, তাতেই বা কি ?
ওলো সখি, তোর্ বা কি ?—আমার্ যা, তার্ নয়্ তো সিকি !
ভেবে একবার দেখ্ দেখি—আমার ঘরে কাণ্ডটা কি ?—
বা'র ভড়ঙে থাকি, কিন্তু আসলে ফাকি ।
বারমেসে দুঃখ তোমার, শুনালে যতেক ;
আমার বারমেসে তেম্‌নি, শোন্ লো তবে প্রাণ্ সজনি—
পরের শুন্‌লে আপ্‌নার জ্বালা জুড়াবে অনেক !
তোমার আছেন অদর্শন ; আমি পাই দরশন ;
এইটি তফাত বটে, কিন্তু বেশী পোড়ানি তায়—
হরির চক্র সুদর্শন, ছুঁতে মাছি কাটে যেমন, বিপদ বড় তাঁর দর্শন,
প্রাণ-বায়ুটী আকর্ষণ, হয় কথায় কথায় !
সে দর্শনের মুখে ছাই !—স্পর্শনের তো কথাই নাই—
সে পক্ষে প্রায় বালাই চুকে গেছে !
বাড়ার ভাগ কদাচারে, বার মাসই নয়ন ঝুরে,
সেই বারমেসে দুঃখ কিছু কই তোমার কাছে ;—
বৈশাখে বসন্ত পেয়ে সবার সুখের তত্ত্ব ;
ফুটে কলি, জুটে অলি, মধুপানে মত্ত !
আমার বঁধু, পিপের মধু, পীয়ে আসেন মেতে !
(দেখে) লোকে হাসে, আমি কিন্তু কাঁদি দিনে রেতে ! ১ ।
জ্যৈষ্ঠ মাসে আঁব কাঁঠাল সকল ঘরে ঘরে ;
খায় ফেলে বিলোয় লোকে তত্ত্ব তাবাস করে ।

আমার ঘরে কে আ'ন্‌বে ভাই ? যদি বা তত্ত্বে আসে ;
চাটের জন্যে বাইরে নে যায়, ব্যায়রা সর্ব্বনেশে !
তিন শো টাকা মাইনে পায়, ভূতে উড়োয় [illegible]—
মাইরি দিদি ঘরে কেবল নেই [illegible] নেই রব ! ২ ।

আষাঢ়েতে পর্ব্ব ভারি—রথে জগন্নাথ ;
আমার প্রভু পথে হয় তো থাকেন চিৎপাত !
মট্ কদ্‌মা মেঠাই মণ্ডার সাধ্ তো গেছে ঘুচে ;
এমন জন কেউ নাইকো দিদি, ফুট্ কড়াই দে পুছে ! ৩ ।

যত পড়ে শ্রাবণের ধারা, ততই তাঁর বাড়ে কুধারা—
নয়ন-ধারা বেগে আমার বয় ;
বর্ষাকালে বাতের ভয়ে, বেশী মদ খেয়ে খেয়ে,
শুতে এসে মাথা গরম—হয় তো বমি হয় ! ৪ ।

ভাদ্র মাসে জলের তরঙ্গ থৈ থৈ ;
নেশার তরঙ্গে বঁধু— সঙ্গে ইয়ার, বারবধূ—
সহরে ঘুরে বেড়ান স্বধু, ক'রে হৈ হৈ !
লক্ষ্মী-পূজো আধা মাসে, লক্ষ্মী-ছাড়া কাণ্ড বাসে,
দেখে দেবী ঊর্দ্ধশ্বাসে, ত্রাসে ফিরে যান ;
দূরে থেকে কোপনয়নে কুদৃষ্টিতে চান !
তারি ফল সই হাতে হাতে, সকল থাক্তে এই হাবাতে
দশা ভুগতে দশের কাছে হয়—
সংক্রান্তিতে কত জাঁকে, অরন্ধন ভোজ করে লোকে,
আমার হয় তো কর্ম্মের পাকে, অরন্ধন না কল্লেই সে দিন নয় ! ৫ ।

আশ্বিনে পূজোর ধুমে বাবুর বেশী ফুর্ত্তি ;
(হয়) আল্‌পাকা সাটীনে কত চায়নাকোট কুর্ত্তি !
টিকিট মারা জুতো ; আর বাক্স ভরা মদ্ ;
(এনে) পোমেটম্ আর অডিকলম্ ভাবে গদ গদ্ !

ন-পোয়া বছরের আসে নয়ানসুক এক থান—
মাঠকুরুণকে দুখান ঠেঁটি, ঝিকে দেয় একখান ;
বাকি থান ম্যাজেণ্টা দিয়ে ছুপিয়ে ব্যায়রা লয় ;
ছেঁড়া চাপকান্ কুটির্ টুপি, বখ্‌শীস্ তারে হয় !

ননদ ছুঁড়ির সাড়ী একখান কিন্তেও ভুল হয় না ;
আমার বেলাই হরেক রকম উঠে নূতন বায়না !
বারাণসী তো মহাদোষী ; ঢাকাই মনে লয় না ;
গাউন দিতে রাজি, কিন্তু অভাগীর তা সয় না !
মেজাজ বুঝে, ঘেঁসে ঘুঁসে, কাছে একবার যাই ;
গিয়ে বলি "র্ষাঁড়্‌কে দেও গে—আমার ও কাজ নাই !"

এম্নি করেই ঘর করি সই, নিত্যই নূতন সৈ
তুমি হ'লে ম'রে যেতে—আমি যাই তাই ?ই !

পূজো আচ্ছা নেম্‌নিমেসা, সকল হ'লো রদ্ ;
রাত দিন্ কেবল রব শুনি "দে মদ, দে মদ !"

বাঁকা তেড়ি ; বাঁকা ছড়ি ; পায় বাঁকা বুট ;
বাঁকা মেজাজ ; বাঁকা মুখে কথা ড্যাম হুট্ ;
ওয়াচ গার্ড গলায় ঝোলে, ট্যাঁকে ওয়াচ ঘড়ি ;
জোটে না বাবুদের কেবল দড়ি কল্‌সীর কড়ি ! ৬।

কার্ত্তিক অগ্রাণ নূতন হিমে, নেশা আর ঘুম!
রাত পোয়ালেই প'ড়ে যায়—খোঁয়ারি ভাঙার ধুম!
পৈতৃক এক পুরাণো শাল, থেঁতলে থেঁতলে চিরকাল,
হ'য়ে গেছে খুব বেহাল—জীর্ণ জরা কাবু;
কার্ত্তিক পূজোর দিন হ'তে, গুচিয়ে তারে কোন মতে,
গায় দিয়ে কার্ত্তিক সাজেন বাবু!
হয় তো গেলেন সন্ধ্যা বেলা, সকাল বেলা তা ফালা ফালা,
রিপু ক'র্ত্তেই দর্জির পো খায় হাবুডুবু! ৭। ৮।
পৌষ মাসে হৌস থেকে নগদ মাল আসে—
বড় দিন আর ছোট দিনের ছুটি ছুটাবার আসে!
বাইরে ঝোলে গ্যাঁদার মালা, ঘরের ভেতর র‍্যাঁদার জ্বালা,
বৈঠকখানায় টেবিল কোলে ডেবিল দল বসে;
হোটেল থেকে আসে খানা, খ'টেল ইয়ার জোটে নানা,
কিন্তু "গোটুহেল" ভাষে, যদি উঠ্‌নোর মুদী আসে!
ঘরে নাস্তি কড়াক্রান্তি, কিসে কাটে পিটে-সংক্রান্তি?
ব'ল্লেই বলে "নেই মানস্তি—ফাই ফাই" ক'রে ধমকে উঠে সই;
বলে "ছোট লোকের পরব ওটা—ওতে আমি নই"! ৯।
মাঘ মাসে লাগ পাইনে—নানা কারখানা—
রাঁড়ে ভাঁড়ে বাগানে ইংরেজী-তর খানা!
প্রতি ইয়ার বাগান দেন প্রতি শনিবার!
প্রতি হপ্তা প্রতি বাবুর্ বাড়ে শুঁড়ির ধার!
শ্রীপঞ্চমী!—আমার পক্ষে বিশ্রী দেবী তিনি;—
দুষ্ট সরস্বতীরূপে, বার মাস তার ঘাড়ে চেপে,
দুখিনীরে নাথ থাক্‌তেও ক'চ্ছেন অনাথিনী।

নাথ নাকি নাথের বাগানে—প্রধান আড্ডার স্থান যেখানে—
সরস্বতী পূজো এনে, করেন মহা জ াঁক ;
নিমন্ত্রণ হয় অঙ্গ বঙ্গ, তথায় নাকি করেন রঙ্গ—
দেশহিতৈষী ব'লে যাঁদের নামে বাজে শাঁক। ১০।
ফাল্গুন মাসে অন্যের বাড়ী রাধাকৃষ্ণের দোল।
মদের ধারে বাবুর বাড়ী শুঁড়ির গণ্ডগোল!
সমবয়সী সব রূপসী সুখে খেলে ফাক।
শাশুড়ী বৌ আমরা দেখি, চা'লের জালা ফাক! ১১।
চৈত্র মাসে শুঁড়ির ধার খুব শানিয়ে ওঠে—
সেই শ্রাদ্ধ গড়ায় গিয়ে ছোট আদালত কোর্টে!
শমন গেল, ওয়ারিন এলো, সীল প'ড়্‌লো কপাটে—
গা-ঢাকা অন্দরে বাবু—হায়! তবু ফ্রেণ্ড জোটে!
আফিসের যে জমাদার, তার কাছেও হ'য়েছে ধার, সেও নিত্যই হাঁটে!
শেষে, চাক্‌রি গেল, খবর্ এলো, তবু কাক ছোটে!
তবু মারেন রাজা উজীর—দম্ভে মাটি ফাটে!
কার্ সাধ্য নিকটে যায়, ইংরেজি বোলের চোটে! ১২।
ঐ বারমেসে কথা সাঙ্গ না হ'তে অমনি,
খুঁড়ী ঝি এক ছুটে এলো—হাস্য-বদনখানি ;
বলে "বথ্‌সিস্—বথ্‌সিস্—বথ্‌সিস্ চাই—ঐ গলার ঐ হার!
বাড়ী এসেছেন বড় বাবু—(হবেন্) 'গলার হার' তোমার!!
মাইরি, বউ-দি! গাড়ী দেখ্‌লেম ফটকের কাছে—
উঁকি মেরে দেখে মুখ্‌টি, ছুটে এলেম ফুলিয়ে বুক্‌টী,
আগে খবর দেওয়ার সুখ্‌টী, আর কেউ পায় পাছে!"

আগমনী

রাগিণী বাগেশ্রী, তাল আড়াঠেকা

কে এলো অচল-পুরে ?
দেখরে, নয়ন্ জুড়ালো হেরে, দশ ভুজে দশ দিগ্ উজ্জ্বল ক'রে !
বিজলি চমক সম, রূপের্ ছটা ছুটে !
স্বর্ণাতসী-বর্ণা দেবী, অঙ্গ হ'তে জ্যোতি উঠে ! ঝলমল
তাহে অলঙ্কারে ! ১ ।

তরুণ অরুণ নিভা, চরণ-কিরণ কিবা,
তায়্ কি শোভা রক্তজবা, রত্ন নূপুরে !
বিবুধ-রিপু-সংহারে, দশায়ুধ করে ;
সব্য পদ সিংহোপরে, বাম পদ মৈষাসুরে—কোকনদ
যেন নীল নীরে ! ২ ।

দুই ভিতে সুতা সুত— ভিন্ন রূপ গুণযুত—
জ্যেষ্ঠা কন্যা বামে স্থিত, মুকুট শিরে ;
পদ্মভরে ; পদ্ম করে ; পদ্ম বর্ণ ধরে ;
বামে হেলা ; চঞ্চলা প্রায়্ চঞ্চলা জ্ঞান্ হয়্ গো তারে ;
মৃদু হাসি, কিবা বিম্বাধরে ! ৩ ।

দক্ষিণে অন্য নন্দিনী, ধীরা স্থিরা সুবয়ানী ;
মণিময়্ চূড়া-ধারিণী ; বীণা-বাদিনী ;
শ্বেতাব্জ-দল-বাসিনী ; শ্বেতাব্জবরণী ;
মূর্চ্ছনা রাগ রাগিণী, সঙ্গীত, কবিত্ব বাণী, মূর্ত্তি ধ'রে,
সেবা করে তারে ! ৪ ।

কি প্রচণ্ড শ্বেত শুণ্ড,
এক পুত্র গজমুণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড তায় লণ্ড ভণ্ড করিতে পারে ;
লম্বোদর ; কলেবর মণ্ডিত সিন্দূরে ;
শঙ্খ, চক্র, গদাম্বুজ, চতুষ্করে শোভা করে ; একদন্ত ;
বসি মূষা'পরে ! ৫ ।

আর সুত ষড়ানন, সুতরুণ, সুদর্শন ;
সুবসন, সুভূষণ, দেহে শোভন ;
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, শৌর্য্য, একত্রে মিলন ;
কোমল করে, ভীষণ খর শর শরাসন ; সুবাহন—ময়ূরে বিহরে ! ৬ ।

বৈষ্ণব ও বাউল তন্ত্রাদির গান

তাল ঢিমা তেতালা

এসে ভবের্ হাটে, ঘোর্ সঙ্কটে, মারা যাই !
বেচা কেনা, দু চা'র্ আনা, কিছুই আমার্ হ'লো নাই !
বোকা পেয়ে দুষ্ট বেণে, জিনিস্ দিলে সব্ ঠকা'নে,
আসল্ নকল্ নাহি চিনে, ধোকায় প'ড়ে ঠক্‌লেম্ ভাই ! ১ ।
বেচ্‌তে গেলেম্ হ'য়ে ব্যস্ত, তাতেও আরো ক্ষতিগ্রস্ত,
অবশেষে শূন্যহস্ত— রেস্ত-হীন্ ঘুরে বেড়াই ! ২ ।
ছ বেটা গাঁ'ট্‌কাটা জুটে, যা ছিল তা নিলে লুটে,
পুঁজিপাটা নাইকো মোটে—দেশে যাবার (ভবপারে) সম্বল নাই ! ৩ ।
মন্‌মোহনের্ মন্ বুঝে না, দেখে ঠেকেও তো শেখে না,
কুসঙ্গ তবু ছাড়ে না, মায়ার্ বশে (স্ত্রী পুত্রের্ বশে) রয়্ সদাই ! ৪ ।

তাল একতালা

এসে এই ভবের্ মেলায়্ খেলায়্ দিন কাটালি !
এ খেলায়্ মায়ার্ ছলায়্ ভেল্কি লাগায়্, ছি ছি মন,
তার্ ভোগায়্ ভুলে গেলি !
সে তোরে বোকা পেয়ে, ঠকালে ধোকা দিয়ে, রাং দিলে কাঞ্চন্ নিয়ে,
লাভ্ হ'লো তায়্, ছি ছি মন্, লাভ্ হ'লো মনের্ কালী ! ১ ।
না হ'লো বেচা কেনা, সার্ হ'লো আনাগোনা ;
সাধনার্ সাবেক্ দেনা,
তাও মিট্‌লো না ; আবার মন্, হাল্ দেনা বাঁধিয়ে গেলি ! ২ ।
ছিল যা পুঁজিপাটা, লুটলে গাঁ'ট্‌কাটা ছটা, পার্‌ঘাটায়্ ঘট্‌লো ল্যাঠা,
সম্বল্ হারা, ছি ছি মন্, পারাণি-হারা হ'লি ! ৩ ।
এমন্ যে মানব্ জনম্, বুঝ্‌লিনে কি তার্ মরম্
লোভেতে খেলি ধরম্,
লজ্জা শরম্, শেষে মন্ বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হ'লি ! ৪ ।

তাল একতালা

এ সংসার্ মন্ কেবল্ ফক্কিকার্ ! ও তার্ বাইরে ভড়ং ভেতর্ ছার্ ।
যেমন্ মাকাল্ ফলের্ বাইরে রাঙা, ভেতর্ দেখ্‌লেই হয়্
ন্যাকার্ ! (ছি ছি !)
হায়্, তোমার্ তোমার যারাই করে, তোমার্ অসময়ে তারাই সরে,
ভুলে যায়্ আগের্ উপকার্
ও মন্, অন্য কে আর্, মাগ ছেলে তোর্ থা'ক্তে চায়্ না আর্ !
যদি অপার্য্যেতে ছা'ড়্‌তে নারে, তবু করে মুখ্ আঁধার্ ! ১ ।

তুই যাদের তরে অকপটে, ক'রে পার্ রক্ত জল্ মরিস্ খেটে,
এই তো মন্
তাদের ব্যবহার! একটু পান্ থেকে চুণ খ'স্‌লে পরে নিস্তার
রয় না আর!
ছি ছি তাদের মায়ায় ভুলে রৈলি—কাজ হারালি আপনার—
(পাল্‌টা) ভুলে তাদের মায়ায় এ কাল্ সে কাল্ পরকাল্ খা'স্
আপনার! ২।

তোর ভাগ্যফলে যদি মিলে, সতী সাধ্বী নারী সুবোধ ছেলে,
সুধারার্ সকল্ পরিবার! তবু কটা দিন বা তোমার হ'য়ে
থা'ক্‌বে তারা আর?
হবে দুদিন বাদে তফাৎ সরে—সঙ্গে কেউ না যাবে কার! ৩।

হায়, এরাই তো সব কলির যন্ত্র, কেমন লাগায় যে মোহিনী মন্ত্র,
সে তন্ত্র বুঝে উঠা ভার! যত ভোগের লোভের মায়ার বস্তু
ফাঁদ্ কলিরাজার!
সে যে টোপটী ফেলে বসে আছে, স্যায়না হ'স্‌তো খা'স্‌নে চার! ৪।

এই বিষয় আশয় টাকা কড়ি, বাড়ী গাড়ী জুড়ি ঘড়ি ছড়ি,
তোর অধীন
থা'ক্‌বে ক দিন আর? একটী নিশ্বাসেও যে বিশ্বাস্ নাই শেষ
খাবি খাবার!
ও মন, ইরির মধ্যেই ক'রে নে সব, আসল্ কাজ তোর যা কর্ব্বার—
(পাল্‌টা) ইরির মধ্যে ক'রে নিতেই হবে, পার হবার কাজ
যা কর্ব্বার। ৫।

সামাজিক ও রাজনৈতিক গান

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা

দিনের দিন্ সবে দীন হ'য়ে পরাধীন!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা-রাহু মুখে লীন! ১।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন! ২।
তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন! ৩।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার, সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন! ৪।
আ'জ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ?
ধ'র্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—বাকল্, টেনা, ডোর, কপিন ?৫।
ছুঁই স্থতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে; দীয়াশলাই কাঠি, তাও আসে পোতে;
প্রদীপটী জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে;
কিছুতেই লোক্ নয় স্বাধীন! ৬।

রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা

"উন্নতি উন্নতি"—উল্লাস-ভারতী, কেন দিবারাতি বল রে?
কিসের উন্নতি? দেশের দুর্গতি, দেখে শুনে তবু ভোলো রে!

বটে জলে স্থলে, ভারত-মণ্ডলে; যেন মন্ত্রবলে, ধোয়া-যন্ত্র চলে—
একই দিবসে কাশী যাও চলে!—তাই কি উল্লাসে গল রে? ১।
চঞ্চলা-দামিনী—বিমান-চারিণী, তব বার্ত্তা বহে আসিয়া অবনী;
এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী;—তাই কি বিস্ময়ে টল রে? ২।
কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার—এত যন্ত্র দেশে, যন্ত্রী কে বা তার?
স্বত্ব-অধিকার, তাহে কি তোমার? মিছা আশা-দোলে দোল রে! ৩।
নদী-সিন্ধু-নীরে, পোত থরে থরে—গর্ভে গুরু ভার, চলে গর্ব্বভরে!
তা দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে, দেশের দারিদ্র্য গেল রে? ৪।
কিন্তু রে অবোধ! সে পোত কাহার?
স্বত্ব-অধিকার, তাহে কি তোমার?
যাদের বাণিজ্য, তাদের ব্যাপার—ব্যাপারী ধবল-দল রে! ৫।
চিনির বলদ্ তোমরা কেবল্—কেরাণী, মুহুরী, সরকারের দল!
কাকের কি লাভ্, পাকিলে শ্রীফল্?—উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বল রে! ৬।

টপ্পা

রাগিণী মিশ্রভৈরবী, তাল মধ্যমান

আরো কি তোমারে আমি সাধিব ক'রেছ মনে?
মরমে দহিব তবু, প্রকাশিব না বচনে!
না করিব মনান্তর, কিন্তু রব স্বতন্তর—
নয়নে হ'য়ে অন্তর—অন্তরে ও রূপ ধ্যানে! ১।
অন্তর হ'তে করি অন্তর, সাধ্য নাই বিনা দেহান্তর!
তবু রহিতে স্থানান্তর, নিরন্তর শেখাব প্রাণে! ২।

কবি মনোমোহন বসুর সার্থক রচনার যে সকল নিদর্শন উদ্ধৃত হইল, তাহা ব্যতীত আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে মনে করিব তাঁহার 'পদ্যমালা'য় প্রকাশিত কবিতাগুলির জন্য—বাংলাদেশের শিশু ও বালক বালিকা সমাজে এই অপূর্ব্ব কবিতাগুলির জন্য তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন ; এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি একাসন অধিকার করিয়া আছেন। কবির নাম হয়ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কবিতাগুলি আজিও তাহাদের স্মৃতিপথে অমর হইয়া আছে। 'পদ্যমালা'র কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হইল।

নিদ্রাভঙ্গ

রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয় ধন ;
কাক ডাকিতেছে, কর রে শ্রবণ
উঠেছে প্রবোধ, উঠেছে বিপিন,
চারু, চুণী, মতি, উঠেছে নবীন ;
সেজে এসে অই ডাকিছে তোমায় ;
তুমি গেলে তা'রা বেড়াইতে যায়।
লজ্জা দিবে তা'রা বিলম্বে তোমার ;
তাই বলি, যাদু, ঘুমিও না আর।

উঠে, মুখ ধুয়ে, খাবে কিছু খাও,
বেশ-ভূষা ক'রে বেড়াইতে যাও।
বেড়াতে বেড়াতে আলস্য ঘুচিবে,
পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিছে দেখিবে।

সোণার বরণ, সোণার কিরণ,
ছটা তার স্বর্ণ-তারের মতন,
তা' দেখে আনন্দ হইবে তোমার ;
তাই বলি, যাদু, ঘুমিও না আর।

গাছে গাছে পাখী করিতেছে গান,
সে গান শুনিলে জুড়াইবে কাণ।
গাছে গাছে ফুল কতই ফুটিছে,
গন্ধ লয়ে মন্দ বাতাস বহিছে।
পাতার আগায় শিশির ঝুলিছে,
নাকে যেন ঠিক নোলক দুলিছে !
বেলা হ'লে শোভা যা'বে সে সবার ;
তাই বলি, যাদু, ঘুমিও না আর।

পশু পাখী আদি সকলে জাগিল,
নির্জীব জগৎ সজীব হইল।
মৌমাছি উড়িল, পাখী ছাড়ে বাসা,
গরু যায় গোঠে, মাঠে যায় চাষা,
দোকানেতে মুদী ঝাঁপ উঠাইল,
গাছতলা ছেড়ে পথিক চলিল।
সবে ব্যস্ত হ'ল যে কাজেতে যার ;
তাই বলি, যাদু, ঘুমিও না আর।

সুখের প্রভাতে, সবে সুখী হয়,
জন কত দুষ্ট, শুধু তুষ্ট নয়—

বাঘ, পেঁচা, চোর লুকায় এ কালে ;
বাদুড়েরা ঝোলে, তেঁতুলের ডালে।
অলস যে জন, ঘুমেতে কাটায় ;
দেখিতে শুনিতে কিছুই না পায়।
সবে ঘৃণা করে, কুঁড়ে নাম তার,
তাই বলি, যাদু, ঘুমিও না আর।

বুধি গাই—মাতৃস্নেহ

রামেদের বুধী গাই প্রসব হইল,
রাম, শ্যাম দুই ভাই দেখিতে আইল।

রাম বলে, "কি আশ্চর্য্য! দেখ শ্যাম ভাই—
জিভ্ দিয়ে বাছুরের গা চাটিছে গাই।
এখনি জন্মিল, তবু ঘৃণা নাই মনে—
আপনি ধুঁকিছে, তবু চাটে প্রাণপণে!"

শ্যাম বলে, "অই দেখ, মিটি মিটি চায় ;
এখনি বাছুর বুঝি উঠিয়ে দাঁড়ায়।
পারিল না, পারিল না—পেরেছে পেরেছে,
দুবার আছাড় খেয়ে এবার উঠেছে!
হাম্বা হাম্বা রব ক'রে কেমন ডাকিছে!
বাঁটে বাঁটে মুখ দিয়ে কেমন টানিছে!
কি সুন্দর বাছুর হ'য়েছে, দেখ দাদা!
মুখখানি রাঙা রাঙা, আর সব সাদা!

দুধ খেয়ে জোর পেয়ে, লাফ্ মেরে যায় ;
এই বেলা একবার কোলে করি তায়।"

এত বলি যায় শ্যাম বাছুর ধরিতে,
ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ পিছে, পাইল শুনিতে।
ফিরে চেয়ে দেখে, বুধী আসিতেছে তেড়ে—
নীচু মুখ, সোজা মাথা শিঙ্ নেড়ে নেড়ে।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল, শুকাইল মুখ ;
"মা" বলিয়ে কাঁদে শ্যাম, ধড়্ ফড়্ বুক।
মা আসিয়ে কোলে নিয়ে দূরে পলাইল ;
যতনে চ'খের জল, আঁচলে মুছিল।
"ভয় কি ?" বলিয়ে যেই বদন চুম্বিল,
অমনি শ্যামের মুখে হাসি দেখা দিল।

বলে, "মা, আমায় বুধী ভাল তো বাসিত—
কাছে গিয়ে গায়ে হাত বুলাইতে দিত।
শিঙ্ ধ'রে কত খেলা ক'রেছি যখন ;
কিছুই আমারে বুধী বলেনি তখন।
ভালবেসে গেলাম, বাছুর তার নিতে,
আজ কেন এলো বুধী আমারে মারিতে ?"
মা বলে, "জান না বাছা, সন্তানের জন্য,
মা'র প্রাণে যা' করে তা', কে বুঝিবে অন্য !
ও তো পশু, কিছু দিনে ভুলিবে সকল,
যখন বাছুর ওর হইবে সবল—

স্তন-দুগ্ধ ছেড়ে, যবে চরিতে শিখিবে,
এত যে দেখিছ মায়া, কিছু না থাকিবে
মানুষের মা'র প্রাণ সমভাবে রয়—
শিশু ছেলে যুবা হ'লে, তবু ভিন্ন নয়!
কত যে ভাবনা মা'র, কত যে যতন!
কত দুঃখে হয়, বাছা, সন্তান-পালন!
শোয়া, বসা, হাসি, খেলা, খাবার সময়,
মা'র চিন্তা, কিসে ছেলে সদা সুখে রয়!
যখন ও চাঁদমুখে মধুমাখা বোলে,
মা বলিয়ে, ঝাঁপ দিয়ে ছুটে এস কোলে;
বুকে রেখে যখন নিরখি মুখছাঁদ!
হাতে যেন পাই, যাদু, আকাশের চাঁদ;
এই বিধুমুখে, বাছা, যদি দেখি হাসি,
সব দুঃখ ভুলে গিয়ে, সুখ-নীরে ভাসি।
যখন দেখিতে পাই, কাঁদো কাঁদো মুখ,
সব সুখ দূরে যায়, ফাটে যেন বুক!
করিতে চোখের আড়, মন নাহি চায়
রোগ হ'লে একেবারে প্রাণ উড়ে যায়।
কিসে ভাল হ'বে শুধু তাই ভেবে মরি—
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি থাকে, শয়ন না করি;
রাম শ্যাম ভাল ছেলে, কেউ যদি বলে,
সে সুখ রাখিতে ঠাঁই নাই ধরাতলে।
যে দিন পরীক্ষা দিয়ে, আইলে বাড়ীতে—
হাসিতে হাসিতে আর নাচিতে নাচিতে—

'পুরস্কার-পুস্তক' যখন হাতে দিলে,
আমার হইল জ্ঞান মাণিক আনিলে!
কিন্তু যদি কেউ এসে মন্দ ব'লে যায়;
কি কব যে দুঃখ তাতে, যেন কান্না পায়।
এত যে ব্যথার ব্যথী তোদের জননী,
বড় হ'য়ে মনে কি রাখিবে যাদুমণি?

ঝড় ও বৃষ্টি

হুড়্ হুড়্, দুড়্ দুড়্, মেঘ ডাকিছে;
মাঠ পথ ছেড়ে লোক বাড়ী আসিছে।
চিক্ মিক্ বিদ্যুতের আলো জ্বলিছে;
'চোক্ গেল' ব'লে লোক চোক্ ঢাকিছে।
কড় কড়্, হড় হড়, বাজ পড়িছে;
কাণ যায়, প্রাণ যায়, বুক কাঁপিছে।
সাঁই সাঁই রবে ভাই, মেঘ আসিছে;
আঁধারিয়ে চারি দিক্ মেঘ নামিছে।
"আয় বৃষ্টি হেনে" ব'লে ছেলে ডাকিছে;
টুপ্ টাপ্ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িছে;
চট্ পট্ শিল, যেন খই ফুটিছে;
দরজা জানালা দিয়া ঘরে ছুটিছে।
মন্দ ছেলে মা'র কথা নাহি শুনিছে—
শিল খেতে উঠানেতে, জলে ভিজিছে।
শান্ত ছেলে ঘর থেকে, শিল ধরিছে,
তুষ্ট হ'য়ে সবে তারে ভাল বলিছে।

বন্ বন্ শব্দে ঝড় ক্রমে বাড়িছে।
ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিজল আরো নামিছে।
বড় ঝড়ে বড় বড় গাছ পড়িছে ;
চাল পড়ে, খাল পাড়, কোটা নড়িছে।
পাখীদের বাসা গেল আহা, ভিজিছে!
দরিদ্রের চালা গেল, আহা কাঁদিছে!
বালকের খেলা গেল, তাই ভাবিছে!
এ সবার দুঃখে দুঃখী সে কি হইছে?
পর-দুঃখ দেখে দুঃখী হয় যার মন,
দয়াল তাহার নাম, ধন্য সেই জন।

নদী ও সময়

সদায় ধায় নদীর ঢেউ ;
রাখিতে তায় পারে না কেউ ;
সময় যায় তাহারি প্রায় ;
কাহারো মুখে চাহে না, হায়!
চলিছে দিন, চলিছে রাত ;
ধরিতে তায় কাহার হাত?
ধরিতে তায়, সে পারে ভাই,
আলস্য যার শরীরে নাই।

বর্ষা

আইল ঋতু বরষা চাষার হ'ল ভরসা,
চাতকের পিপাসা ঘুচিল
চন্দ্র সূর্য্য দু'জনার, মুখ দেখা হ'ল ভার,
দিনরাত সমান হইল ;

দলে দলে মেঘ আসি, জল ঢালে রাশি রাশি,
খাল বিল পুকুর পূরিল।
কেতকী কুসুম ফুটে, দূর হতে বাস ছুটে,
কদম্ব কেশর ফুলাইল ;
জল চলে কল কল, জলচর পায় বল,
ভেকদল আমোদে মাতিল।
গলা-ফুলো কোলা-ব্যাঙ, ডাকিছে গাঙর্ গ্যাঙ
কুণো ব্যাঙ্ বাহিরে আইল।
পিপীলিকা পাখা ধরে, পাখী হতে আশা করে,
পাখীদের প্রাণে তা সহে না ;
আকাশে উড়িতে যায়, পাখীরা ধরিয়া খায়,
বড় আশা ছোটতে সাজে না !

আনারস

বড় বড় গাছ আছে, তাতে নাহি ফলে ;
কাঁটা ঝোপে জন্ম তার, অন্য তরুতলে ;
আলো, তেজ সবে পায়, তার ভাগ্যে নয়—
স্যাঁতানে আঁধার যথা, তথায় সে রয়।
এত নীচ জন্ম, তবু গুণে উচ্চ মান ;—
বরষার যত ফল, সবার প্রধান।
বংশ, কুল, জন্মস্থান, কিছু, কিছু নয় ;—
গুণে যেই গণ্য হয়, সেই মান্য রয় !
তার সাক্ষী, কাঁটা বন, তবু লোকে যায় ;
তুলে আনে আনারস করিয়ে মাথায় !

হায় কিবা গন্ধ তার ! রূপে ঘর আলো !
ভোগে উপকারী বড়, রোগেতেও ভালো ;
কেটে লুণ, চিনি মেখে, দেখ গুণ কত—
পাইবে সুধার তার চিবাইবে যত !
"আনারস" নাম তার, কেন হ'লো, হায় !
"সুধারস" নাম দিলে, তবে শোভা পায় !

জন্মভূমি

(প্রবাসীর স্বদেশ স্মরণ)

আহা মরি ! "স্বদেশ" কি সুধা-মাখা নাম !
মনে হয়, তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গ-ধাম !
যে স্থানে মায়ার বস্তু, সকলি আমার !
সুখের বিষয় যথা, অশেষ প্রকার !
যে স্থানের পূর্ব্বকথা, করিলে স্মরণ ;
অনুরাগে উথলিয়া উঠে প্রাণ মন
যেখানে আমার পিতা, পিতামহগণ,
বংশের মর্য্যাদা সদা, করিয়া পালন,
চিরদিন করি মান, যশের বিকাশ,
পুরুষে পুরুষে সুখে, ক'রেছেন বাস ;
ফুলের সৌরভ সম, কুলের গৌরব,
যথা চির-ব্যাপ্ত ! যথা জ্ঞাতি বন্ধু সব !
এত প্রেম, ভক্তির বন্ধন, যেই স্থলে—
আহা ! আহা !
আর কি এমন স্থান, পাব ধরাতলে ?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬—১৯৩৮

এই পুস্তক প্রণয়নে 'বাতায়ন'-সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ও স্নেহাস্পদ শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা উভয়েই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

জন্ম ঃ বিদ্যাশিক্ষা

শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে। তিনি মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ (৩১ ভাদ্র ১২৮৩)। শরৎচন্দ্র ধনীর দুলাল ছিলেন না। তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানতঃ ভাগলপুরে মাতুলালয়েই কাটিয়াছিল। তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবাসী বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ইহার কিছু দিন পরে শরৎচন্দ্রের পিতা সপরিবারে দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। কিছু কাল পরে ভাগলপুরে আবার তাহার পিতার ডাক পড়িল। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে টি. এন. জুবিলী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এখান হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর ৩ মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কুলে পড়িবার সময়, ১৭ বৎসর বয়স হইতেই তিনি গল্প-উপন্যাসাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাও পরিচালিত হইত। সভার মুখপত্র ছিল 'ছায়া' নামে একখানি হাতে-লেখা কাগজ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শরৎচন্দ্র এফ. এ. পড়িবার জন্য টি. এন. জুবিলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। পর-বৎসর (নবেম্বর ১৮৯৫) তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। নানা কারণে শরৎচন্দ্রের এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এই সময়ে তাঁহার জীবন কি ভাবে কাটিতেছিল তাহার আভাস পাওয়া যায় তাঁহার এক প্রতিবেশীর রচনায় ; তিনি লিখিয়াছেন :—

ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় যখন শরৎচন্দ্রের পিতা তাঁহার তিন পুত্র এবং এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন তখন আমরা ছিলাম তাঁহাদের প্রতিবেশী। আমার অগ্রজ ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা। শরৎচন্দ্র তখন সম্পূর্ণ বেকার এবং সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। আদমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু। সতীশচন্দ্র সঙ্গীত, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি "আদমপুর ক্লাব" নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটী ড্রামাটিক সেক্‌শন ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বাংলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। 'মৃণালিনী', বিল্বমঙ্গল', 'জনা' নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি ও জনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়-সুখ্যাতি বর্দ্ধিত করেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের অরিজিন্যাল বলিয়া যে রাজুর [রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের] উল্লেখ করা হয়, তিনি উপরোক্ত মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গল অভিনয়ে গিরিজায়া ও পাগলিনীর অংশ অভিনয় করেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে বিল্বমঙ্গল অভিনয় হইবার রাত্রি হইতে রাজু নিরুদ্দেশ এবং এই পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—"শরৎচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী": শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অন্নসংস্থানে

অর্থোপার্জ্জনে শরৎচন্দ্রকে মন দিতে হইল। শ্বশুরপুরে থাকিয়া তিনি কিছু দিন বনেলী এষ্টেটে একটি সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অস্থিরমতি শরৎচন্দ্রের সংসারে মন বসিল না, তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন (ইং ১৯০০)।

শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসিবেশে এখানে-সেখানে কিছু দিন ঘুরিবার পর মজঃফরপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার সহিত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর স্বামী শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মজঃফরপুরের অনেকেই তাঁহার সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। গায়ক ও বাদক হিসাবে তিনি স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর (ইনিই 'শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেব) সুনজরে পড়েন। আমন্ত্রিত হইয়া শরৎচন্দ্র কিছু দিন এই জমিদারের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে হঠাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তিনি মজঃফরপুর ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আসেন। অতি কষ্টে পিতার শ্রদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি চাকরির সন্ধানে সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথের অগ্রজ লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলিকাতা, ভবানীপুরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে একদিন বাড়ীর কর্ত্তাদের কিছু না-জানাইয়া তিনি ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন (ইং ১৯০৩)।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে দীর্ঘ বার-তের বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ১৯১২ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্য। তিনি রেঙ্গুনে একাউনটেণ্ট-জেনারেলের আপিসে কার্য্য করিতেন। প্রবাসের দিনগুলি তিনি গভীর অধ্যয়নেই কাটাইয়াছিলেন।

আত্মকথা

সাহিত্যসেবা-সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে [illegible] স্থানে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, শরৎ-জীবনীর উপকরণ-হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর [illegible]দের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে [illegible]রা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।···স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সবজজ। তার পরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানা-শুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশি যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।

সম্ভবতঃ এই সময়েই···শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ [illegible]াদের সাহিত্য-সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম [illegible]ভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়···গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চ্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে···কবিতা পাঠ করা হইত।

গিরীন পড়িতে পারিত সব চেয়ে ভাল, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার 'পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক-পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলী-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন··· বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশি, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমজদার সমালোচকও তেমনি।···

ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু··· দুখানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা—'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না।···

দ্বিতীয় বই 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।— ("বাল্য-স্মৃতি" : 'ছোটদের মাধুকরী', আশ্বিন ১৩৪৫)

In Sarat Babu's own words, "My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at

stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, bnt never could finish anything. I have not his work now—somehow it got lost; but I remember poring over those incomplete mss. over and over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what might have been their conclusion if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. But I soon gave up the habit as useless, and almost forgot in the long years that followed that I could even write a sentence in my boyhood. A mere accident made me start again, after the lapse of about eighteen years. Some of my old acquaintances started a little magazine, but no one of note would condescend to contribute to it, as it was so small and insignificant. When almost hopeless, some of them suddenly remembered me, and after much persuasion they succeeded in extracting from me a promise to write for it. This was in the year 1913. I promised most unwillingly—perhaps only to put them off till I had returned to Rangoon and could forget all about it. But sheer volume and force of their letters and telegrams compelled me at last to think seriously about writing again. I sent them a short story, for their magazine *Jamuna*. This became at once extremely popular, and made me famous in one day. Since then I have been writing regularly. In Bengal perhaps I am the only fortunate writer who has not had to struggle."—Srikanta : E. J. Thompson, 1922.

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক,

কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অ-কেজো্র কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য

সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটী গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তার পর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।" ('বাতায়ন', শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৪)

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই, ঠিক বিশ্ব-কবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সম্বর্ধনার ঘটা—এমনি ক'রে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এলাম সহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া

নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হতে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না; আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরনো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা', আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে

বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এই বার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাসসাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক্ দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তার পরে এল বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ্ সে দিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই

গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোন দিন লিখেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে নবীন বাঙ্‌লা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি। তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কি না,—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হ'ল না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি। —('জয়ন্তী-উৎসর্গ', পৌষ ১৩৩৮)।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে আত্মীয়বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে শরৎচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা—১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের 'মন্দির' নামে একটি গল্প। ব্রহ্মদেশ যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে গল্পটি তিনি সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়াছিলেন (মাঘ ১৩০৯)। বলা বাহুল্য, গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ টাকা পুরস্কার লাভ করে। সে-বার পুরস্কৃত রচনাগুলির প্রথম দশটি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন—তৎকালীন 'বসুমতী'-সম্পাদক জলধর সেন।

ইহার চারি বৎসর পরে—১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের একটি অপরিণত বয়সের রচনা—'বড়দিদি' নামে উপন্যাস প্রকাশিত হইলেও, মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাব যে ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পরে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক) ছিলেন 'যমুনা'-সম্পাদকের বিশিষ্ট বন্ধু; তাঁহারই মধ্যস্থতায় শরৎচন্দ্র 'যমুনা'য় লিখিতে স্বীকৃত হন। 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা—'বোঝা' নামে একটি গল্প (কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯)। ইহাও তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনা।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাগুলি ভাগলপুরে তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুলদের নিকট ছিল। এই সময়ে তাঁহারা শরৎচন্দ্রের এই সকল প্রাথমিক রচনা যাহাতে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়, তাহার জন্য বিশেষ

সচেষ্ট ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্যে' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জানাইলে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা-সম্বলিত একখানি খাতা দিয়াছিলেন। পাছে পুরাতন রচনা প্রকাশে শরৎচন্দ্র আপত্তি করেন, এই ভয়ে উপেন্দ্রনাথ এ কথা তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্লে কিছুই জানান নাই। বলা বাহুল্য, 'সাহিত্যে' "বাল্য-স্মৃতি" (মাঘ ১৩১৯), "কাশীনাথ" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "অনুপমার প্রেম" ও "হরিচরণ" প্রকাশিত হইলে শরৎচন্দ্র প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অপরিণত বয়সের রচনা হুবহু মুদ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

যাহা হউক, এদিকে নিয়মিত পত্র-বিনিময়ে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। 'যমুনা'কে নিয়মিত ভাবে রচনা দিয়া সাহায্য করিবেন—এ প্রতিশ্রুতি শরৎচন্দ্র একাধিক পত্রে দিয়াছেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখে তিনি রেঙ্গুন হইতে ফণীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন :—

> "আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না। ...আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়—।
>
> আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home..."

প্রকৃতপক্ষে ১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত 'যমুনা'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা সমালোচনা—কোন-না-কোন রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি বড়দিদি অনিলা দেবীর ছদ্ম নামেও কতকগুলি প্রবন্ধ—"নারীর লেখা", "নারীর মূল্য",

"কানকাটা" ও "গুরু-শিষ্য সংবাদ" ১৩১৯-২০ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথকে পত্রিকা-সম্পাদনে রীতিমত সাহায্য করিতেন। রেঙ্গুন হইতে 'যমুনা'র জন্য প্রবন্ধ ও গল্পাদি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতেন।

'যমুনা'য় "রামের সুমতি" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "পথ-নির্দ্দেশ" (বৈশাখ ১৩২০) ও "বিন্দুর ছেলে" (শ্রাবণ ১৩২০), এই তিনটি নূতন গল্প উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইবার পর চারি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল। রচনার জন্য বড় বড় পত্রিকাগুলির উপরোধ-অনুরোধ রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত। ইহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ও মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শরৎচন্দ্র "চরিত্রহীন" উপন্যাসের কতকাংশ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন—অন্তরঙ্গ বন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা গৃহীত হয় নাই। 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা "বিরাজ বৌ" প্রকাশিত হয়—১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায়। "চরিত্রহীন" গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বিচলিত হইয়াছিলেন। 'যমুনা'র সহিত শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি এক নূতন ব্যবস্থা করিলেন। ১৩২১ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'যমুনা'র শেষে "সংবাদ"-বিভাগে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল :—

> "যমুনার পাঠকগণ বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান মাস হইতে 'যমুনা'র সম্পাদন-কার্য্যে যোগদান

করিলেন। 'যমুনা'র পাঠকগণের নিকটে শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত—অতএব পরিচিতের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।"

পরবর্ত্তী শ্রাবণ-সংখ্যা হইতে অন্যতর-সম্পাদক রূপে শরৎচন্দ্রের নাম ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় মুদ্রিত হইতে থাকে। কিন্তু ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নূতন রচনা—"পণ্ডিত মশাই" ও আরও তিনটি গল্প প্রকাশিত হইল ; এই বৎসরের প্রথমার্দ্ধেই আবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক "বিরাজ বৌ" ও "বিন্দুর ছেলে"···এবং রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক "পরিণীতা" ও "পণ্ডিত মশাই" পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল। শরৎচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" অসমাপ্ত রাখিয়া, শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগে 'রূপ ও রঙ্গ' সম্পাদন করেন। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৪ অক্টোবর ১৯২৪ (১৮ আশ্বিন ১৩৩১)*

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল ; তাঁহার পক্ষে সে দেশ ত্যাগ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই সময়ে মাসিক এক শত টাকা আয়ের ভরসা দিয়া ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য শরৎচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। অকূলে কূল পাইয়া শরৎচন্দ্র এক বৎসরের ছুটিতে কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা ফিরিতে মনস্থ করিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।

---

* ১৩৩১, অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'কল্লোলের' পত্রিকা-পরিচয় বিভাগে ইহার ১ম সংখ্যার পরিচয়ে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শরৎচন্দ্রের ও নির্ম্মলচন্দ্রের নামোল্লেখ আছে।

রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুরে অবস্থিতি করিতেন। শহরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এগার শত টাকা দিয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পানিত্রাস গ্রামে, বড়দিদি অনিলা দেবীর বাটীর সন্নিকটে, এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন। রূপনারায়ণের তীরে নির্ম্মিত (ইং ১৯২৫) নিরালা পল্লী-আবাসে শরৎচন্দ্রের বহু দিন কাটিয়াছে। শেষ জীবনে জীবন-সঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছায় তিনি কলিকাতায় বর্ত্তমান অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (জুলাই ১৯৩৪)।

গ্রন্থপঞ্জী

শরৎ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন দিন দিন বাড়িতেছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি নানা ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রঙ্গালয় ও সিনেমাগুলিতেও তাঁহার গল্প-উপন্যাস নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

শরৎচন্দ্রের কোন্ রচনা কবে কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ সহ তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল আদৌ মুদ্রিত হয় নাই; অনেকগুলিতে কেবল সালের উল্লেখ আছে—মাসের উল্লেখ নাই। তালিকায় বন্ধনীমধ্যে পুস্তকের সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে গৃহীত। একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম-নির্ণয়ে এই ইংরেজী তারিখগুলি অপরিহার্য্য।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বড়দিদি'ই (ইং ১৯১৩) সর্ব্বপ্রথম ; ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'বিরাজ বৌ' (মে ১৯১৪) হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ পুস্তকই প্রকাশ করিয়াছেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স যথাক্রমে 'পরিণীতা' (আগস্ট ১৯১৪), 'পণ্ডিত মশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন' ও 'নারীর মূল্য'—এই ছয়খানি এবং শিশির পাবলিশিং হাউস 'বামুনের মেয়ে' (ইং ১৯২০) প্রথমে প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পথের দাবী' (ইং ১৯২৬), সরস্বতী লাইব্রেরি 'তরুণের বিদ্রোহ' (ইং ১৯২৯) এবং আর্য্য পাবলিশিং কোং 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (ইং ১৯৩২) প্রকাশ করিয়াছেন।

১। **বড়দিদি** (উপন্যাস)। ১৩২০ সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ৭৯।

১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নাই।

২। **বিরাজ বৌ** (উপন্যাস)। ? [বৈশাখ ১৩২১] (২ মে ১৯১৪)। পৃ. ১৭৫।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত হয়। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের ইহাই প্রথম রচনা।

'বিরাজ বৌ'-এর নাট্য-রূপও প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রাবণ ১৩৪১)।

৩। **বিন্দুর ছেলে** ও অন্যান্য গল্প। [শ্রাবণ ১৩২১] (৩ জুলাই ১৯১৪)। পৃ. ২১১।

ইহাতে 'বিন্দুর ছেলে,' 'রামের সুমতি' ও 'পথ-নির্দ্দেশ'—এই তিনটি গল্প আছে। এগুলি প্রথমে 'যমুনা' পত্রিকার যথাক্রমে শ্রাবণ ১৩২০, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ ও বৈশাখ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি'র নাট্যরূপও প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিন্দুর ছেলে'র প্রথম অভিনয় হয়—'শ্রীরঙ্গমে' ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৪ ও 'রামের সুমতি'র প্রথম অভিনয় হয়—'রঙ্‌মহলে' ২২ জুন ১৯৪৪ তারিখে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রথম গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ "Bindu's Son" নামে 'মডার্ন রিভিয়ু' (ফেব্রুয়ারি-জুন ১৯২৭) পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। **পরিণীতা** (গল্প)। (১০ আগস্ট ১৯১৪)। পৃ. ১১৫।

১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত।

৫। **পণ্ডিত মশাই** (উপন্যাস)। ১৩২১ সাল (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ১৪৮।

১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

৬। **মেজদিদি** ও অন্যান্য গল্প (গল্প)। ? অগ্রহায়ণ ১৩২২ (১২ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৭১।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে—'মেজদিদি', 'দর্প-চূর্ণ' ও 'আঁধারে আলো'। গল্পগুলি প্রথমে ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' যথাক্রমে ভাদ্র, কার্ত্তিক ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তীকালে

"দেওঘরের স্মৃতি" ('ভারতবর্ষ' আষাঢ় ১৩৪৪) এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৭। **পল্লী-সমাজ** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩২২ (১৫ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৮০।

১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকের ১৪শ সংস্করণটি সংশোধিত।

'পল্লী-সমাজে'র নাট্য-রূপ 'রমা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রাবণ ১৩৩৫)।

৮। **চন্দ্রনাথ** (উপন্যাস)। ? (১২ মার্চ ১৯১৬)। পৃ. ১৫৭।

১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত। 'চন্দ্রনাথে'র ১৪শ সংস্করণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

"চন্দ্রনাথ গল্পটি আমার বাল্য রচনা। তখনকার দিনে গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনের যে-ভাষা ব্যবহার করা হইত এই বইখানিতে সেই ভাষাই ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম। ইতি ১৮ই আশ্বিন—১৩৪৪।

গ্রন্থকার।"

৯। **বৈকুণ্ঠের উইল** (গল্প)। ১৩২৩ সাল (৫ জুন ১৯১৬)। পৃ. ১৩৮।

১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১০। **অরক্ষণীয়া** (গল্প)। কার্ত্তিক ১৩২৩ (২০ নবেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৪।

১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১১। **শ্রীকান্ত,** ১ম পর্ব্ব (চিত্র)। [মাঘ ১৩২৩] (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪৩।

ইহা "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী" নামে ১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—K. C. Sen ও Theodosia Thompson. এই ইংরেজী অনুবাদ (পৃ. ১৭৫) *Srikanta* নামে E. J. Thompson-এর ভূমিকা সহ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

১২। **দেবদাস** (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩২৪ (৩০ জুন ১৯১৭)। পৃ. ১৫৬।

ইহা ১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩। **নিষ্কৃতি** (গল্প)। ? (১ জুলাই ১৯১৭)। পৃ. ১২৫।

ইহার প্রথমাংশ "ঘর-ভাঙ্গা" নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'যমুনা'য় ও সমগ্র অংশ ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্ত্তিক ও পৌষ 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীদিলীপকুমার রায় 'নিষ্কৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ *Deliverance* নামে (পৃ. ১৬ + ১০৪) প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদটি "Revised by Sri Aurobindo. With a Preface by Rabindranath Tagore."

১৪। **কাশীনাথ** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৪ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৯২।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। এগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশ-কালের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল :—(১) কাশীনাথ ('সাহিত্য,' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯); (২) আলো ও ছায়া ('যমুনা', আষাঢ়, ভাদ্র ১৩২০); (৩) মন্দির ('কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন,' সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত); (৪) বোঝা ('যমুনা', কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯); (৫) অনুপমার প্রেম ('সাহিত্য,' চৈত্র ১৩২০); (৬) বাল্য-স্মৃতি ('সাহিত্য,' মাঘ ১৩১৯); (৭) হরিচরণ ('সাহিত্য,' আষাঢ় ১৩২১)।

এই পুস্তকের অন্তর্গত 'কাশীনাথ' (বৈশাখ ১৩৫৪) ও 'অনুপমার প্রেম' শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া যথাক্রমে (পৌষ ১৩৫২) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। **চরিত্রহীন** (উপন্যাস)। ? [কার্ত্তিক ১৩২৪] (১১ নবেম্বর ১৯১৭)। পৃ ৫৬৬।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের কার্ত্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'চরিত্রহীনে'র একটি সংস্করণের জন্য গ্রন্থকারের এই ভূমিকাটি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু দপ্তরীর ভুলে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই :—

"চরিত্রহীনের গোড়ার অর্দ্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তার পরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হলো বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে নানা আকারে। অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই

ওটা রয়ে গেল। বর্ত্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্ত্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।

১৪।৭।৩৭ গ্রন্থকার"

১৬। **স্বামী** (গল্প)। ফাল্গুন ১৩২৪ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। পৃ. ৯১।

ইহাতে 'স্বামী' ও 'একাদশী বৈরাগী' নামে দুইটি গল্প আছে। প্রথমটি ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণ' এবং দ্বিতীয়টি ১৩২৪ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭। **দত্তা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৫ (২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ২৬৭।

ইহা ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'দত্তা'র নাট্য-রূপ—'বিজয়া', (পৌষ ১৩৪১)

১৮। **শ্রীকান্ত,** ২য় পর্ব্ব (চিত্র)। ভাদ্র ১৩২৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ১৯২।

ইহা প্রথমে ১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়।

১৯। **শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী,** ১-৭ খণ্ড। ইং ১৯১৯-১৯৩৫।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে বসুমতী কার্য্যালয় কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে সুরু হয়।

১ম খণ্ড (২০ অক্টোবর ১৯১৯) :—দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল।

২য় খণ্ড (২০-১-২০) :—শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব, দেবদাস, দর্প-চূর্ণ, পল্লীসমাজ, বড়দিদি।

৩য় খণ্ড (১০ জুন ১৯২০) :—স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিত মশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি।

৪র্থ খণ্ড (২৫-৯-২০) :—চরিত্রহীন, ছবি, বিলাসী।

৫ম খণ্ড (২১-২-২৩) :—গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ।

৬ষ্ঠ খণ্ড (২৫-৯-৩৪) :—শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব্ব, নব-বিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ।

৭ম খণ্ড (১৭-৯-৩৫) :—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

২০। **ছবি** (গল্প)। মাঘ ১৩২৬ (১৬ জানুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ১০৪।

ইহাতে প্রকাশিত তিনটি গল্প—'ছবি' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ১৩২৬ সালের পূজা-বার্ষিকী 'আগমনী'তে; 'বিলাসী' ('ভারতী', বৈশাখ ১৩২৫); ও 'মামলার ফল' ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত বার্ষিকী 'পার্ব্বণী'তে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২১। **গৃহদাহ** (উপন্যাস)। ? [ফাল্গুন ১৩২৬] (২০ মার্চ্চ ১৯২০)। পৃ. ৫৩২।

ইহা ১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র; ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন; ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র; ও ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

২২। **বামুনের মেয়ে** (উপন্যাস)। [আশ্বিন ১৩২৭]।

ইহা শিশির পাবলিশিং হাউস-প্রবর্ত্তিত "উপন্যাস সিরিজ"-এর ২য় বর্ষের প্রথম উপন্যাস (নং ১৩) —১৩২৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

২৩। **বারোয়ারি উপন্যাস**। (২ মে, ১৯২১)। পৃ. ২৪৪।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই বারোয়ারি উপন্যাসের কেবলমাত্র ২১শ ও ২২শ অধ্যায় শরৎচন্দ্রের লিখিত।

২৪। **নারীর মূল্য** (সন্দর্ভ)। ? [চৈত্র ১৩২৯] (১২ এপ্রিল ১৯২৯)। পৃ. ১৩৩।

"নারীর মূল্য" প্রথমে শরৎচন্দ্রের বড়দিদি "শ্রীমতী অনিলা দেবী"র ছদ্ম নামে ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়।

'নারীর মূল্য' পুস্তকে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার-স্বাক্ষরিত "প্রকাশকের নিবেদন" অংশটিও প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের রচনা। আমরা উহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিকপত্রে নারীর মূল্য প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

"কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে তিনিই জানেন, তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এমনি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তার পরে, এই দীর্ঘ দশ

বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোন মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক্, পারেন ত আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি,—তিনি বলেন, না হে, থাক্ এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। অথচ, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও নয়,—আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইহাঁদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে, এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহা পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের ত মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

২৫। **দেনা-পাওনা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩০ (১৪ আগস্ট ১৯২৩)। পৃ. ৩০৭।

ইহা ১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র ; ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও চৈত্র ; ১৩২৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্ত্তিক ও মাঘ-চৈত্র ; ১৩৩০ সালের বৈশাখ ও আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নাট্য-রূপ 'ষোড়শী' (শ্রাবণ ১৩৩৪)।

২৬। **নব-বিধান** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩১ (অক্টোবর ১৯২৪)।
পৃ. ১৩৬।

ইহা ১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

২৭। **হরিলক্ষ্মী** (গল্প)। ? [চৈত্র ১৩৩২] (১৩ মার্চ ১৯২৬)।
পৃ. ৯২।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে,—হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ। প্রথম গল্পটি ১৩৩২ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পটি যথাক্রমে ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী'র আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২৮। **পথের দাবী** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৩ (৩১ আগস্ট ১৯২৬)।
পৃ. ৪২৬।

ইহা ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ; ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, পৌষ-মাঘ ; ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্ত্তিক-ফাল্গুন ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে সমগ্রভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

"এই উপন্যাসখানি 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৩৩ সনে ইহার প্রথম সংস্করণ বাহির হইলে গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"··· (২য় সংস্করণ)

২৯। **শ্রীকান্ত,** ৩য় পর্ব্ব (চিত্র)। [চৈত্র ১৩৩৩] (১৮ এপ্রিল ১৯২৭)। পৃ. ২১৩।

ইহা ১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩০। **ষোড়শী** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৩৪] (১৩ আগস্ট ১৯২৭)। পৃ. ১৫৩।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ২১ শ্রাবণ ১৩৩৪ তারিখে নাট্যমন্দির লিঃ কর্তৃক প্রথম অভিনীত।

১ জুন ১৯২৭ তারিখের পত্রে শরৎচন্দ্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখিয়াছিলেন :—"দু-এক দিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখ্‌বো। (বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্ত্তী। আমি আবার জাটখোল বদলে শিশিরের অভিনয়ের জন্য তৈরি করে দিয়েছি। বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয় নি।···)"—'মাসিক বসুমতী', মাঘ ১৩৪৪।

৩১। **রমা** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৩৫] (৪ আগস্ট ১৯২৮)। পৃ ১৪৪।

'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ১৯ শ্রাবণ ১৩৩৫ তারিখে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত।

৩২। **সত্যাশ্রয়ী** (ভাষণ)। ২৪ মার্চ ১৯২৯। পৃ. ১৩।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে মালিকান্দা অভয় আশ্রমে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

৩৩। **তরুণের বিদ্রোহ** (সন্দর্ভ)। ইং ১৯২৯ (১৮ এপ্রিল ১৯২৯)। পৃ. ২৩।

"১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।"

সরস্বতী লাইব্রেরি কর্ত্তৃক এই পুস্তিকাখানি প্রচারের তিন বৎসর পরে আর্য্য পাবলিশিং কোং ইহার পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রচার করেন (২৩ আগস্ট ১৯৩২)। এই সংস্করণে "তরুণের বিদ্রোহ" ছাড়া "সত্য ও মিথ্যা" নামে একটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৪। **শেষ প্রশ্ন** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩৩৮ (২ মে ১৯৩১)। পৃ. ৪০০।

ইহা 'ভারতবর্ষে'র ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্ত্তিক, মাঘ-চৈত্র; ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু "ভারতবর্ষে প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকে মুদ্রিত উপন্যাসের যে সর্ব্বত্র মিল নাই, এ কথা বলা প্রয়োজন।"

৩৫। **স্বদেশ ও সাহিত্য** (সন্দর্ভ)। ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ১৫৬।

আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানি এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে, সেগুলির নাম ও সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ দিতেছি।—

স্বদেশ :—আমার কথা (১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণ) 'প্রবর্ত্তক', শ্রাবণ ১৩২৯ দ্রষ্টব্য ; স্বরাজ সাধনায় নারী (১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্‌স্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ) 'নব্যভারত', পৌষ ১৩২৮ ; শিক্ষার বিরোধ (১৩২৮ সালে "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে" পঠিত) 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮ দ্রষ্টব্য ; স্মৃতিকথা (১৩৩২ আষাঢ় "দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা") 'মাসিক বসুমতী' হইতে গৃহীত ; অভিনন্দন (১৩২৮ সালের জুন মাসে, স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে পঠিত অভিনন্দন) ।

সাহিত্য :—ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য (১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ) ; গুরু-শিষ্য সংবাদ (যমুনা ১৩২০ ফাল্গুন ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; সাহিত্য ও নীতি (১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ) 'বঙ্গবাণী', পৌষ ১৩৩১ দ্রষ্টব্য ; সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির অভিভাষণ) 'মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৩১ দ্রষ্টব্য ; ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত ('ভারতবর্ষ', ১৩৩১ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ (১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইন্‌স্টিটিউটে, সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ) 'বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ১৩৩০ দ্রষ্টব্য ; সাহিত্যের রীতি ও নীতি ('বঙ্গবাণী', ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; অভিভাষণ

(১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩-তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে দেশবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর) 'কালি-কলম', আশ্বিন ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য ; অভিভাষণ (৫৫-তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত) ; যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা ; শেষ প্রশ্ন (সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী···সেনকে লিখিত পত্র, 'বিজলী', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত) 'জয়ন্তী-উৎসর্গ', পৌষ ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

৩৬। **শ্রীকান্ত**, ৪র্থ পর্ব্ব (চিত্র)। ? [ফাল্গুন ১৩৩৯] (১৩ মার্চ ১৯৩৩)। পৃ. ২৪৬।

ইহা ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৩৭। **অনুরাধা-সতী ও পরেশ** (গল্প)। ? [ফাল্গুন ১৩৪০] (১৮ মার্চ ১৯৩৪)। পৃ. ১২৩।

ইহা তিনটি গল্পের সমষ্টি। "অনুরাধা" ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে', "সতী" ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে, এবং "পরেশ" ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'শরতের ফুলে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৮। **বিরাজ বৌ** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৪১] (১৮ আগস্ট ১৯৩৪)। পৃ. ১১৪।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ১২ শ্রাবণ ১৩৪১ তারিখে 'নব নাট্যমন্দিরে' প্রথম অভিনীত।

। **বিজয়া** (নাটক)।? [পৌষ ১৩৪১] (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। পৃ. ১৭২।

'দত্তা' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ৬ পৌষ ১৩৪১ তারিখে স্টার রঙ্গমঞ্চে 'নব নাট্যমন্দির' কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত।

শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে 'বিজয়া' নাটকের শেষ দুই পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নাংশ রচনা করিয়াছিলেন, উহা পরবর্ত্তী সংস্করণের পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে :—

রাস। দয়াল, মেয়েটি কে?

দয়াল। আমার ভাগ্নি নলিনী।

রাস। বড় জ্যাঠা মেয়ে। (প্রস্থান)

দয়াল। (সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। ভগবান্ ওঁর ক্ষোভ দূর করুন। গাঙ্গুলী মশাই, চলুন আমরা অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখি গে। আজকের দিনে কোথাও না অপরাধ স্পর্শ করে।

পূর্ণ। প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে কোথাও ত্রুটি নেই দয়ালবাবু—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক আছে। (প্রস্থান)

দয়াল। (ইঙ্গিতে বরবধূকে দেখাইয়া) নলিনী, এদেরও যা হোক দুটো খেতে দিতে হবে যে মা! যাও তোমার মামীমাকে বলো গে।

নলিনী। যাই মামাবাবু—

দয়াল। আমিও যাচ্ছি চলো—(প্রস্থান)

ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমঞ্চে বরবধূ ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

নরেন। গম্ভীর হয়ে কি ভাবচো বলো তো?

বিজয়া। (সহাস্যে) ভাবচি তোমার দুর্গতির কথা। সেই যে ঠকিয়ে Microscope বেচেছিলে তার ফল হলো এই। অবশেষে আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

নরেন। (গলার মালা দেখাইয়া) তার এই ফল! এই শাস্তি?

বিজয়া। হাঁ তাই তো। শাস্তি কি তোমার কম হল না কি!

নরেন। তা হোক্, কিন্তু বাইরে এ কথা আর প্রকাশ কোরো না,—তা হলে রাজ্যিশুদ্ধ লোক তোমাকে Microscope বেচতে ছুটে আসবে।

উভয়ের হাস্য

নলিনী। (প্রবেশ করিয়া) এসো ভাই, আসুন Dr. Mukherji. মামীমা আপনাদের খাবার দিয়ে বসে আছেন,—কিন্তু অমন অট্টহাস্য হচ্ছিল কেন?

বিজয়া। (হাসিয়া) সে আর তোমার শুনে কাজ নেই—

যবনিকা

৪০। **বিপ্রদাস** (উপন্যাস)। [মাঘ ১৩৪১] (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। পৃ. ৩২৩।

ইহা ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন; ও ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্ত্তিক-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের পূর্ব্বে "বিপ্রদাস" ১০ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ৩য়-৫ম বর্ষের (১৩৩৬-৩৮) 'বেণু'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪১। স্বপচক্র (বারোয়ারি উপন্যাস)। [১১ বৈশাখ ১৩৪৩]। পৃ. ২২৯।

এই বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা করেন—শরৎচন্দ্র। তাঁহার লিখিত অংশটি ৩ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়া ১৩ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তিতে শেষ হইয়াছে। এই অংশটি প্রথমে ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'উত্তরা'য় প্রকাশিত হয়।

[মৃত্যুর পর প্রকাশিত]

৪২। **শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ**। [চৈত্র ১৩৪৪]। পৃ. ৩০।

ইহা শ্রীহর্ষ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমুরারি দে সম্পাদিত। "বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র ছাত্রগণের অনুরোধে বিভিন্ন কলেজে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি একত্রিত ক'রে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হ'ল।"

সূচী :—(১) পৌষ ১৩২৮ সাল শিবপুর ইন্‌স্টিটিউটে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট পঠিত।—'স্বদেশ ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য। (২) ৫৩-তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৫ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা।—'স্বদেশ ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য। (৩) ৫৪-তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৬ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা।—'স্বদেশী বাজার' (মাসিক) আশ্বিন ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য। (৪) ৫৫-তম জন্মদিবসে ১৩৩৭ সাল বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত।—'বাতায়ন' ২৯ আশ্বিন ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য। (৫) আশুতোষ কলেজ বাংলা সাহিত্য-সম্মেলন দ্বিতীয় বার্ষিক (২১ ফাল্গুন ১৩৪২)

উৎসবে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা। (৬) [illegible] চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত ৬২-তম জন্মদিনে ৩১ ভাদ্র ১৩৪৪ "বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি"-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে মৌখিক বক্তৃতা। (৭) ৬২-তম জন্মদিবসে (৩১ ভাদ্র ১৩৪৪) বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত অভিনন্দন-সভায় প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা।—'বিদ্যাসাগর [illegible]লেজ পত্রিকা', জুলাই ১৯৩৬ দ্রষ্টব্য।

৪৩। **ছেলেবেলার গল্প** (সচিত্র)। ? [বৈশাখ ১৩৪৫] (এপ্রিল ১৯৩৮)। পৃ. ১২১।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলির নাম :—১। লালু ('মৌচাক', চৈত্র ১৩৪৪), ২। ছেলেধরা (ব্রজমোহন দাশ-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'ছোটদের আহরিকা', ১৩৪২), ৩। কোলকাতার নতুন-দা (শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা', ১৩৪৪), ৪। লালু (শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'সোনার কাঠি', ১৩৪৪), ৫। বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী ('পাঠশালা', আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৪৪), ৬। লালু, ৭। দেওঘরের স্মৃতি ('ভারতবর্ষ', আষাঢ় ১৩৪৪)।

৪৪। **শুভদা** (উপন্যাস)। ? [জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫] (৫ জুন ১৯৩৮) পৃ. ২৫৪।

৪৫। **শেষের পরিচয়** (উপন্যাস)। ? [আষাঢ় ১৩৪৬] (৭ জু ১৯৩৯)। পৃ. ৪১৪।

ইহার ১৫ পরিচ্ছেদ ("রাখাল এ প্রশ্নে নীরবে বাহির হই

গেল।" পর্য্যন্ত) প্রথমে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৯ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৪০ সালের বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ; ১৩৪১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকের বাকী অংশ শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর রচিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

বাংলা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের গল্প, প্রবন্ধাদি বহু রচনা এখনও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। এই শ্রেণীর সকল রচনার সন্ধান না পাইলেও কতকগুলির নির্দ্দেশ দিতেছি।

যমুনা :—(১) ফাল্গুন ১৩১৯ "নারীর লেখা"। (শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া, শ্রীমতী অনুরূপা ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য)—অনিলা দেবী। (২) আষাঢ় ১৩২০ "কানকাটা"—অনিলা দেবী। ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "কানকাটা" প্রবন্ধের সমালোচনা।

ভারতবর্ষ :—(১) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩···সমাজ ধর্ম্মের মূল্য (প্রবন্ধ)—অনিলা দেবী। (২) জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪···আসার আশায় (গল্প)। (৩) কার্ত্তিক ১৩৩৯···টাউন হলে ৫৭-তম জন্মদিন উৎসবে শরৎচন্দ্রের প্রতিভাষণ।

নারায়ণ :—বৈশাখ ১৩২৯···মহাত্মাজী।

স্বদেশী-বাজার (সাপ্তাহিক):—২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮... শরৎ-প্রসঙ্গ (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীঅবিনাশ-চন্দ্র ঘোষালের কথোপকথন)।

বেণু:—(১) বৈশাখ ১৩৩৬...যুব-সঙ্ঘ; (২) আশ্বিন ১৩৩৬... নূতন প্রোগ্রাম ("শ্রীপরশুরাম" ছদ্ম নামে লি[illegible] সমালোচনা)।

উত্তরা:—আষাঢ় ১৩৩৭...অভিভাষণ (লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের অভিনন্দনের উত্তরে)।

বিজলী (সাপ্তাহিক):—২৫ আশ্বিন ও ২৩ কার্ত্তিক ১৩৩০... "দিনকয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী"।

মাসিক বসুমতী:—কার্ত্তিক-পৌষ, চৈত্র ১৩৩০; বৈশাখ, আষাঢ়, পৌষ ১৩৩১; বৈশাখ ১৩৩২..."জাগরণ" (উপন্যাস, অসম্পূর্ণ)।

হিন্দু সঙ্ঘ (সাপ্তাহিক):—১৯ আশ্বিন ১৩৩৩..."বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা"। (১৩৩৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে পুনর্মুদ্রিত)।

প্রবর্ত্তক:—কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৭...সাহি[illegible] সম্রাট্ শরৎ-চন্দ্র প্রবর্ত্তক আশ্রমে ও আলাপ-সভায়।

বিচিত্রা:—(১) ফাল্গুন ১৩৪০..."সাহিত্য-সম্মিলনের রূপ"—১৩ই মাঘ ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ। (২) আশ্বিন ১৩৪২..."বাংলা বইয়ের দুঃখ" (প্রবন্ধ)। (৩) শ্রাবণ, চৈত্র ১৩৪২, বৈশাখ ১৩৪৩..."অনাগত" বা "আগামী কাল" (উপন্যাস, অসম্পূর্ণ)। (৪) ভাদ্র ১৩৪৩..."মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"। ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩, ১০ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

নাগরিক (সাপ্তাহিক) :—শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪১...বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

স্বদেশ :—মহালয়া ১৩৪২...সাহিত্যিকের মূল্য (হোটেল ম্যাজিষ্টিকে বঙ্গীয় পি. ই. এন্-এর সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম)।

কিশলয় :—আশ্বিন ১৩৪৪...মহাত্মার পদত্যাগ।

বাতায়ন (সাপ্তাহিক) :—(১) ৪ মাঘ ১৩৪১...ক। সাহিত্যিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য, খ। কবি অতুলপ্রসাদ (প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা)। (২) ১ শ্রাবণ ১৩৪৩... কলিকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের প্রতিবাদকল্পে হিন্দু-জনসভায় উদ্বোধন-বক্তৃতা। (৩) ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩...আলবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ। (৪) ১৯ ভাদ্র ১৩৪৩...ঢাকা, শান্তি-সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা। (৫) ৯ আশ্বিন ১৩৪৩...৬১[illegible]ম জন্মতিথি উপলক্ষে হাওড়া টাউন-হলে প্রদত্ত বক্তৃতা। (৬) ১৫ আশ্বিন ১৩৪৪...ভালোমন্দ (ইহা একখানি বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা মাত্র)। (৭) ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৪ (শরৎ-[illegible]তি-সংখ্যা)...ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়। (৮) ১৬ বৈশা[illegible] ও ৬ আশ্বিন ১৩৪৫... শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত খণ্ড রচনা।

ছোটদের মাধুকরী (বার্ষিকী) :—আশ্বিন ১৩৪৫...বাল্য-স্মৃতি (আলোচনা)।

* * *

জয়ন্তী-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্রখানিও শরৎচন্দ্রের রচনা।

(Tagore Memorial Special Supplement : *The Calcutta Municipal Gazette*, 13 Sept. 1941 দ্রষ্টব্য)।

১৩৪১ সালের ২রা ভাদ্র সেনেট-হলে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ জলধর-সম্বর্দ্ধনা-সমিতির পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষরে যে মানপত্র প্রদত্ত হয়, তাহাও তাঁহারই রচনা ('বাতায়ন', ৭ ভাদ্র ১৩৪১ দ্রষ্টব্য)।

সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য

শরৎ-সাহিত্য লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একদা দুই দলের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য অশ্লীলতা দোষদুষ্ট, তাহাতে দুর্নীতির সমর্থন আছে, পাপের চিত্রকে তিনি মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন,—এরূপ অভিযোগ কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছিলেন। 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে, অভিভাষণে ও পত্রাদিতে শরৎচন্দ্র এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশসমূহ হইতে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে।—

> ...আধুনিক ঔপন্যাসিকের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জ্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন! আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য ব্যবসায় আজও আমার বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায়

হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গালা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্ত্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই।—"আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ।"

* * *

…সুদূর প্রবাসে কেরাণীগিরি করতাম, ঘটনাচক্রে বছর দশেক হ'ল এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হ'য়ে পড়েছি। খান কয়েক বই লিখেছি, কারও ভাল লেগেছে, অনেকেরই লাগেনি,—পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ করেছেন যে, বাঙ্গলা ভাষার আমি একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে দিয়েছি। এত সত্বর এত বড় দুষ্কার্য্য কি ক'রে কোরলাম তাও আমি বিদিত নই, কি-ই বা এর কৈফিয়ৎ সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।…

…আমার নিজের পেশা উপন্যাস-সাহিত্য, সুতরাং এই

সাহিত্যের দু'একটা কথা বলা বোধ করি নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা ব'লে গণ্য হবে না। যাঁরা আমার নমস্য আমার গুরুপদবাচ্য তাঁদের লেখা থেকে এক আধটা উদাহরণ দিলে যদি বা একটু বিরুদ্ধ মত থাকে, আশা করি আপনাদের কেহই তাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা ব'লে ভুল করবেন না। আমার সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনও আছে। গোটা দুই শব্দ আজ-কাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি ক'রে যে এই দু'টোকে ভাগ ক'রে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হ'তে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র-সৃষ্টি কি এতই সহজ?···আমি ত জানি কি ক'রে আমার চরিত্রগুলি গ'ড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে তা আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে এমন গোলযোগ বাধবে যে, কাল তাকে ক্ষমা করবে না। নীতি-পুস্তক হ'বে, কিন্তু সাহিত্য হ'বে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।

আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হ'য়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু আর রইল না। ভালই হ'ল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক্? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিম-চন্দ্রের দুই চোক্ অশ্রুপরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা ক'রে মরেছে।

···শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার 'পল্লী-সমাজে'র বিধবা রমাকে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন, "তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কি না তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ" এ ধিক্কার artএর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।···

ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে,—ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলার কোন artই কোন দিন আপত্তি করে না। কিন্তু

দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে, নির্ব্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

অর্থাৎ, যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলিনে, তেম্নি যা' ঘটে না, অথচ, সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক্ দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার ম... দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

আমার অবসর অল্প, বক্তব্য বস্তুকে আমি পরিস্ফুট করতে পারি নি, এ আমি জানি, কিন্তু আধুনিক-সাহিত্য রচনায় সমাজের এক শ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের উদয় হয়েছে, বিরোধের আরম্ভ যে কোন্‌খানে, সে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাটুকু বোধ করি আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর ক'রে তোলবার আমার প্রবৃত্তি নে... সময় নেই, শক্তিও নেই, শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ... হিত্যাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পথে কোথায় বাধা পে... আমরা যে অন্য পথে চল্‌তে বাধ্য হ'য়ে পড়েছি, সেই আভাস... মাত্র আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম।—"সাহিত্য ও ...ত।"

* * *

...'পল্লী-সমাজ' বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা কেউ আর থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি

মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্য-সেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হ'য়ে যেত।

আগেকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না, ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয় নি। এটা এসেছে হালে। যাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সব চেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানা দিক্ দিয়া এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হ'য়ে উঠেছে।

নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোট খাট কারণ থাক্‌লেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে

মানি নে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হ'য়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সব চেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই অবশেষে বিধিবদ্ধ আইন হ'য়ে উঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ কাউকে চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই এক ভরসা, propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বস্তু বহু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।…

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙ্‌রা ক'রে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টাটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতিপুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে গল্পচ্ছলে যদি এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি,

সাহিত্যে না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয় ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?···এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।—"সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি।"

* * *

···নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায় নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানি নে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না, এ বিচার করেও দেখি নি, শুধু সে দিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না, এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।···সৃষ্টির কালটাই হ'ল যৌবনকাল—কি প্রজা সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্য সৃষ্টির দিক্ দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম ক'রে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝ'রে পড়ে,তার উৎস-মুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই,—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন—তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।—৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে অভিভাষণ।

* * *

মণ্টু,···সাবিত্রী সম্বন্ধে 'পুষ্পপাত্রে' [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০] "বুদ্ধদেব ও বাস্তবতা" প্রবন্ধে যা লিখেছ পড়লুম। তুমি ঠিকই লিখেছ। কিন্তু অনেকে এইটুকু কেন যে ভুলে যান যে, সাবিত্রী সত্যই ঝি-ক্লাসের মেয়ে নয়। পুরাণে আছে, একবার লক্ষ্মী দেবীও দায়ে পড়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মত গণিকাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। গণিকার কাছে যে গণিকা দাসী হয়ে আছে, তার চালচলন এবং তার কর্ত্রীর

চালচলন এক না হতেও পারে। এদের দেখা পাওয়া সহজ, কিন্তু ওদের জানার পথে অনেক বাধা।

তোমার ও কথাটাও খুব ঠিক যে, যারা নির্বিকারে স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়ালিস্‌ম্‌ ভাবে তাদের আইডিয়ালিস্‌ম্‌ তো নেই-ই, রিয়ালিস্‌ম্‌ও নেই। আছে শুধু অবিনয় ও মিথ্যা স্পর্ধা—না জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন কথা বললে বাহাদুরি হতে পারে, কিন্তু ও-পথে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

রাজনৈতিক মতামত

শরৎচন্দ্র শুধু যে একজন অপরাজেয় কথাশিল্পীই ছিলেন, তাহা নহে, তিনি মনীষারও অধিকারী ছিলেন। মনীষী শরৎচন্দ্রের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তকে এবং সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার নানা প্রবন্ধে। শুধু কথাসাহিত্যিকরূপে নহে, প্রবন্ধকাররূপেও শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করিতে পারেন।

সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহ পাঠক মহলে সুপরিচিত, কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সহিত বাংলার পাঠক সাধারণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। শরৎচন্দ্র শুধু যে বাংলা, তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, সক্রিয়ভাবে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন এবং অনেক দিন

হাওড়া জিলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। বাংলার এই শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্ত্তে কেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, দেশের মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে কি আদর্শ তিনি পোষণ করিতেন এবং কেনই বা তিনি অবশেষে এ দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বিরূপ হইয়া হাওড়া কংগ্রেস-কমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত কথা আলোচনা না করিলে শরৎচন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল, বহু প্রবন্ধে নিজস্ব অনন্থকরণীয় সরস ভঙ্গিতে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার রচনার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। স্বদেশ ও সাহিত্যের 'স্বদেশ' ভাগে তাঁহার মাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার 'তরুণের বিদ্রোহ'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'নারায়ণে' প্রকাশিত "মহাত্মাজী" ও 'বঙ্গবাণী'তে পুনর্ম্মুদ্রিত "মুসলমান সমাজ" নামক প্রবন্ধ দুইটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হইলেও পাঠক-সমাজের পক্ষে দুরধিগম্য নহে। কিন্তু অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান অনেকে রাখেন না এবং ক্রমেই সেগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্যই আমরা এই শ্রেণীর রচনাগুলি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টে পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম। ইহার মধ্যে কোন কোনটি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য, তাহাতে রাজনীতি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার যাবতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধ একত্রে সংগৃহীত হইয়া প্রকশিত হইলে তাহা বাংলা মনন-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে।

জয়মাল্য

শরৎচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অল্প সাহিত্যিকেরই সে সৌভাগ্য ঘটে। দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক প্রদান করেন। পূর্ব্ব-বারে (ইং ১৯২১) এই পদক রবীন্দ্রনাথকেই সর্ব্বপ্রথম দেওয়া হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সমাবর্ত্তন-উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডি. লিট্' বা সাহিত্যাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। রবীন্দ্র-রচনাকে তিনি আদর্শ করিয়াছিলেন। কবির প্রতি যে শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করিতেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কবি-প্রদত্ত জয়মাল্য তিনি পাইয়াছিলেন। ১৩৪৩ সালের ২৫এ আশ্বিন তারিখে রবিবাসর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। নিম্নে সেই অভিনন্দনের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র—তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ-সভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার

পরিবেষণ-পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।...

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়।...যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের, তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘঠিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে

অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তা-শক্তির বিতর্ক নয়। কল্পন[illegible]ক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্য দান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে স[illegible] করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।—'বিচিত্রা,' অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩।

শরৎচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ছোট কবিতাটি দেশবাসীকে দান করেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'।

—রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে আত্মীয়-বন্ধুকে যে-সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার জীবনীর অমূল্য উপকরণ ; বিশেষতঃ রেঙ্গুনের পত্রগুলি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনেতিহাসে উজ্জ্বল আলোকপাত করে। এই সকল পত্রের অনেকগুলি সাময়িক-পত্র ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা শরৎচন্দ্রের লিখিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় পত্র বা পত্রাংশ নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুন হইতে লিখিত শরৎচন্দ্রের মূল পত্রগুলি দেখিতে ও ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। উপেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রগুলি এই পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হইল। ফণীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রগুলি (শেষের দুইখানি ছাড়া) 'যমুনা' (বৈশাখ-ভাদ্র ১৩৪৪) হইতে এবং প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত পত্র চারিখানি শ্রীনরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত 'পাঠশালা' (কার্ত্তিক ১৩৪৫) হইতে গৃহীত। শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল এক সময়ে 'বেণু'র সম্পাদক ছিলেন ; তিনি 'বেণু'র পৃষ্ঠা হইতে শরৎচন্দ্রের পত্র দুইখানি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। অপরাপর পত্রগুলি যেখান হইতে গৃহীত, তাহার নির্দ্দেশ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

রেঙ্গুনের পত্র

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

10. 1. 13.
D. A. G's Office. Rn.

প্রিয় উপীন,—তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্ব্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে

বেশি দিন রাগ করে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ্ স্বভাব আছে যে একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা' ইচ্ছে করেই করে। ইচ্ছা না করেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের দোষে আর একরকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথা মনে থাকে না। Sensitive বলে একটা কথা আছে আমার সেটা অপর্য্যাপ্ত রকম বেশি। সুরেনকে আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আজ পর্য্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে কেনই বা লেখা বন্ধ করে! তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল করনি। ওটা 'বোঝার' জুড়ি, ছেলে বেলার হাত পাকানর গল্প। ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝাই' যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোটো গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব এবং পাঠাবও। চরিত্রহীন কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হলেও যে সমাজপতির কাছেই পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলিকাতায় থাকিতে, তোমার কাছে পাঠাতাম। ইতিমধ্যে তুমি সমাজপতিকে লিখে দিয়ো 'কাশীনাথ' যেন প্রকাশ না করে। যদি করে ত আমি লজ্জায় বাঁচব না। তুমি দু'একটা

গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?…

এ কথাটা শুধু গোপনে তোমাকেই লিখচি। গিরীন তখন ছোটো ছিল, যখন আমি সংসারের বাইরে চলে আসি। এত বৎসরের পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই। উপীন, আর একটা কথা বলি তোমাকে—একদিন তার একখানা বই কিনতে চাই—তুমি নিষেধ করে বলো যে শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনি নি। একখানা স্পষ্ট করে চেয়েও ছিলাম—অথচ, সে পাঠালে না। ছেলে-বেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন করে দিয়েচি—আমি লিখতাম বলেই তারাও লিখতে সুরু করে। ও বাড়ীর মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁচল থেকে হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না! সে হয়ত মনে করে, আমার মত নির্ব্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না! যাক এজন্য দুঃখ করা নিষ্ফল। সংসারের গতিই বোধ করি এই। আমার শরীর আজ-কাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়া[illegible] প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (*oil pa[illegible]ing*) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে। তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে ত? যদি না থাকে ত ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া—(এদেশ ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি, কিন্তু না টিকাও বরং ভাল, কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এই রকমই মনে হচ্চে। আমার

ফাউনটেন পেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক্—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেচে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হলে যা সাধ্য সংশোধন করে ফণিকে পাঠাব। চিঠির জবাব দিয়ো।—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 26. 4. 13.

শ্রীচরণেষু—তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ করিবে, এই কথাটা যদি আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেই কি তুমি বিশ্বাস করিবে? আমার কলিকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে—আমি অনেক কথাই ভুলি বটে, কিন্তু এ সব কথা এত শীঘ্র ত নয়ই, বোধ করি কোন দিনই ভুলি না। যাই হোক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়া দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে—আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এ কথা আমি ত উপীন, কল্পনা করিতেও পারি না। তবে, এই বলি তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করিতে পার, আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ

কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে? আমার অনেক রকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথা বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ বলিয়া কি এত অধম? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি এই আজ নূতন শুনিলাম। আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ। যদি বেশী দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে যে আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মূর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্ত্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবামাত্রই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না। আমি সুরেনকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এসব ছাপা হইতেছে। তার কারণ, আমিও সমাজপতিকে লিখি ওগুলো আর ছাপাইবেন না—তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়াই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হোক এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমিও যে ওই কথা সমাজপতিকে বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামীর কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরতকে

সত্যই ভালবাসি।" আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

যাক এ কথা। শুধু একটা চন্দ্রনাথ লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি রকম ভাবে ফণী পালের কাগজে বার হবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিক্ না বুঝিয়া, সব দিক্ না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছ। এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি—আর বড় কারু নয়। ফণী পালের জন্য তুমি কতকটা যে false position-এ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি। একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়, অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিসটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে—বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায়···প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই হইতেছে "ভারতবর্ষের" মোড়ল। এখন, দ্বিজবাবু প্রভৃতি, (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে

'যমুনা'তেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও registery চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে ব[illegible], এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকি[illegible]। এমন কি পুরাতন বন্ধু বান্ধব club প্রভৃতি ছাড়িতে হই[illegible] কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই,[illegible]ন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে history জান।

বড় ভাল নই, ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে—অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর এই পত্র সুরেনকে দেখাইয়ো। তোমরা আপোষে যত পার ঝগড়া করিয়া মর, কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম—বয়সের সম্মানটাও অন্ততঃ দিয়ো। সেবক শরৎ

ফণীবাবু উপেনকে এই পত্রখানা আপনি পড়িয়া পাঠাইয়া দিবেন।

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 10. 5. 191[illegible]

প্রিয় উপেন, আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, [illegible]থরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ ইহাতে যে কত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিম্বা দুঃখ করিতেছ না ইহা ইহাতেই বুঝিলাম যে অতি সহজভাবে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম —সেটা কি মিছে কথা? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া

নিজেকে মনে করিব, আমি কি এত বড় আহাম্মক? না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায়? যাক্। B.A., M.A., B.L., এ টাইটেলগুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে, গল্পগুলো তাদের Evening Clubএ অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। D. L. Roy এত প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না। দিদির নারীর মূল্য নাকি "অমূল্য" হইয়াছে। দ্বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবি বাবুরও বোধ করি নাই। [এমন] প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই! সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা। আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ। তবে, আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না। 'চরিত্রহীন' তার কাগজে বার হবে না এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়েছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সেই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু, তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য

হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে! আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই অবশ্য সে ওরকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের কথা নয়, কি নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিকটা (অর্থাৎ ...রা যতদূর পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে, লোক ইচ্ছা করিয়া একটা "মেসের ঝি"কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়া...রে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের ...গিরি করিলাম। আর এক কথা—প্রমথ বলিতেছে, ভারতবর্ষকে ... যেন নিজের কাগজ বলিয়া মনে করি—এবং সেইরূপ করি। ...মি প্রমথকে কথা দিয়াছি আমার সাধ্যমত করিব, কিন্তু সা... ...তটুকু তাহা বলি নাই। আরো এক কথা—তাহারা দাম ...রা লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না, কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখাই পাওয়া যায় না, এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে। যাই হোক—চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা দিবে না, কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর

কিছু নয়। তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক। তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোর জবরদস্তিকে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সম্বাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্রও কান দিই নাই হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমি ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে। 'পথ নির্দ্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ নির্দ্দেশ'টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায়, পথ নির্দ্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও রকম গোলযোগ circumstance-এর ভেতরে খেই হারাইয়া একটা হ-জ-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের মত দুটো গল্পই superlative degree-তে Excellent! দ্বিজুবাবু বলেন গল্পের আদর্শ! ফণীর কাগজে

প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু বার হয় তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট করে যেন লিখতেই পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত চন্দ্রনাথকে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি অবশ্য গল্প (plot) ঠিক তাই থাকবে। তার পরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনায় বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার। তা না হলে শুধু গল্পেতেই কাগজ যথার্থ "বড়" বলে লোকে স্বীকার করে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য করেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে। যদি গল্প লেখার কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখচি রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখতে পারি না এবং পড়াশুনার ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী বলে ঠাট্টা করবে। আবার অন্য কাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে টাকা নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসচে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যেই দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে সুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত—এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না তা সেই জানে। আমি জানি না।

তোমার ক্রয় বিক্রয় গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি করে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা করে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন এদের জন্যও আমার কলম ঠিক করে রেখেচি—একদিন পাঠিয়ে দেব।

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে? তাকে জবাব দিতে পারিনি সে কোথায় আছে জানিতে পারি নাই বলিয়া। ফটো ত আমার নাই—কোন দিন ও কথা মনেও হয় নি। আচ্ছা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

হাঁ আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি একটা written statement পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্‌টা মিথ্যা। যাই হোক লোকটা যখন deny কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ।

ফণীন্দ্রবাবু, আপনার তার পাইয়া জবাব দিই নাই। কারণ জবাব দিবার ঠিক জিনিসটা আমার হাতছাড়া। তবে আশা করি শীঘ্র হাতে আসিবে।

আগামী মেলে সমালোচনা, নারীর মূল্য পাঠাইব। পরের মেলে চন্দ্রনাথ ও আর একটা যা হয় কিছু। চরিত্রহীন যাতে যমুনায় বার হয় তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন্। তবে শুনিতেছি, ওটাতে 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে, তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা artএর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু, নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই। এবং এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আঃ শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
২২শে আগস্ট '১৩, Rangoon.

প্রিয় উপীন, অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেক দিন আমাকে কোন সম্বাদই তোমার দাও নাই। নাই দাও, সে জন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবতঃ আবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কাষ নাই—"। আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেক দিন পড়ি নাই। হয়ত তোমার best এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিক্‌টা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র! মধুর, অতি মধুর! এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি? বড় ভালো হয়েচে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। যেন মাঝে মাঝে এমনি গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এতবড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু, আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোরো না গর্ব্ব করচি—কিন্তু আমার আত্ম-নির্ভরই বল, আর prideই বল, এই আমার নিজের ধারণা। এমন গল্প অনেক দিন পড়ি নি, শুনেচি, তোমার আর একটি বড় এবং ভালো গল্প ভারতবর্ষে বেরিয়েচে। ভারতবর্ষ এখনো এসে পৌঁছে নি, বলিতে পারি না সেটি কেমন, কিন্তু যদি ভাবে মাধুর্য্যে এমনটি হয়ে থাকে তা হলে সেও নিশ্চয় খুব ভাল গল্পই হয়েচে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এমনি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এমনি অধিকার থাকত তা হলে বোধ করি আমার গল্প আরো ভাল হত। অবশ্য আমি

নিজের সহিত তোমার তুলনা করচি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে, কিন্তু খুসী হলে আমি আর রেখে চেপে বলতে পারিনে।

কেমন আছ আজকাল? আমি বড় ভাল নই—এই বর্ষা কালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি শরৎ

[প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত]

D. A. G's Office, Rangoon.
22. 3. 12.

প্রমথ,—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি। এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশি জবাবদিহি করা বাহুল্য।…

…আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাইরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় কোনো মতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript ; "নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০|৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।

ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসরে publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। "চরিত্রহীন" ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।...

...আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart diseaseএর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil-painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, History, Painting—কোন্‌টা ? কোন্‌টা আবার সুরু করি বলত ?

তোমার স্নেহের শরৎ।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম—তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস। আমি এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি।...প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব, মাপ করবে ?

যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, যখন এই কথাটা

মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্ব্বে । এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না, আমি সত্য চাই।...

১৭ই এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। আজ জবাব দিতেছি। ...তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীন'-এর যতটা আবার লিখিয়াছিলাম (আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনও কিছু বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে।...আমার এসব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে!...তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে [ভারতবর্ষ] ছাপার উপযুক্ত, তা' হলে হয়তো ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] মত করিবেন কি না বলা যায় না।

যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে একটা কথা বলি, শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়াই চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethicsএর student, সত্য student, Ethies বুঝি, এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো। তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়।···যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো। আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই। আমি যা' তা' যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না। গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের যমুনা কেমন লাগল? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো।—

২৪শে মে, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazette-এ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে কম জানিতাম তাহা নহে, অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না।···

তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য নিশ্চয় করিতাম,···তিনি সাহিত্যিক এবং যোদ্ধা ছিলেন। তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন এবং না বুঝিলেও তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল

বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না, অভিমানও হইত না। কিন্তু এখন যে সে আমার দাম কষিবে! হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়, হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা file কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর। তুমি আমার কত বড় সুহৃদ্ তাহা আমি জানি। সে কথাটা একদিনের তরেও ভুলিব না, তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই, এর বেশি আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা—চরিত্রহীন সম্বন্ধে।···লিখিয়াছেন,···বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন—ওটা এতই নাকি inmoral যে, কোন কাগজেই নাকি বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে, কারণ তোমরা আমার শত্রু নও যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে, আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব এই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে।···

···আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকে যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক।—যাক এ কথা। 'কাল'ই আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দুই-ই করিবে, সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল।···আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা' ছাড়া সব রকমই পারি।···আমি সম্পাদকের কাছে নিজের লেখা যাচাই করিতে পারিই না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া।

[ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত]

S. Chatterji
D. A. G's Office, Rangoon.
[জানুয়ারি ১৯১৩]

ফণীবাবু,—আপনাদের সম্বাদ কি? সদাসর্ব্বদা চিঠি দিতে ভুলবেন না। আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি করব। উপীন কোথায়? ভবানীপুরে কবে আসবে? আমাকে 'চন্দ্রনাথ' কবে পাঠাবে? আমাকে আপনি যা করতে হবে বলবেন। না বললে আমার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ হবে না। এসে পর্য্যন্ত আমি আমাশা ও জ্বরে ভুগচি না হ'লে এত দিনে হয়ত কিছু লিখতাম। যা হোক একটা চিঠি দেবেন। সৌরীনকে আমার কথা মনে করিয়া দিবেন। শরৎ

রেঙ্গুন, [মাঘ] ১৯১৩

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু,—'রামের সুমতি গল্পটার শেষ' পাঠালাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হ'তে পারবে না, কিন্তু হ'লে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প, খণ্ডশঃ প্রকাশ করার তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই গল্প ছোট করে

(১০।১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই কেননা, আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।···

আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সে দিকে চোখ রাখব। আর এক কথা আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু আধটু আলোচনা থাকতে পায় সুবিধা হয়। এবারের সাহিত্যে আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হলেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলা অনেক লেখে সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেচেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েচেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি—আপনার কাগজ ত এক ফোঁটা ওরকম ৩।৪ গুণ কাগজও একলা ভরে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম subject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি। 'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিম্বা একেবারে ছাপাবেন॰আমাকে লিখে জানাবেন। তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।

চরিত্রহীন প্রায় সমাধার দিকে পৌঁছেচে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারিনে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।···

আর একটা কথা—আপনি যমুনা ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্ব্বাচন করে দিতেও পারি। পৌষের যমুনা বড় ভাল হয় নি। শেষের গল্পটা সুবিধের নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে (ডাক টিকিট) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক্ থেকে ফেরৎ পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি সুধু গল্পই লিখিনে। সব রকমই পারি শুধু পদ্য পারিনে। আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিম্বা উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে 'নিরুপমা দেবী'র রচনা—কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা (রচনা না হয় কবিতা) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি সেই মত কাজও করব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌঁছায় নি। তা ছাড়া এ আমার পেশা নয়; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হতেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে পারিলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোন মতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার কথা এই পর্য্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায় পড়বার উপযুক্ত জিনিস থাকবে এ কথা প্রকাশ করে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল—একটু ক্ষতি স্বীকার করেও তাতে অনেকটা advertisement-এর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেক বার লিখলে সে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না তাই। তবে আপনি যদি 'চন্দ্রনাথটা' ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন ক'রে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিষটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েচে—সুতরাং নূতন করে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।...

আঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

*

রেঙ্গুন, ১২।২।১৩

প্রিয় ফণীবাবু,—এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা 'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়পত্র প্রভৃতি করে অর্থশূন্য বাজে [illegible] ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিষ থাকে দুদিনে হোক দশ দিনে হোক সে কথা আপনি প্রচার হয়ে যাবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস করে গ্রাহক যোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।

দ্বিতীয় কথা—'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে

একেবারে বার করতে পারলেই বড় ভাল হোতো। কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প "ক্রমশঃ" বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয়নি তার জন্যে আলোচনা বৃথা। আমি দু একদিনের মধ্যে আর একটা গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল তবে দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়েচে। এত চেষ্টা করেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা করে দেখি কি হয়।

৩য় কথা—'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই। 'চরিত্রহীন' বার করা যাবে। অবশ্য সে জন্য কাগজ কিছু বড় করা চাই—কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় করে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা—সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাকে খোসামোদ করতে বলি নি। ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, একদিন পরে হোক পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হলে হাজার চেষ্টাতে দোকান চলবে না—দু চার দিনে হোক মাসে হোক ফেল হ'তে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাই-পাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারিনে। সমাজপতি সমজদার লোক হয়ে কেমন করে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য !

৫ম কথা—সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন ? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি ? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন না ? কিন্তু আমার দোষ কি ? যিনি

লিখেছেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এ সব লেখা ছোট টাইপে ছেপেচেন ত?

৬ষ্ঠ—আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু এক দিনের মধ্যেই পাঠাব) কোন্ মাসে ছাপাবেন? চৈত্রে 'রামের সুমতি' শেষ হবে, সুতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন, ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিষ পড়তে পাবে।

৭ম—বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছুনে মেলাই কতগুলো টাকা নষ্ট না করে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না, গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাসান হয় তা হলে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে শুনে দিতে পারি। খাতিরে পড়ে ছাই মাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাই মাটি দেওয়া দুই মন্দ।

৮ম—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া করে, আপনাকে দেন, সে ত নিশ্চয়ই ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি ভারতীতে লেখেন আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয় ত অশ্রদ্ধা করে যা তা লিখবেন। এঁরা সব বড় লেখিকা এঁদের হয় তো যমুনার মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা করে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হলে লোকে মনে করবে, এই লোকটা ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে একজন বন্ধু আছেন তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী B.A., তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই, কেন না কোন মাসিক পত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি—আমাদের যমুনার জন্য লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা, এই যমুনা আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছুদিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে, এবং প্রমাণ করে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না—) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হলে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্য কিছু করবেন না মতলব করেচেন, তখন এই জিনিষটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে 'বিষয়বুদ্ধি' বলে, তাও অবহেলা করবেন না। প্রবাসী প্রভৃতি এক সময়ে কত ছোট কাগজ এখন কত বড় হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন কিন্তু আমার বাঙ্গালা বই নাই। মাসিক পত্রও একটাও লই না—আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি যদি তাই হয়, তা হলেও চিন্তার কথা কিছু নাই—আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিষ আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোন দিন বা আপনার জন্য কোন দিন বা চরিত্রহীনের জন্য নষ্ট হচ্চে। রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠচে না। আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধরে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছা করে, H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo : একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালেচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencer-এর শত্রু মিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়) অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ রকম জোগাড় করে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্ব্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ বলে মনে করবেন। লেখা Registery করেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্য দশা নয় যে এর জন্য খরচ নিতে হবে। এসব কথা আর লিখবেন না।

আশীর্ব্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—সেই আমার পারিতোষিক হবে।

চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠি পত্র লেখবার লোক নয়। সে থাকলে ঢের সুবিধে ছিল—না থাকে বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল—যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।...আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home, সত্যি না? একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন।

ইতি শরৎচন্দ্র চট্টো।

[চৈত্র ১৩১৯]

প্রিয় ফণিবাবু,—আপনার প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটী মন্দ নয় দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনিই প্রকাশ হয়। অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি—আর যে বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন। আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ কেহ সম্মানের লোভ কেহ বা দুইই কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ

যমুনা পাঠান B. Promathanath Bhattacharji. 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র যমুমা তাঁকে দিন—তিনি তাঁর দল আমার কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন। আরও এই একটা কথা যে, আমি নিয়মিত যমুনা ছাড়া আর কোথাও লিখিব না তাহাতেও একটা কাজ হইবে। আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই সে কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশী ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে মানসীর শ্রীযুক্ত ফকির বাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কতদিন শ্রাদ্ধ "সাহিত্য" কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথের' অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয় উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে এই জন্যই কোন মতে সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তা হলেই সারা হব দেখচি। আরও

একটা আপনাকে বলি। সে দিন গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাটাতে এবং কাশীনাথের সাহিত্যে প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এই জন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মৎলব করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no' আমি তার পরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা তা গল্প ছাপা নয় অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই) সেই জন্য সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া Grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত এটা সংসারের ধর্ম্ম! এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় বলে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই—জরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারল? ইতি আপনাদের স্নেহের শরৎ

14 Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon, 3. 5. 13.

প্রিয় ফণীবাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্ত্তন উচিত মনে করিয়াছি তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্ব্বে শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই, যে কোনরূপ—Immoralityর সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। "চরিত্রহীন" Artএর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে, নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এরকম ধরণের নয়।

চরিত্রহীনের জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব। আমার এবং আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। আমার বয়স হইয়াছে—এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন। 'যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশী লক্ষ্য, তার পরে আর কিছু। চরিত্রহীন সেই অর্দ্ধেক লেখা হইয়াই আছে—কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। চন্দ্রনাথটা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তার চেষ্টা করতেই হবে—কারণ সেটা already প্রকাশ করা হয়েছে। এ বৎসর যাতে যমুনা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সব চেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর বৎসর আকারটা আরো বৃদ্ধি করে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশী? [illegible] লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম তা হলে 'যমুনা'র সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হত না, কিন্তু অসুখের জন্য লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব—কিন্তু, আমার ক্ষমতা বড়ই কম হয়ে গেছে। খাটতে পারিনে। আর একটা সমালোচনা লিখচি—দু-তিন দিনেই শেষ হবে। ঋতেন্দ্র

ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের সাহিত্যে তিনি উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না ঋতেন্দ্র ঠাকুরের সহিত যমুনার কিরূপ সম্বন্ধ—যদি উচিত বিবেচনা করেন, ছাপাবেন, না হয় সাহিত্যে দেবেন। না, সে গল্প আজও পাইনি। নিরুপমা দেবীর কোন লেখা পেলেন কি ? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন তা হলে খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন তা হলে তো ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। সুরেন, গিরীন উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কি না জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়—কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্প টল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তা হলে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগেও না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর করে লেখা। জোর জবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না। প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ করে D. L. Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজই মনে করি। এর ক্ষতি করে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েচি। সেও—Acquaintance নয়, পরম বন্ধু।

চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হলে আর কি। প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২'৫। জ্বর রেঙ্গুনে হয় না—কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত, General health এদেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না।

ইতি আঃ শরৎ।
২৮শে মার্চ্চ ১৯১৩
রেঙ্গুন

প্রিয় ফণীবাবু—এই মাত্র আপনার রেজেষ্ট্রী প্যাকেট পাইলাম। যদি Registry করেন, তবে বাড়ীতে পাঠান কেন? আফিসের ঠিকানাই ভাল—কেন না বাড়িতে যখন পিয়ন যায় তখন আমি আফিসে থাকি। যদি Unregistered পাঠান তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ দুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব। বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ। যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান—(১) পথনির্দ্দেশ, (২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন করে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় চরিত্রহীন না হয় চন্দ্রনাথ আরও বড় এবং ভাল করে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখ্‌তেছি। অবশ্য আপনার Claim যে আমার উপর First তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে কটা দিন বাঁচিয়া আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

এ যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা। যা হৌক লিখব—অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়! অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশী কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না। যা হোক আপনার বৈশাখটা গোলেমালে এক রকম বার হয়ে যাক্, তার পরের মাস থেকে দেখা যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা। আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ করে দেবেন—যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, তাতে বেশী নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ—কটা লোকেই বা পড়ে? অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই সত্য এবং সচরাচর সকলেই সেইরূপ করে। কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রমও আছে এবং একটু আত্মনির্ভরও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমিও সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি—সেইটাকেই বেশী লাভ মনে করি। তা ছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম

করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু, সমস্তটাই দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে। 'পথনির্দ্দেশটা' সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা, 'নারীর লেখায়' বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক যায়গায় 'অনুরূপা'র বদলে 'আমোদিনী'র নাম হইয়া গিয়াছে। "ভূমার সঙ্গে ভূমির" ইত্যাদি এটা অনুরূপার আমোদিনীর নয়। নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশী পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে। শরৎ

প্রিয় ফণীবাবু—আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলার সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না। আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই—সুতরাং এই দিক্‌টায় একটু চেষ্টা করিব,—অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ V. P. P. ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া delivery লইব। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য,' 'মানসী', 'ভারতী'। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না— অত লেখাই বা কোথায়? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক নাই। বরং লজ্জা

পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না। মুখ ফুটিয়া এ কথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি—ঠিকানা 14 Lower Pozoung Street. বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লাবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা। আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ। কিছু মনে করিবেন না—আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাগার খাটিতে বলি। অন্য মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি শরৎ

14 Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon [বৈশাখ ১৩২০]

প্রিয় ফণীবাবু,—গত মেলে চন্দ্রনাথের কতকটা পাঠাইয়াছি। আগামী মেলে আরও কতকটা পাঠাইব। অত্যন্ত পীড়িত। জ্যৈষ্ঠের "যমুনার" জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। মাথার যন্ত্রণা এত অধিক যে কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। অক্ষরের দিকে তাকাইবা মাত্রই কষ্ট হয়। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম্ম পড়াশুনা সবই স্থগিত রাখিয়াছি। সৌরীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবেন—এই ত ব্যাপার। যা হয় এ মাসটা একরকমে চালান—ভাল হলে আষাঢ়ের জন্য আর চিন্তা থাকিবে না। আমি সৌরীনকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না—তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন পড়িয়া সত্যই ভারী খুসী হইয়াছি। আমাকে কাছে ডাকিয়াছেন—দেখি। এমন সব বন্ধু যার তার বড় সৌভাগ্য।

"চরিত্রহীন" অর্দ্ধলিখিত অবস্থাতেই প্রমথকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছি। পুনঃ পুনঃ পীড়াপিড়ি করাতেই—আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ফিরিয়া পাইলে বাকীটা লিখিব। গল্প এ মাসে আর পারিব না—কেন না সময় নাই। একটা সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ করিতে পারিলাম না। যদি শেষ হয় আপনার হাতে আসিতে ২৬ তারিখ হইয়া যাইবে—সুতরাং এ মাসে কাজে আসিবে না। বাস্তবিক বড় ভাবিত থাকিলাম—অনেক চেষ্টা করিয়াও লিখিতে পারিতেছি না। কেহ যদি লিখিয়া লইবার থাকিত তাহা হইলে বলিয়া যাইতে পারিতাম। তাও কাহাকে পাই না। বৈশাখের "যমুনা" সত্যই ভাল হইয়াছে। সৌরীনের গল্পটী বেশ। প্রবন্ধটীও ভাল। শরৎ

রেঙ্গুন, ১৪-৯-১৩

প্রিয়বরেষু,—আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।...উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিনই নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙ্গাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করিতাম, এত দিন এমন চুপ করিয়া থাকিতাম না।...আরো একটা কথা এই যে, শতদ্বারী

চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মিত লিখি এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালবাসে সে এই কাগজই পড়িবে এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথি ডোজে এতে একটু ওতে একটু অশ্রদ্ধা ক'রে যা-তা ক'রে, তর্জ্জমা করে, পরের ভাব চুরি ক'রে—এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।···আমার ছোট গল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি না। 'বিন্দুর ছেলে' আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ sincere হওয়া চাই—যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন, তাতে পাঠক যাই বলুক। 'নারীর মূল্য' আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি, ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।···চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকীটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কাপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত

পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে হয়। আর moral সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক ধারণা করাও শক্ত। Inmoral-ত' লোকে বলিতেছেই—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যা-কিছু বাস্তবিক ভাল, তাতে এর চেয়ে ঢের বেশী inmoral ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যাই হোক, সাহিত্যিকদের মতামত আমাকে জানাইয়া দিবে।···
('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

রেঙ্গুন, ১০-১০-১৩

প্রিয়বরেষু,—তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি' পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার···য় এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই, আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির pathos; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই healthy নয়। ছোট গল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।···

দুই একটা কথা ‘চরিত্রহীন’ সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে শুনিলেই আমাকে জানাইবে। এই বইখানার বিষয়ে এত লোকের এত রকম অভিপ্রায় যে ঐ [moral] হৌক [immoral] হৌক, লোকে যেন বলে, “হ্যাঁ একটা লেখা বটে।” আর এতে আপনার বদ্‌নামের ভয় কি? বদ্‌নাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? “চরিত্রহীন” এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলস্টয়ের “রিসরেকৃসন্” তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া, ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে! কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?—টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামীর অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।···একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্য-সভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই।—(‘যুগান্তর’, ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

Rangoon, 15. 11. 15.

প্রিয়বরেষু—···“শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী” যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না।

তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ, তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো। যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্য্যন্তই। তবে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।...অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।... রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন! যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাইই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই শেষে টের পায়, না, তা' নয়। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম

অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।...যাই হোক শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে আমাকে জানাবেন। তত দিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখব না।

আমি আবার একটা গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। ভালই হবে। comedy হবে, tragedy নয়। দেখি কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবুর' ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ'। তবে ধরবার যো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমারও মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার যো নেই।...

54/36th Street, Rangoon.

22. 2. 16.

অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোনদিন এও ছাড়ে না তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবান্‌ই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।...মানসিক চঞ্চলতাবশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই—এই কথাটি জলধর দাদাকে জানাইয়া এই 'সমাজ ধর্ম্মের মূল্য' পড়িতে দিবেন।

ইহার fair copy করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম—বাকী লেখা fair করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তার পরে যাহা লিখিব ম করিয়াছি তাহা শুদ্ধমাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়মকানুনে সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটি তুলনামূলক সমালোচ ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সে দিকে কোনরূপ ব্যক্তিগ সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ছাপাইবা তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফের পাঠাইবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের ম করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বা দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক, ভায়া, এই Sociolog লইয়াই বহু দিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণট যেন আনচান্ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বে ভদ্রলোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।···

জলধরদাকে অনেক আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু গল্প লেখ মানসিক সুস্থিরতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমা চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে হয়ত বা, তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয় মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এ কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—হয় ত ব শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল! ছেলেবেলায় ভগবান্‌কে বা ভালবাসিতাম—মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম, আবা শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।···

[মার্চ ১৯১৬]

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজকাল সপ্তাহে মাত্র একখানি করিয়া জাহাজ যায় বলিয়া জবাবে এত দেরি হইল।

আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান্ আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটা বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন। তবে, এর একটা দোষ এই যে হজম করিবার শক্তিও নাশ হইয়া আসিতে থাকে। এইটাই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পোষাইয়া লওয়া চাই।

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই, তাহা হইলে হয়ত বা টাকা কড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।...আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব, তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।...আপনি আমাকে ৩০০৲ তিন শ টাকা পাঠাইয়া দেবেন। তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি।... এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া আপনার আমার জন্য এই

সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।

আমি একটু ভাল আছি। ফোলাটা একটু কম। কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া দেখিতেছি। এটা ভাল কি মন্দ আগামী পূর্ণিমা নাগাদ টের পাইব। আমার কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্ব্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়ম-কানুন সবই বড় সাহেবের মর্জ্জি। যাই পাই—আপনি যা আমাকে দিবেন সেই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।

[মার্চ ১৯১৬ ?]

…কাল আপনার দেওয়া তিনশ টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্ব্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। দেখি কি হয়।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত]

[ডিসেম্বর ১৯০৫]

প্রিয় সুধীর,—কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না ? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু' এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া সুরু করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেই আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই এতটা যাবে। হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, rewrite করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার

তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক Copy আমি পাই নি। যদি Registry করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অতি অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—('আনন্দবাজার পত্রিকা,' ৮ মাঘ ১৩৪৪)

[১৪ মার্চ ১৯১৬]

…শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্ব্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আমার আছে—সেইগুলাই কোনমতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এত দিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতেছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইয়ো। আমি কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওয়ানা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও

বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।...বেশ ত আসতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাবে কি? ('আনন্দ-বাজার পত্রিকা,' ৮ মাঘ ১৩৪৪)।

['প্রবাহ', আশ্বিন ১৩৪৫ হইতে]

54, 36th Street,

রেঙ্গুন, ১০. ৩. ১৬.

পরমকল্যাণবরেষু—আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমার সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া ধৃষ্টতা মনে করিব, এত বড় উঁচু মন আমার নাই।

তবে, আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, আজকাল ১০।১২ দিনের মধ্যে মেল থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, আমি বড় পীড়িত।

অবশ্য আমার এ বয়সে আর অসুখ বিসুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শোভা পায় না, তবুও প্রাণের মায়াটা ত কাটিতে চায় না—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া ক্লেশের ও-পারে গিয়া এসব ঘটিলেই সব দিকেই দেখিতে ভাল হইত। নিজের মনটাও আর খুঁত খুঁত করিতে পারিত না। কিন্তু সে কথা থাক্।

পল্লীসমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটায় অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে

তাহা লিখিয়াছি—স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরি বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুল তত হয় না, যত কলিকাতা বা শহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।

তার পরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি?

তবুও, মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া,—বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে। একটা বড় দরকারী জিনিষ। এই ধরণের দু'টা চারটা কথা।

বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলা হয়ত আপনার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।—যদি আপনার ধৈর্য্য রাখা সম্ভবপর হয়, আর একবার তাঁর কথাগুলায় চোখ বুলাইয়া লইলে যেগুলা প্রথমে নজরে পড়িতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে হয়ত চোখে লাগিতেও পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, চোখে পড়িলেও সে সব কথার এমন কিছু সত্যকার মূল্য নাই, যার জন্য আর একবার পড়িয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। সেটা আপনার ইচ্ছা।

একে একে মোটের উপর প্রায় সব কথাই হইল। বাকি রহিল শুধু ঐ শিষ্যত্বের কথাটা।

গুরু হইবার ভারি শক্তি ছিল আমার বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই। তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে, তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও এক সময়ে লেখা পড়িয়া কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং পথ দেখাইয়া দিয়াছি।

তার পর যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ ক্ষমতাটা ততই হারাইয়াছি। এখন—আজকাল একেবারেই আর নাই। আমি শিখাইব আপনাদের এ কথা আর ত মনে আনিতেই পারি না।

এ পত্র যত দিনে আপনার হাতে পড়িবে, [illegible] সময় আমিও সম্ভবতঃ তোড়জোড় বাঁধিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া জা[illegible] চড়িব। দেহটা যদি দেশ বদলাইলে একটু সারে এই আশা।

আর একবার বুড়া মানুষের আশীর্ব্বাদ গ্রহ[illegible]রিবেন। ইতি—

বিবিধ পত্র

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

266, Sivalaya, Benares City.
7. 4. 20.

পরম কল্যাণবরেষু, আপনার পত্র পাইলাম। এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে আর এক মুহূর্ত্ত মন টেকে না এমন হইয়াছে। কাল-ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাস যাওয়া যায় না—একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর।

এক ছত্র লেখা বার হয় না এ কি বিশ্রী দেশ। গত চার পাঁচ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি আর ঘণ্টা দুই চুপ করে বসে উঠে পড়ি। এখন মনে হচ্ছে বুঝি বা আর কখনো লিখতেই পারব না। যা ছিল হয়ত বা ফুরিয়েই গেছে—কে জানে! একটা বড় মজার খবর আছে। এখানে ভৃগু-সংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন—তিনি আমার কুষ্ঠি গুণে নিজেও হাঁ করে রয়ে গেলেন আমিও হাঁ করে রয়ে গেলুম! আমার অতীত জীবন (যে আজও কেউ জানে না) অক্ষরে অক্ষরে এমন বলতে লাগলেন, আবার ভবিষ্যৎ জীবন আরও বিভীষণ! তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন, এ কোন মহাযোগীর না হয় রাজতুল্য কোন ব্যক্তির কুণ্ডলী। অবশ্য আমি নিজের identity গোপন করেই রেখেছিলাম। লোকটার ভারী পসার, খুব রোজগার—তারা বসেই রইল, পণ্ডিতজী আমাকে নিয়ে পড়লেন, পারিশ্রমিক ত নিলেন না—বারম্বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ইনি কে এবং কোথায় আছেন। ধর্ম্মস্থানে বৃহস্পতি

এতবড় পরিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি। আচ্ছা ভায়া, এ যদি সত্য হয় ত আমার মত নাস্তিকের ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা, এ কি কঠোর পরিহাস বলুন ত? আয়ু কিন্তু ৪৮ কিম্বা বড় জোর ৫৬। তিনি সম্ভ্রমের আতিশয্যে মৃত্যু বল্‌লেন না—উচ্চারণ করতেই পারলেন না। বল্‌তে লাগলেন, এঁর যদি ৪৮এ মোক্ষ না হয় ত তার পরে সংসার ত্যাগ করে ৫৬তে দেহত্যাগ করবেন! তবে রক্ষে এই যে সত্যি হবে না তা বেশ জানি। কিন্তু অতীত কি করে এমন বর্ণে বর্ণে সত্যি বল্‌তে পারলেন আমি ক্রমাগত তখন থেকেই তাই ভাবছি। কি জানি ভাবতে ভাবতে বুড়ো বয়সে আবার না সেই উটের দলে গিয়ে মিশি! —শরৎদা

আমাকে আপনারা এখন থেকে "সমীহ" করে চল্‌বেন। নিশ্চয়ই একটা "কেউ-কেটা" নয়—চাই কি শাপ-মন্যি দিয়ে ভস্ম করেও দিতে পারি। এখানে আরও একজন নামজাদা গণৎকার *আছেন—সুধীর ভাদুড়ী। ইনিও গণনা করলেন—আমি যে একটা ভয়ানক ধার্মিক লোক এ সত্য ইনিও আবিষ্কার করেছেন! দেখ্‌ছি আবার সেই দলে নিয়ে আমাকে ভেড়ালে!—('খেয়া', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫২)

সামতা বেড়, পাণিত্রাস, হাবড়া। ৭ আষাঢ়, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,…গত বুধবার আমার জ্বর হয়, আজ আট দিন পরেও জ্বর ছাড়ে নি,…আপনি দত্তার অভিনয় স্বত্ব চেয়েছিলেন অতএব আমি খুসি হয়েই দিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে বিজয়া নাটক এত দিন শেষ করে আনতাম।

আপনি অপরকে দিয়ে সেটা লেখাতে চাইচেন, কিন্তু সে কি

আমার চেয়েও শীঘ্র পেরে উঠবে? ওর দেখেচি অনেক অসুবিধা আছে, মাঝখানে গ্রন্থকার নিজে না হলে সে যে বিশেষ ভাল হবে তাও ভরসা করি নে। আমার নিজের লেখা হলে সে বাধা থাকে না এবং আমিও একখানা নাটক 'বিজয়া' নাম দিয়ে ছাপাতে পারি; পরের তৈরি হলে তো পারবো না। Cinemaর ব্যাপারে আমার কোন গরজ নেই।

* * *

অথচ, আপনাদের বিলম্ব হলে—(অর্থাৎ বিজয়ার আশায়), —বহু ক্ষতি। অভিনেতাদের মাইনে দিতে হচ্চে নিরর্থক। এ অবস্থায় কি যে করবো বুঝতে পারি নে। অথচ, সমস্ত বইটাই এক রকম তৈরি করা আছে, শুধু একটু অদল বদল বা অল্পস্বল্প লিখে কপি করানো। যদি ইতিমধ্যে ভাল হয়ে উঠি নিশ্চয়ই করে তুলবো। কিছুদিন পূর্ব্বে যদি এ মৎলব করতেন ভাবনাই ছিল না।···

পুঃ। প্রথম অংশটা দেখবার জন্য তুলুর হাতে পাঠালাম। এটা দেখে যদি মনে করেন বাকি অংশটা আপনি লেখাতে পারবেন তা হলে আমাকে জানাবেন।—('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)

[শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত]

বাজে-শিবপুর, হাওড়া

২৮. ৩. ২৫.

তোমার চিঠি পড়িলাম। এবার কাশীতে গিয়া এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও, কেবল তোমাকেই শুধু আত্মীয় বলিয়া মনে

হইয়াছিল। অথচ কিছুই তোমার জানিতাম না। এই পত্র পড়িতে সময় কিছু নষ্ট হইল বটে, কিন্তু সময় কি শুধুই প্রহর দণ্ড পল বিপল? তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়? সে। দিয়া তোমার এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে এবং আমার পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুই নষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয়ই হইল···মেয়েদের ২৩ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সঙ্কটজনক সময়, কারণ ২২।২৩এর পরে, যখন সত্যকার প্রেম জাগ্রত হয়—তখন কেবল আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে ইহার সকল ক্ষুধা মেটে না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক্—শারীরিক দিক্। কিন্তু আর একটা বড় দিক্ আছে—সেইটাই চিরদিনের মীমাংসাবিহীন সমস্যা। সংসারে সচরাচর এরূপ ঘটে না, কিন্তু যে দুই চারি জনের অদৃষ্টে ঘটে, তাহাদের মত ভাগ্যবান্‌ও নাই—দুর্ভাগাও নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্যজগতের সকল মাধুর্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে···অথচ এত বড় সত্যও আর নাই—

সুখ দুখ দুটি ভাই—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।

···সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে।···তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবি সন্তানের কথাটা সব চেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতি বড় প্রেমেরও নাই।···একটা কথা।—যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশী। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না। পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া

পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না।···সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।···

ইং ১৯২৫

···সত্যকার ভালবাসার জন্য জগতে দুঃখভোগ নাকি করিতে হয়। কেহ না করিলে সমাজের অর্থহীন অবিচারের প্রতিবিধান হইবে কিসে? সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া, আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এই কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।·· —('সাহানা', বৈশাখ ১৩৪৬)

[শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লিখিত]

সামতাবেড়

৭ মাঘ, ১৩৩৪

প্রিয়বরেষু···আমার উপন্যাসগুলোর দোষ এই যে নাটক তৈরি করতে গেলে বহু স্থানেই একেবারে নতুন কোরে লিখতে হয়। বাইরের লোকের মুস্কিল এই যে, তাঁরা তো নতুন কিছু দিতে পারেন না, শুধু বইয়েতেই যে কথাগুলো আছে, তাই নাড়া-চাড়া কোরেই যা হোক কিছু একটা খাড়া করতে বাধ্য হন। সেই জন্যে প্রায়ই দেখি ভালো হয় না।···('মাসিক বসুমতী,' মাঘ ১৩৪৪)

[শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত]

আষাঢ়, ১৩৩৫

মণ্টু,—···অমুকের প্রবন্ধগুলো পড়লাম। ছেলেমানুষের লেখা, এর ভালো মন্দ এখনো সময় আসে নি।···অল্প বয়সে গল্প

লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়।…তুমি অত দ্রুতবেগে লিখতে বারণ কোরো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর qualification, লেখকের নয়।…মেয়েটির লেখা পড়ে মনে হয় ভারি বুদ্ধিমতী। কিন্তু জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায়, তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া পর্য্যন্ত জানা যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, অভিজ্ঞতা দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল [illegible] দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকতেই কতক[illegible]লো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেছি যে, কম বয়সে যা লেখা যায়, তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যে ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিকও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশি বয়সে লেখক যখন লিখতে যায়, ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তা[illegible] হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান, বিদ্যে, বুদ্ধির দিক [illegible]য়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক, রসের দিক্ দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘট[illegible]তে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস, যৌবন উত্তীর্ণ করে দিয়ে যে ব্যক্তি রসসৃষ্টির আয়োজন করে, সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই, যার পরে কাব্য বলো, উপন্যাস বলো, আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্ছে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।—('স্বদেশী বাজার,' শরৎ-সংখ্যা, ১৩ আশ্বিন ১৩৩৫।)

২২ ভাদ্র, ১৩৩৬

মণ্টু,—···তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ যে, "সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই রসের নিমন্ত্রণসভায় বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড়লোক বলি তাদের জন্যেই।" কথাটা শুনতে ভালো এবং যিনি লেখেন, তাঁর মানসিক ঔদার্য্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এত বড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা সভ্যতা কালচারের জন্যে সন্দেশই যে চাই, মণ্টু! সত্যিকারের শিক্ষিত সুকুমারহৃদয় মানুষকে যদি চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াও তারা কি পেট কামড়ানিতে সারা হবে না? আর সর্ব্বসাধারণ? অন্ততঃ আজকের দিনে তাদের সন্দেশ দেবে কি ক'রে বল তো—রাতারাতি? আজকের দিনে তারা চিঁড়ে মুড়কিতেই খুসী হবে এ কথা অস্বীকার করবে কি ক'রে? একটা দৃষ্টান্ত নেও। জনকয়েক এই সর্ব্বসাধারণ পয়সাওয়ালারা তোমাদের মতন দু-চার জনের প্রশ্রয় পেয়ে আজ-কাল রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণী ছেড়ে হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে আরম্ভ করেছেন। আচ্ছা, কোনো কম্পার্টমেণ্টে এঁদের দু তিন জনকে ঘণ্টা তিন চার ঢুকিয়ে রাখবার পরে দেখেছ কি কী কাণ্ডটা হয়? আর কারও সাধ্য থাকে, প্রবৃত্তি থাকে সে-কামরা ব্যবহার করে?···এক ঝুড়ি মাটি থেকে শুরু ক'রে, ছোলা সেদ্ধ, পকোড়া, থুথু···তীর্থসলিল···সে দৃশ্য যে দেখেচে সে কি আর কখনো ভুলতে পারে? আসল কথা অন্দরে শোবার-ঘরে ব'সে সন্দেশ সেবা করারও যে একটা যোগ্যতা আছে, অর্জ্জন করা চাই। এ কথা পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় চিন্তাশীল মানুষই ব'লেছেন। তুমিও

স্বীকার ক'রে থাকো। নইলে অন্দরের দোর খোলা পেয়ে একবার "বাইরের আঙিনা"র লোকরা চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ক'রে ঢুকে পড়লে আমরা কি আর বাঁচবো? অতএব এরূপ বিপজ্জনক অতি-উদার বাক্য আর কখনো বোলো না।··· ('অনামী' দ্রষ্টব্য)।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৭

মণ্টু, হাঁ, তোমাদের নতুন কাগজ Orient আমাকে পাঠিয়ো। তোমার লেখা বেরুবে ওটা পড়বার জন্যে আমার সত্যই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচ সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে আমার কাছে নাকি অনেক কিছু শিখেচ। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের আগেও বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অলিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। শ্রী—তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হ'য়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে, পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো—কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। হাস্য-রসিক—বাবু চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। তিনি সত্যই বড় লেখক, কিন্তু না-লেখবার ইঙ্গিতটা যে ঠিক বুঝতে পারেন না, এ কি তাঁর বই পড়তে গিয়ে দেখতে পাও না? আর

এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই—র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে, কিন্তু এই যাওয়াটাও একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তি গদ্‌গদ 'আদেক্‌লেপনা' প্রকাশ পায় যে, পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল, খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার ঘাটে নেমেই মামা অ্যাঃ—ক'রে উঠলেন। দেখি, ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু করে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রী—মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে অম্বল যদি না সারে? তোমার দোলার ব্যাপারটাও বিলেতের। সে দিন কয়েকটা অধ্যায় পড়ছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এও তো বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু, কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই।···যদি কেউ চ্যালেঞ্জ ক'রে বলে—র লেখার মধ্যে মাতামাতি কোথায়—দেখাও দিকি, তবে হয়ত আমাকে প্রত্যুত্তরে শুধু এই কথাই বলতে হবে যে, এ-সব জিনিস এমন ক'রে দেখানো যায় না। রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। শ্রীমতী—দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে, বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই, ঢোক্‌বার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে—ছাখো তোমরা সবাই, আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েচি, কি জানাটাই

জেনেচি। এই আতিশয্য যেন কোন মতেই প্রশ্রয় না পায়। অথচ বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় আইডিয়া, বড় প্রকাশ, এই নিয়েই চলা চাই—জীবনেও, সাহিত্যেও। জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল, আর যায়ে যায়ে ঝগড়া, আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য—কিম্বা—র কলানৈপুণ্য ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা সলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে প্রয়োজনও শেষ হ'য়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো। তুমি এ সব করো না আমি লক্ষ্য ক'রেচি। এতে ও অন্য অনেক কারণে তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা পাই, মণ্টু। এবং তোমার এ কথাও খুব সত্যি যে, সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে—গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলেছে। তুমিই একদিন আমাকে ব'লেছিলে যে, বাংলাদেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই লোকে ভাবে, এ সবই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই তো সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়।
('অনামী')

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৮

মণ্টু—দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্ব্বক কুমিল্লায় চালান ক'রে দিয়েছিল। পথে এক দল শেম শেম বললে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে

দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেচি। শ্রীঅরবিন্দের "The liberated man has no personal hopes—" এ-সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক্ কয়লার গুঁড়োর, জয় হোক্ বারো ঘোড়ার গাড়ীর।

"শেষ প্রশ্ন" প'ড়ে খুসি হ'য়েছ শুনে আনন্দ পেলাম। "খুব ক'রবো, গর্জ্জন ক'রে নোংরা কথাই লিখ্‌বো।" এই ধরণের মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়, এরই একটু নমুনা দেওয়া। ('অনামী')

৩ মাঘ, ১৩৪২

মণ্টু···তুমি হয়ত জান না যে আমি আট নয় মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। লেখা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। এ জীবনের মত লেখা পড়া যদি শেষ হয়েই থাকে তো অভিযোগ করব না। মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী—এখনো তাই যেন থাকতে পারি।···

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, আমার চেয়ে কে বড় কে ছোট এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই।······যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ত না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যেই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে

করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়—বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে বসেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এম্‌নিধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।···

—('ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)

জ্যৈষ্ঠ (?) ১৩৪০

মণ্টু, শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব সম্বন্ধে একটু নিজের কথা বলি। আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ-পর্ব্বটা শেষ করবো এবং নানা দিক্ থেকে অল্প কথায় ও সাহিত্যিক সংযমের মধ্য দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য্য নয়, ঘটনার অসামান্যতা নয়, বরঞ্চ অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না, থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয়, থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা, তাঁদের আনন্দের জন্য। উপন্যাস-সাহিত্যের যতটুকু বুঝি, তাতে এই আশা করি যে, যদি আর কিছুই ভালো না পেরে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ করে বসি নি।

ও-আশ্রমে যাবার পর থেকে তোমার সম্বন্ধে এই বস্তুটা আমি বড় আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছি যে, ওখানে থেকে তোমার পড়া-শুনা হয়েছে যেমন ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী, তেমনি হয়েছে গভীর

এবং অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য, কেন না তোমার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য শান্ত। নিজে বহু আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তোমার বিদ্যাবত্তার লাঠি দিয়ে তুমি আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করো না। এই দিক্ থেকে তোমাকে যতই পরীক্ষা করি, ততই মুগ্ধ হই, ততই এই ভেবে খুসি হই যে, মণ্টু আমার দলে এ-বিষয়ে। সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নীরবে সহ্য করে, উপেক্ষা করে, কিন্তু মুখ ভেঙচে মানুষকে অপমান করতে ছোটে না। মণ্টু, তাদের আমি বড় ভয় করি, যারা নিজেরা সাহিত্যসেবী হয়েও আপন জনদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করে বেড়ায়। এই কথাটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে অপরকে তুচ্ছ প্রমাণিত করলেই নিজের বড়ত্ব সপ্রমাণ হয়ে যায় না। তার জন্য আরও কিছু চাই। সেটা অত সোজা রাস্তা নয়।

সাবিত্রী সম্বন্ধে 'পুষ্পপাত্রে' [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০] "বুদ্ধদেব ও বাস্তবতা" প্রবন্ধে যা লিখেছ পড়লুম। তুমি ঠিকই লিখেছ। কিন্তু, অনেকে এইটুকু কেন ভুলে যান যে, সাবিত্রী সত্যই ঝি-ক্লাসের মেয়ে নয়। পুরাণে আছে, একবার লক্ষ্মী দেবীও দায়ে পড়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মতো গণিকাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। গণিকার কাছে যে-গণিকা দাসী হয়ে আছে, তার চালচলন এবং তার কর্ত্রীর চালচলন এক না হতেও পারে। এদের দেখা পাওয়া সহজ, কিন্তু ওদের জানার পথে অনেক বাধা।

তোমার ও কথাও খুব ঠিক যে, যারা নির্বিকারে স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়্যালিস্‌ম্ ভাবে, তাদের আইডিয়ালিস্‌ম্ তো নেই-ই, রিয়্যালিস্‌ম্ও নেই। আছে শুধু অবিনয় ও মিথ্যা

স্পর্ধা—না জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন কথা বললে বাহাদুরি হতে পারে, কিন্তু ও-পথে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না— ('পাঠশালা', ভাদ্র ১৩৫০)

[শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লিখিত]

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

ভূপেন,—একখানি মাসিক পত্রের তুমি সম্পাদক catch-word-এর মোহ যেন তোমাকে না পেয়ে বসে। কারণ, এ কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে **বিপ্লব** এবং **বিদ্রোহ** এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে class war. বিপ্লবের মাঝে আছে civil war :—আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা হোক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী। ('বেণু', আষাঢ় ১৩৩৬)

সামতাবেড়, পাণিত্রাস, জেলা হাবড়া। ১০ চৈত্র, ১৩৩৬

ভূপেন—নববর্ষের সূচনায় তোমাদের 'বেণু'কে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি। যে-জাতির সাহিত্য নেই, তাদের দারিদ্র্য যে কত বড়, এই পুরানো সত্যটা আমরা বর্ত্তমান কালে নানা উত্তেজনায় প্রায় ভুলে যাই। তার ফল হয় এই যে, হীনতার

অন্ধকার জাতীয় জীবনে নিরন্তর গাঢ়তর হয়েই উঠতে থাকে। সমাজের মধ্যে আবর্জ্জনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই, এ কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তোমরা যে-কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র কোরে এক সঙ্গে মিলেছো— তোমরা যে নর-নারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন কর নি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির যেন আর ব্যতিক্রম না হয়। ('বেণু', বৈশাখ ১৩৩৭)

[শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লিখিত]

২৪ ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,—কাগজ চালাবার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছো, কিন্তু নিজে কখনও কাগজ চালাই নি, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে প্রতি মাসেই অনেক কাগজ পড়ি, এর থেকে এই কথাটা মনে হয় মাসিক পত্র বহু লোকের প্রিয় করে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি, তখনি মনে করো তার ভাব ও ভাষার

আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য,—সে টিকবে না।

ইনটেলেক্‌চুয়াল গল্প বলে একটা কথা আজকাল প্রায় শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখি নি কিম্বা দেখেও যদি থাকি চিন্‌তে পারি নি। সে দিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ করে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যার ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েচে। এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষনীয়, হৃদয়-বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দরকার! ('স্বদেশ', আশ্বিন ১৩৪০)

['প্রচারক'-সম্পাদক শ্রীঅতুলানন্দ রায়কে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু,—শ্রাবণের [১৩৪০] 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জান্‌তে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চারপাতা জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবা'র মতো এরও শেষ ক'লাইনে আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত-কামান-বন্দুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হলো, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো!

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব

নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেরামত দেখালে' 'প্রব্লেম সল্‌ভ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরি-করা বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল্' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ী এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে! এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করি নে যে, কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাটবাজার হাতী-ঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগ-সই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি

অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সংঘের বাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হল কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চকচক করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্তু-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন কবিও বলেন না যে হবে না। তাঁর আপত্তি শুধু

সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্র-নাথও যোগান দিয়েছেন এই বলে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমার গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা' পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন, 'বুলির' খাতিরে ও দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না,

কারণ, ও দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্মপুস্তক ত বটেই, হয় ত বা ইতিহাসও বটে। ও দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটার ইন্‌টালেক্‌ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সব চেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমার-সম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্‌-অফ ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্ত্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস্‌ করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এটা কি হল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায় নি,

কিন্তু এখনি কি তার রং ফিকে হয়ে আসে নি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইবসেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়। ('বাতায়ন', ১৭ কার্ত্তিক ১৩৪০)

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিত]

২৫ শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়েষু,—বাতায়নের প্রত্যেকটি সংখ্যাই আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েচি, আলস্যে বা উপেক্ষায় কোন দিন দূরে ঠেলে রাখি নি।

সকল বিষয়েই যে একমত হতে পেরেছি তা' নয়, এর সমালোচনার ভাষা মাঝে মাঝে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ ঠেকেছে, কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত ঈর্ষার আক্রমণে কোন আলোচনাই কোন দিন কলঙ্কিত হতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কখনো এমন ঘটেও থাকে, যা আমার চোখে পড়ে নি, তার সম্বন্ধে এই কথাই আজ বলবো যে, যা হয়ে গেছে সে যাক্, কিন্তু নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তোমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা চাই যে, লেখায় অসহিষ্ণুতা যদি বা সহা যায়, ক্রূরতা, নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক-সমাজ সইতে পারেন না, তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্য্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম,—সর্ব্বপ্রকারেই তার কল্যাণের

সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো, কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না। ('বাতায়ন', ২৫ শ্রাবণ ১৩৪১)

[শ্রীমতিলাল রায়কে লিখিত]

আশ্বিন, ১৩৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদ,…আচার্য্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যাঁরা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলচি নে,—বলচি সাধারণ সাংসারিক অর্থে) অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যাঁরা, তাঁদের একমাত্র মন্ত্র হলো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর—কোনটাতেই তাঁদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হলেও অপরাধ নেই।

অথচ সাহিত্য-সেবায় বহু দিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি, এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয় ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর, সে হয় ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি, তাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়ে দেখি, সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জ্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ প্রশ্ন অবান্তর স্বীকার না করেও ত পারি নে।

জিজ্ঞাসা করি, সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য সাধনায় এ সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে? ('প্রবর্ত্তক', ফাল্গুন ১৩৪৪)

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

তোমার প্রশ্ন—আমি নাটক লিখি না কেন? বোধ করি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, নাট্যকার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি 'বাতায়নে' বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিতে পারো নি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর যে সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব ভাষা, চরিত্রগঠন ইত্যাদি বিচার ক'রে দেখবার পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎচন্দ্র নাটক লিখলে হয় ত রঙ্গমঞ্চের চেহারার একটু পরিবর্তন হ'তে পারে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি, তা হ'লেও আমার মজুরী পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক্ থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিকপত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যানেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয় নি এত দিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন ব'লে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটে নি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ যায়গাটায় আক্‌শন (action) কম,—দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের

রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয় ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানিনে, তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি ক'রতে হয়, চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু'রকমের হ'তে পারে:—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী [illegible] তাই ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রক[illegible] করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনাপ[illegible]র মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখানো। সে ভা[illegible] দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, এক [illegible] হয় ত বিশ বছর আগে উইল্‌সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্ম্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয় ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্ত্তন। হয় ত অনেকগুলো ঘটনার পরিবর্ত্তন। হয় ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্ত্তে প'ড়ে পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

আজ সে সত্যি ক'রে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বচ্ছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হ'লে ত হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি ক'রে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্ত্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই ; নাটককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয় ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিক্‌টায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি একদিন বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয় ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয় ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে। ('নাচঘর', ২৫ আশ্বিন ১৩৪১)

[জাহান-আরা চৌধুরীকে লিখিত]

১২ মাঘ, ১৩৪২

তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছো। আমার বর্ত্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয় ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম্ম, রূপ,

গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক্—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান্ হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্চে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠচে বলেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে এক দিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশিও সে নয়। যে কারণেই হোক, এত দিন বাংলা দেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্যচর্চ্চা করে এসেছেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এ দিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই, বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলি নি, কিন্তু কোন দিনই সে বিস্তৃত হতে পারে নি। তাই, ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।

যদিচ, বলা চলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা জায়গায় এত বড় বিরাট্ সমাজের সুখ দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন ক'রে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে! স্পর্শ করে নি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আবিল করে নি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছো?

তিনি বললেন, উপায় হচ্চে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না।

মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম, এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয় ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই ত নিরাপদ্।

তার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় ত বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও, তাও চূড়ান্ত। এও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এও বলি, এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায়, তখন দেখবে, তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো সবচেয়ে বেশি।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন, এমনি non-co-operationই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না, চিরদিন চলবে না; কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো।

বললাম, করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে। ('বর্ষবাণী', ৩য় বর্ষ, ১৩৪২)

পরিশিষ্ট

সত্যাশ্রয়ী

ছাত্র, যুবক ও সমবেত বন্ধুগণ,

বাংলাভাষায় শব্দের অভাব ছিল না, অথচ, এই আশ্রমের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরা বেছে বেছে এর নাম দিয়েছিলেন 'অভয় আশ্রম'। বাইরের লোকসমাজে প্রতিষ্ঠানটীকে অভিহিত করার নানা নামই তো ছিল, তবু তাঁরা বললেন—অভয় আশ্রম। বাইরের পরিচয়টা গৌণ, মনে হয় যেন সঙ্ঘস্থাপনা ক'রে বিশেষভাবে তাঁরা নিজেদেরই বলতে চেয়েছিলেন—স্বদেশের কাজে যেন আমরা নির্ভয় হ'তে পারি, এ জীবনের যাত্রাপথে যেন আমাদের ভয় না থাকে। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, দৈন্য ও হীনতার মূলে মনুষ্যত্বের চরম শত্রু ভয়কে উপলব্ধি ক'রে বিধাতার কাছে তাঁরা অভয় বর প্রার্থনা ক'রে নিয়েছিলেন। নাম-করণের ইতিহাসে এই তথ্যটীর মূল্য আছে, এবং আজ আমার মনের মধ্যে কোন সংশয় নেই যে, সে আবেদন তাঁদের বিধাতার দরবারে মঞ্জুর হয়েছে। কর্ম্মসূত্রে এঁদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। দূরে থেকে সামান্য যা-কিছু বিবরণ শুনতে পেতাম, তার থেকে মনের মধ্যে আমার এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল—একবার নিজের চোখে গিয়ে সমস্ত দেখে আসবো। তাই, আমার পরম প্রীতিভাজন প্রফুল্লচন্দ্র যখন আমাকে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এখানে আহ্বান ক'রলেন, তাঁর সে আমন্ত্রণ আমি নিরতিশয় আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ ক'রলাম। শুধু একটিমাত্র সর্ত্ত করিয়ে নিলাম যে, অভয় আশ্রমের পক্ষ থেকে

আমাকে অভয় দেওয়া হোক্ যে, মঞ্চে তুলে দিয়ে আমাকে অসাধ্য সাধনে নিযুক্ত করা হবে না। বক্তৃতা দেবার বিভীষিকা থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। জীবনে যদি কিছুকে ভয় করি, তো একেই করি। তবে এটুকুও ব'লেছিলাম—যদি সময় পাই তো দু'এক ছত্র লিখে নিয়ে যাবো। সে লেখা প্রয়োজনের দিক্ থেকেও যৎসামান্য, উপদেশের দিক্ দিয়েও অকিঞ্চিৎকর। ইচ্ছে ছিল, কথার বোঝা আর না বাড়িয়ে উৎসবের মেলামেশায় আপনাদের কাছ থেকে আনন্দের সঞ্চয় নিয়ে ঘরে ফিরবো। আমি সে সঙ্কল্প ভুলি নি এবং এই দু'দিনে সঞ্চয়ের দিক্ থেকেও ঠকি নি। কিন্তু এ আমার নিজের দিক্। বাইরেরও একটা দিক্ আছে, সে যখন এসে পড়ে, তার দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। তেমনি এলো প্রফুল্লচন্দ্রের ছাপানো কার্য্য-তালিকা। রওনা হ'তে হবে, সময় নেই,—কিন্তু পড়ে দেখলাম, অভয় আশ্রম পশ্চিম বিক্রমপুরনিবাসী ছাত্র ও যুবকদের মিলনক্ষেত্রের আয়োজন ক'রেছে। ছেলেরা এখানে সমবেত হবেন। তাঁরা আমাকে অব্যাহতি দেবেন না; বললেন,—কিশোর বয়স থেকে ছাপা-বইয়ের ভেতর দিয়ে আপনার অনেক কথা শুনেছি, আজ যখন কাছে পেয়েছি, তখন যা হোক্ কিছু না শুনে ছাড়বো না। তারই ফলে এই কয়েক ছত্র আমার লেখা। মনে হবে, তা বেশ তো, কিন্তু এতবড় ভূমিকার কি আবশ্যক ছিল? তার উত্তরে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভিতরের বস্তু যখন কম থাকে, তখন মুখবন্ধের আড়ম্বর দিয়েই শ্রোতার মুখ বন্ধের প্রয়োজন হয়।

নিজের চিন্তাশীলতায় নূতন কথা বলবার আমার শক্তি সামর্থ্য কিছুই নাই, স্বদেশ-বৎসল নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে বহু সভা-

সমিতিতে যে সকল কথা আপনারা বহু বার শুনেছেন, আমি সেই সবই শুধু লিপিবদ্ধ ক'রে এনেছি। ভেবেছি, অভিনবত্ব নাই থাক্, মৌলিকত্ব যত বড় হোক্, তার চেয়েও বড় সত্যকথা। পুরানো ব'লে সে তুচ্ছ নয়, তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়াও বড় কাজ। তেম্‌নিমাত্র গুটি দুই তিন কথাই আজ আমি আপনাদের কাছে উল্লেখ করবো।

কিছু দিন থেকে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি। ভাবি, এতবড় সত্যটা এত কাল গোপনে ছিল কি ক'রে? সে দিনও সবাই জানতো, সবাই মানতো—পলিটিক্স, জিনিষটা কেবল বুড়োদেরই ইজারা মহল। আবেদন-নিবেদন, মান-অভিমান থেকে সুরু ক'রে চোখ-রাঙানো পর্য্যন্ত বিদেশী-রাজশক্তির সঙ্গে যা কিছু মোকাবিলার দায়িত্ব, সব তাদের। ছেলেদের এখানে একেবারে প্রবেশ নিষেধ। শুধু অনধিকারচর্চ্চা নয়, গর্হিত অপরাধ। তারা ইস্কুল-কলেজে যাবে, শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলে হ'য়ে পাশ ক'রে বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে—এই ছিল সর্ব্ববাদিসম্মত ছাত্র-জীবনের নীতি। এর যে কোনো ব্যত্যয় ঘটতে পারে, এর বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ছিল যেন লোকের স্বপ্নাতীত। হঠাৎ কোথাকার কোন্ উল্টো পোড়ো হওয়ায় এর কেন্দ্রটাকে ঠেলে নিয়ে একেবারে যেন পরিধির বাইরে ফেলে দিলে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন অকস্মাৎ ঘনান্ধকারের বুক চিরে বস্তু প্রকাশ করে, নৈরাশ্য ও বেদনার অগ্নি-শিখা ঠিক তেমনি ক'রেই আজ সত্য উদ্‌ঘাটিত ক'রেছে। যা চোখের অন্তরালে ছিল, তা দৃষ্টির সম্মুখে এসে প'ড়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষ-ময় কোথাও আজ সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, এত দিন লোকে যা ভেবে এসেছে, তা ভুল,

সত্য তাতে ছিল না ব'লেই বিধাতা বারম্বার ব্যর্থতার কালিমা দেশের সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছেন। এ গুরুভার বৃদ্ধদের জন্যে নয়, এ ভার যৌবনের। তাই তো আজ ইস্কুল-কলেজ, নগরে-পল্লীতে ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যৌবনের ডাক পড়েছে। ডাক বৃদ্ধরা দেয় নি, দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ নিজে। তাঁর আহ্বান কাণের মধ্যে দিয়ে এদের বুকে পৌঁছেচে যে, জননীর হাতে পায়ে বাঁধা এই কঠিন শৃঙ্খল ভাঙবার শক্তি অতি-প্রাজ্ঞ প্রবীণের হিসেবী বুদ্ধির মধ্যে নেই, এই শক্তি আছে শুধু যৌবনের প্রাণ-চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে। এই নিঃসংশয় আত্মবিশ্বাসে আজ তাকে প্রতিষ্ঠিত হ'তেই হবে। এত দিন বিদেশীয় বণিক্-রাজশক্তির কোন চিন্তাই ছিল না, বৃদ্ধের রাজনীতিচর্চ্চাকে সে খেলাচ্ছলেই গ্রহণ ক'রে এসেছিল, কিন্তু এখন তার আর খেলার অবকাশ নেই। দিকে দিকে এ চিহ্ন কি আপনাদের চোখে পড়ে নি? যদি না প'ড়ে থাকে, চোখ মেলে চেয়ে দেখতে বলি। রাজশক্তি আজ ব্যাকুল, এবং অচির ভবিষ্যতে এই অন্ধ-ব্যাকুলতায় দেশ ছেয়ে যাবে—এ সত্যও আজ আপনাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ক'রতে বলি। আরও বলি, সে দিন যেন এই সত্যোপলব্ধির অবমাননা না ঘটে।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখি। কারণ সন্দেহ হ'তে পারে, সর্ব্বদেশেই তো রাজনীতি পরিচালনার ভার বৃদ্ধদের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু এখানে তার অন্যথা হবে কেন? অন্যথা এখানেও হবে না, একদিন তাঁদের 'পরেই রাজ্য শাসনের দায়িত্ব প'ড়বে। কিন্তু সে দিন আজ নয়। এখনও সে এসে পৌঁছয় নি। কারণ, দেশ শাসন করা ও স্বাধীন করা এক বস্তু নয়। এ কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, রাজনীতি-পরিচালনা একটা পেশা। যেমন

ডাক্তারি, ওকালতি, প্রফেসারী,—এমনি। অন্যান্য সমুদয় বিদ্যার মত একেও শিক্ষা ক'রতে হয়, আয়ত্ত ক'রতে সময় লাগে। তর্কের মার-প্যাঁচ, কথা-কাটাকাটির লড়াই, আইনের ফাঁক খুঁজে কড়া ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া,—আবার যথা-সময়ে আত্মসম্বরণ ও বিনীত ভাষণ,—এ সকল কঠিন ব্যাপার এবং বয়স ছাড়া এতে পারদর্শিতা জন্মে না। এরই নাম পলিটিক্স। স্বাধীন দেশে এর থেকে জীবিকা-নির্ব্বাহ চলে। কিন্তু পরাধীন দেশের সে ব্যবস্থা নয়। সেখানে দেশের মুক্তি-অর্জ্জন-পথে পদে পদে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে চ'লতে হয়। এ তো তার পেশা নয়, এ তার ধর্ম্ম। তাই, এই পরম ত্যাগের ব্রত শুধু যৌবনই গ্রহণ ক'রতে পারে। এ তার স্বাধিকার-চর্চ্চা, অনধিকার-চর্চ্চা নয় ব'লেই রাজ-শক্তি একে ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ ক'রেছে। এই স্বাভাবিক, এবং এর গতি-পথে বাধার অবধি থাকবে না, এ-ও তেমনি স্বাভাবিক। কিন্তু এই সত্যটাকে ক্ষোভের সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হ'তে আজ আপনাদের আমি আহ্বান করি।

শব্দের ঘটায় ও বাক্যের ছটায়, উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রতে আমি অপারক। শান্ত সমাহিত চিত্তে সত্যোপলব্ধি করতেই আমি অনুরোধ করি। আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি, আমাদের এই ছিল, এই ছিল, এই ছিল এবং এই আছে, এই আছে, এই আছে,—সুতরাং ঘুম ভেঙে চোখ রোগড়ে উঠে ব'সলেই সব পাবো, এ যাদুবিদ্যার আশ্বাস দিতে আমার কোন কালেই প্রবৃত্তি হয় না। জগৎ মানুক্ আর না-মানুক্, আমরা মস্তবড় জাতি, এ কথা বহু আস্ফালনে দিকে দিকে ঘোষণা ক'রে বেড়াতেও যেমন আমি গৌরব বোধ করিনে, তেমনি, বিদেশী রাজশক্তিকেও ধিক্কার

দিয়ে ডেকে ব'লতে লজ্জা বোধ করি যে, হে ইংরাজ, তোমরা কিছুই নয়, কারণ, অতীত কালে আমরা যখন এই এই মস্ত মস্ত বড় বড় কাজ ক'রেচি, তোমরা তখন শুধু গাছের ডালে ডালে বেড়াতে। এবং বিদ্রূপ ক'রে কেউ যদি আমাকে বলে—তোমরা যদি সত্যই এত বড়, তবে হাজার বছর ধ'রে একবার পাঠান, একবার মোগল, একবার ইংরাজের পায়ের তলে তোমাদের মাথা মুড়োয় কেন, তবে এ উপহাসের প্রত্যুত্তরেও আমি ইতিহাসের পুঁথি ঘেঁটে অন্যান্য জাতির দুর্দ্দশার নজির দেখাতেও ঘৃণা বোধ করি। বস্তুতঃ এ তর্কে লাভ নেই। বিগত দিনে তোমার আমার কি ছিল, এ নিয়ে গ্লানি বাড়িয়ে কি হবে,—আমি বলি, ইংরাজ, আজ তুমি বড়; শৌর্য্যে, বীর্য্যে, স্বদেশ-প্রেমে তোমার জোড়া নেই; কিন্তু আমারও বড় হবার সমস্ত মাল মসলা মজুত। আজ দেশের যৌবন-চিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নেই, তোমারও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মত বড় হ'য়ে তার জন্মের অধিকার আদায় ক'রে নেবেই নেবে।

কিন্তু কোন্ সংজ্ঞায় যৌবনকে নির্দ্দেশ করা যায়? অতীত যার কাছে অতীতের বেশী নয়, সে যত বৃহৎ হোক, শুদ্ধ-চিত্ত-তলে তাকেই লালন ক'রে কালক্ষেপের অবসর যার নেই, যার বৃহত্তর আশা ও বিশ্বাস অনাগতের অন্তরালে কল্পনায় উদ্ভাসিত—সেই তো যৌবন। এইখানেই বৃদ্ধের পরাজয়। শক্তি তার নিঃশেষিতপ্রায়, ভবিষ্যৎ আশাহীন শুষ্ক, সম্মুখ অবরুদ্ধ, শেষ জীবনের বাকী দিনক'টা তাই প্রাণপণে অতীতকে আঁকড়ে থাকাই তার সান্ত্বনা। এ অবলম্বন সে কোন মতেই ছাড়তে পারে না, কেবলি ভয় হয়, এর

থেকে বিচ্যুত হ'লে তার দাঁড়াবার স্থান আর কোথাও থাকবে না। স্থিতিশীল শান্তিই তার একান্ত আশ্রয়, বহুদিন আবদ্ধ খাঁচার পাখীর মত, মুক্তিই তার বন্ধন, মুক্তিই তার সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস-সিদ্ধ প্রাণ-ধারণ-প্রণালীর যথার্থ অন্তরায়। এইখানেই যৌবনের সঙ্গে তার প্রচণ্ড বিভেদ। সমাজের জাতির মুক্তি-বিধানের দায়িত্ব যত দিন এই বৃদ্ধদের হাতেই থাকবে, বন্ধনের গ্রন্থিতে পাকের পর পাক পড়তেই থাকবে, খুলবে না। কিন্তু যৌবন-ধর্ম্ম এর বিপরীত। তাই যেদিন থেকে শুনতে পেলাম, স্কুল-কলেজের ছাত্র রাজনীতিকে —যে রাজনীতি কেবলমাত্র পলিটিক্স নয়, যে রাজনীতি স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে ব্রতের মত, ধর্ম্মের মত, তাকেই গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে, এ কুসংস্কারের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে যে, এ বস্তু তার ছাত্রজীবনের পরিপন্থী—সেই দিনই আমার প্রতীতি জন্মেছে, এবার সত্য সত্যই আমাদের দুর্গতির মোচন হবে। ছাত্র এবং দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের কাছে আমার নিবেদন, এ সঙ্কল্প থেকে যেন তাঁরা কারও কথায় কোন প্রলোভনেই বিচ্যুত না হন।

এ সম্বন্ধে বহু মনীষী ব্যক্তিই বহু উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা এই কর, এই কর,—এই তোমাদের করণীয়, এই আচরণই প্রশস্ত, স্বার্থত্যাগ চাই, বুকের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি জ্বালিয়ে তোলা প্রয়োজন, জাতি-ভেদ অস্বীকার, ছুঁৎমার্গ পরিহার, খদ্দর পরিধান—এমনি অনেক আবশ্যকীয় ও মূল্যবান্ আদেশ এবং উপদেশ। এই হ'ল প্রোগ্রাম। আবার অন্যপ্রকার উপদেশ, ভিন্ন প্রোগ্রামও আছে। আপনাদেরই মত দেশের বহু ছাত্র ও যুবক আমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা কি করবো আপনি বলে দিন। উত্তরে আমি বলি,—প্রোগ্রাম তো আমি দিতে পারি নে, আমি শুধু তোমাদের

বলতে পারি, তোমরা দৃঢ়পণে 'সত্যাশ্রয়ী' হও। তাঁরা প্রশ্ন করেন, এ ক্ষেত্রে সত্য কি? বিভিন্ন মতামত ও প্রোগ্রাম যে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দেয়। জবাবে আমি বলি, সত্যের কোনো শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ কাল পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তন বুদ্ধিপূর্ব্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা। যেমন বহু পূর্ব্বকালে রাজাই ছিলেন ভগবানের প্রতিনিধি। দেশের লোকে এ কথা মেনে নিয়েছিলো। একে অসত্য বলতে আমি চাই নে। সেই প্রাচীন [illegible] হয় ত এই সত্য ছিল, কিন্তু আজ জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্ত[illegible] ফলে এ কথা যদি ভ্রান্ত ব'লেই প্রমাণিত হয়, তবুও কোন এক [illegible]বক দিনের যুক্তি ও উক্তি মাত্রকেই অবলম্বন ক'রে একেই সত্য ব'[illegible] যদি কেউ তর্ক করে, তাকে আর যাই কেন না বলি, 'সত্যাশ্রয়ী' [illegible]লবো না। কিন্তু শুদ্ধমাত্র মানাই এর সবটুকু নয়,—বস্তুতঃ, আর এ[illegible]কৃ দিয়ে কোন সার্থকতাই এর নেই—যদি না চিন্তায়, বাক্যে[illegible] ব্যবহারে, জীবনযাত্রার পদে পদে এ সত্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে[illegible] ভুল জানা, ভ্রান্ত ধারণা, বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু ভিতরের জানা ও বাইরের আচরণে যদি সামঞ্জস্য না থাকে,—অর্থাৎ যদি জানি একরকম, বলি আর একরকম,—তবে জীবনের এতবড় ব্যর্থতা, এতবড় ভীরুতা আর নেই। যৌবন-ধর্ম্মকে এতখানি ছোট করতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। ছুঁৎমার্গ, জাতিভেদ, খদ্দর পরিধান, জাতীয় শিক্ষা, দেশের কাজ—এ সব সত্য কি অসত্য, ভাল কি মন্দ, এ আলোচনা আমি করবো না, এর সত্যাসত্য বুঝিয়ে দেবার আমার চেয়ে

যোগ্যতর ব্যক্তি আপনারা অনেক পাবেন, কিন্তু আমি কেবল এই নিবেদনই করবো, আপনাদের বুঝার সঙ্গে যেন কার্য্যের ঐক্য থাকে। বুঝি, ছোঁয়া-ছুঁই-আচার-বিচারের অর্থ নেই, তবু মেনে চলি; বুঝি জাতিভেদ মহা অকল্যাণকর, তবু নিজের আচরণে তাকে প্রকাশ করি নে, বুঝি ও বলি, বিধবা-বিবাহ উচিত, তবু নিজের জীবনে তাকে প্রত্যাহার করি, জানি খদ্দর পরা উচিত, তবু বিলাতী কাপড় পরি, একেই বলি আমি অসত্যাচরণ। দেশের দুর্দশা ও দুর্গতির মূলে এই মহাপাপ যে আমাদের কতখানি নীচে টেনে এনেছে, এ হয় ত আমরা কল্পনাও করি নে। এমনি ধারা সকল দিকে। দৃষ্টান্ত দিয়ে সময় অতিবাহিত করবার প্রয়োজন নেই,—প্রার্থনা করি, দীনতা ও কাপুরুষতার এই গভীর পঙ্ক থেকে দেশের যৌবন যেন মুক্তিলাভ করতে পারে। ভুল বুঝে ভুল কাজ করায় অজ্ঞতার অপরাধ হয়, সেও ঢের ভালো, কিন্তু ঠিক বুঝে বেঠিক কাজ করায় শুধু সত্যভ্রষ্টতার নয়, অসত্য-নিষ্ঠার প্রত্যবায় হয়। তার প্রায়শ্চিত্তের যখন দিন আসে, তখন সমস্ত দেশের শক্তিতে কুলোয় না। এ কথা মনে রাখতে হবে, সত্য-নিষ্ঠাই শক্তি, সত্যনিষ্ঠাই সমস্ত মঙ্গলের আধার এবং ইংরাজিতে যাকে বলে tenacity of purpose, সেও এই সত্যনিষ্ঠারই বিকাশ। তাই বারম্বার স্বদেশের যৌবনের কাছে এই আবেদনই করি, সত্য-নিষ্ঠাই যেন তাঁদের ব্রত হয়। কেন না, নিশ্চয় জানি, এই ব্রত ধারণই তাঁদের সম্মুখের সমস্ত বাধা অপসরণ ক'রে যথার্থ কল্যাণের পথ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেবে। প্রোগ্রাম ও পথের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

আজকের কার্য্য-তালিকায় একটা বিষয় আছে, সে হচ্ছে লাঠি,

তলোয়ার ও ছোরাখেলা। এত দিন Physical cultureএর দিকে ছাত্র-সমাজ একেবারে বিমুখ হ'য়ে পড়েছিল। মনে হয়, এইটে ধীরে ধীরে আবার যেন ফিরে আসচে। এই প্রত্যাগমনকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি। তারা দেখেচে, দুর্ব্বল শক্তিহীনেরই শুধু লাথির ঘায়ে প্লীহা ফাটে। শক্তিমান্ পাঠান-কাবুলীওয়ালার ফাটে না। ফাটে বাঙালীর। বোধ হয় বারম্বার এই ধিক্কারেই শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের স্পৃহা ফিরে এলো। Physical cultureএ শক্তি বাড়ে, আত্ম-রক্ষার কৌশল আয়ত্ত হয়, সাহস বৃদ্ধি পায়,—কিন্তু তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে, এ সমস্তই দেহের ব্যাপার। অতএব এই-ই [illegible]ক নয়। সাহস বাড়া এবং নির্ভীকতা অর্জ্জন কোন মতেই এক [illegible]য়। একটা দৈহিক, অন্যটা মানসিক। দেহের শক্তি ও কৌশল বৃদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অকৌশলীকে পরাভূত করা যায়, কিন্তু নির্ভয়ের সাধনায় শক্তিমান্‌কে পরাস্ত করা যায়,—সংসারে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, সে হয় অপরাজেয়। তা প্রারম্ভে যে কথা একবার বলেচি, তারই পুনরুক্তি ক'রে আ[illegible] বলি যে, এই অভয় আশ্রম সেই সাধনাতেই নিযুক্ত। এঁদে[illegible] [illegible]চ্ছ্র-সাধনা তারই একটা সোপান, একটা উপায়। এ তাঁ[illegible]র পথ,—শেষ লক্ষ্য নয়। অভাব, দুঃখ, ক্লেশ, প্রতিবেশীর লাঞ্ছনা, বন্ধুজনের গঞ্জনা, প্রবলের উৎপীড়ন কোন কিছুই যেন এঁদের মুক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে—এই এঁদের একান্ত পণ। এই তো নির্ভয়ের সাধনা এবং তাই সত্য-নিষ্ঠাই এঁদের গন্তব্য পথকে নিরন্তর আলোকিত ক'রে চলেছে। খদ্দর প্রচার, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাঁসপাতাল খোলা, আর্ত্তের সেবা, এ সব ভালো [illegible]

নির্ভীকতা ও দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে এ সমস্ত কাজের কি না,—এ সব প্রশ্ন বৃথা। এঁদের সত্যনিষ্ঠা কাল যদি এঁদের চক্ষে অন্য পথ নির্দ্দেশ করে, এই সমস্ত আয়োজন নিজের হাতে ভেঙে ফেলতে অভয় আশ্রমীদের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না—এই আমার বিশ্বাস। এবং কামনা করি, এ বিশ্বাস যেন আমার সত্য হয়।

আমার বয়স অনেক হলো, তবু এখানে এসে অনেক কিছুই শিখলাম। এই অভয় আশ্রমে অতিথি হ'তে পারার সৌভাগ্য আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত মনে থাকবে।

পরিশেষে, এই ছাত্র ও যুব-সঙ্ঘকে আশীর্ব্বাদ করি, যেন এঁদের মতই সত্যনিষ্ঠা তাঁদেরও জীবনের ধ্রুবতারা হয়।

আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের নমস্কার গ্রহণ করুন।

যুব-সঙ্ঘ

কল্যাণীয় বেণুর কিশোর কিশোরী পাঠকগণ,—উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর সহর থেকে তোমাদের এইখানি লিখচি। তোমরা জানো বোধ হয়, বাঙ্‌লাদেশে যুব-সমিতি নাম দিয়ে একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে। হয় ত, আজও তোমরা এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত নও, কিন্তু একদিন এই সমিতি তোমাদের হাতে এসেই পড়বে। তোমরাই এর উত্তরাধিকারী। তাই, এ সম্বন্ধে দুটো কথা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই। সমিতির বার্ষিক সম্মিলনী কাল শেষ হয়ে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ, তবুও ছেলে মেয়েরা আমাকেই এই সম্মিলনীর নেতৃত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ করে এনেছে। তারা আমার বয়সের খেয়াল করে নি। কারণ বোধ করি এই যে, [illegible] কে[illegible] যেন তারা বুঝতে পেরেছে, আমি তাদের চিনি।

তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে আনন্দের সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম শুধু এই কথাটাই জানতে যে, তাদের হাতেই দেশের সমস্ত ভাল মন্দ নির্ভর করে, এই সত্যটা যেন তারা সকল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। অথচ, এই পরম সত্যটাকে বোঝবার পথে তাদের কতই না বাধা। কত আবরণই না তৈরী হয়েছে তাদের দৃষ্টি থেকে একে ঢেকে রাখবার জন্যে। আর তোমরা, যাদের বয়স আরও কম, তাদের বাধার তো আর অন্ত নেই। বাধা যারা দেয়, তারা বলে, সকল সত্য সকলের জানবার অধিকার নেই। এই যুক্তিটা এমনি জটিল যে, না বলে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, হাঁ বলেও সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। আর এইখানেই তাদের জোর। কিন্তু এমন ক'রে এ বস্তুর মীমাংসা হয় না। হয়ও নি। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন এসেছে ;—অধিকারি-ভেদের তর্ক উঠেছে, শেষে বয়স ছেড়ে মানুষের ছোট বড়, উঁচু-নীচু অবস্থার দোহাই দিয়ে মানুষকে মানুষ জ্ঞানের দাবী থেকেও বঞ্চিত করে রেখেচে।

তোমরাও এমনি তোমাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অনেক জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছ। সত্য সম্বাদ পেলে পাছে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়, পাছে তোমাদের ইস্কুল-কলেজের পড়ায়, পাছে তোমাদের একজামিনে পাশের পরম বস্তুতে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কার মধ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টিরোধ করা হয়, এ খবর হয় ত তোমরা জানতেও পার না।

যুব-সমিতির সম্মিলনে এই কথাটাই আমি সকলের চেয়ে বেশি করে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম তোমাদের

পরাধীন দেশটিকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই তোমাদের সঙ্ঘ গঠন। ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার—দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকার আছে।

বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না, তোমাদের মত কিশোরবয়স্কদেরও না।

একজামিনে পাশ করা দরকার,—এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্যচিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক্ করে রাখলে যে ভাঙার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

নিজেও ত দেখি, ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে একদিন যা শিখেছিলাম, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তা তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিক্ষার আর ক্ষয় নাই।

তোমরা নিজের বেলাতেও ঠিক তাই মনে ক'রো। ভেবো না যে, আজ অবহেলায় যে দিকে দৃষ্টি দিলে না, আর একদিন বড় হয়ে তোমার ইচ্ছামতই দেখতে পাবে। হয় ত পাবে না, হয় ত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুর্লভ বস্তু চিরদিনই চোখের অন্তরালে রয়ে যাবে। যে শিক্ষা পরম শ্রেয়ঃ, তাকে এই কিশোর বয়সেই শিরার রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে গ্রহণ করতে হয়, তবেই যথার্থ করে পাওয়া যায়। কালকের এই যুব-সমিতির যুবকেরা কংগ্রেসের ধরণ-ধারণ ছেলেবেলাতেই গ্রহণ করেছিল বলে সে রীতিনীতি আর ত্যাগ করতে পারে নি। এটা ভয়ের কথা।

রঙ্গপুর, ১৭ই চৈত্র। ['বেণু', ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬]

নূতন প্রোগ্রাম

শ্রীপরশুরাম*

শরৎবাবুর রংপুর অভিভাষণের উত্তরে চরকা লইয়া কথা কাটাকাটি হইয়া গেল বিস্তর, আজও তার শেষ হয় নাই। প্রথমে চরকা-ভক্তের দল প্রচার করিয়া দিলেন, তিনি মহাত্মাজির টিকিতে চরকা বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়া[illegible]। এতবড় একটা অমর্য্যাদাকর উক্তি অভিভাষণে ছিল না, কি[illegible] তা বলিলে কি হয়,—ছিলই। না হইলে আর ভক্তের বেদনা প্রকাশের সুযোগ মিলিবে কি করিয়া? কিন্তু শরৎবাবু নিজে যখন নীরব, তখন আমার মতন একজন সাধারণ ব্যক্তির ওকালতি করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। নিজের মাথায় টিকি নাই, কেহ যে ধরিয়া রাগ করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সেও পারিবে না, সুতরাং এদিকে নিরাপদ্। কিন্তু অভিভাষণে কেবল টিকিই তো ছিল না, চরকাও ছিল যে, অতএব বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা হইতে দ্রুত[illegible] গেলেন মানভূমে, এবং প্রতিবাদ করিলেন যুব-সমিতির স[illegible]নে। ঠিকই হইয়াছে; ওটা যুব-সমিতিরই ব্যাপার। তরুণ বৈজ্ঞানিক বুড়া সাহিত্যিকের তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, সকলে একজনকে ধন্য ধন্য এবং অপরকে ছি ছি করিতে লাগিল, তথাপি ভরসা হয় না যে, তিন তিন কাল পার করিয়া দিয়া অবশেষে এই শেষ কালটাতেই তামাক ছাড়িবেন।

---

* 'গড্ডালিকা' প্রভৃতির লেখক পরশুরামের সহিত এই প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই।

অতঃপর সুরু হইয়া গেল প্রতিবাদের প্রতিবাদ, আবার তারও প্রতিবাদ। দুই একটা কাগজ খুলিলে এখনও একটা-না-একটা চোখে পড়ে।

কিন্তু আমরা ভাবি, শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলা দেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে এ দেশের লোকের। খামোকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তো এই বছর আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধ্বস্তাধ্বস্তিই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতেই মানুষে সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মাজির দোহাই, বন্দে মাতরমের দিব্যি, কোনও কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেল না, যে বা লইল, চরকার দাম দিল না; বক্তৃতার জোরে যাহাকে দলে আনা গেল, সে বিপদ ঘটাইল আরও বেশী। নব উৎসাহে কাজে মন দিয়া দিন পনেরো পরেই জোটপাকানো একমুঠা সুতা আনিয়া হাজির করিল। আষ্টে-পৃষ্ঠে তাহাতে নাম ধাম সমেত লেবেল আঁটা অর্থাৎ গোলমালে খোয়া না যায়। কহিল দিন তো মশাই একখানা প্রমাণ শাড়ী বুনে।

কর্ম্মীরা কহিত—এতে কি কখনো শাড়ী হয়?

হয় না? আচ্ছা, শাড়ীতে কাজ নেই, ধুতিই বুনে দিন, কিন্তু দেখবেন, বহর ছোট ক'রে ফেলবেন না যেন।

কর্ম্মীরা—এতে ধুতিও হবে না।

হবে না কি রকম? আচ্ছা ঝাড়া দশ হাত না হোক ন'হাত

সাড়ে ন'হাত তো হবে? বেশ তাতেই চলবে। আচ্ছা চললুম। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত।

কর্ম্মীরা প্রাণের দায়ে তখন চীৎকার করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, এ ঢাকাই মসলিন নয়;—খদ্দর। একমুঠো সুতার কাজ নয় মশাই, অ[illegible] এক ধামা সুতার দরকার।

কিন্তু এ ত গেল বাহিরের লোকের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মীদের উৎসাহ-উদ্যম অথবা খদ্দর-নিষ্ঠার লেশমাত্র অভাব ছিল তাহা বলিতে পারিব না। প্রথম যুগে মোটা খদ্দরের ভারের উপরেই প্রধানতঃ patriotism নির্ভর করিত। সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে।

তিনি পরিয়া আসিতেন দিশী—সামিয়ানা তৈরীর কাপড় মাঝখানে সেলাই করিয়া। সমবেত প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনে সভা মুখরিত হইয়া উঠিত, এবং সেই পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া কিরণশঙ্কর প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দুই চক্ষু ভাবাবেশে অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল না, আ[illegible] লয়ন-ক্লথের যুগ। সে দিন আসল ও নকল কর্ম্মী এক আঁচড়ে চিনা গেল। যথা, অনিলবরণ—দীর্ঘ শুভ্রদেহের লয়নটুকু মাত্র ঢাকিয়া যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাখট শব্দে সভায় প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে উপস্থিত সকলেই চোখ মুদিয়া অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি সুখাসীন না-হওয়া পর্য্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিত না। সে কি দিন! "My only answer is Charka" অধোমুখে বসিয়া সকলেই এই মহাবাক্য মনে মনে জপ

করিয়া ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নাই, ল্যাঙ্কাশায়ারে লাল বাতি জ্বালিয়া ব্যাটারা মরিল বলিয়া। আজ অনিলবরণ বোধ করি যোগাশ্রমে ধ্যানে বসিয়া ইহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

সে দিন ফরেন ক্লথ মানেই ছিল মিল ক্লথ। তা সে যেখানেরই তৈরী হোক না কেন। সে দিন অপবিত্র মিল ক্লথ পরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কোনও স্বদেশভক্ত দিগম্বর মূর্ত্তিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ডিসেম্বরের মুখ চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না কথাটি বলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—The programme of the Charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.

সেদিন কেন যে কবি এতবড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়; কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলায় খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগ-দুগ্ধ পান করা পর্য্যন্ত তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন—তেম্নি টিকি, তেমনি কাপড় পরা, তেম্নি চাদর গায়ে দেওয়া, তেম্নি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেম্নি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর বাক্যালাপ— সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোল কলায় হৃদয় ভরে নাই, উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার নাকি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প

করিয়াছেন। বাস্তবিক, এ অনুরাগ অতুলনীয়, মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকেও ইনি হার মানাইয়াছেন।

কিন্তু এ হইল উচ্চাঙ্গের সাধনপদ্ধতি, সকলের অধিকার জন্মে না। এ পর্য্যায়ে যাঁহারা উঠিতে পারেন নাই, একটু নীচের ধাপে আছেন, তাঁহাদেরও চরকা-যুক্তি যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী। একটা কথা বারম্বার বলা হয়, চরকা কাটিলে আত্মনির্ভরতা জন্মে, কিন্তু এ জিনিষটা যে কি, কেন জন্মায়, এবং চরকা ঘুরাইয়া বাহুবল বৃদ্ধি কিংবা আর কোনও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বারম্বার বলা সত্ত্বেও ঠিক বুঝা যায় না। তবে এ কথা স্বীকার করি, আত্ম-নির্ভরতার ধারণা সকলেরই এক নয়। যেমন আমাদের পরাণ একবার আত্ম-নির্ভরতার বক্তৃতা দিয়া বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে উপসংহারে concrete উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তুমি হঠাৎ যদি একটি ডাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, তোমার আত্ম-নির্ভরতা (self help) শিক্ষা হইয়াছে,—তুমি স্বাবলম্বী হইয়াছ।"

অবশ্য এরূপ হইলে বিবাদের হেতু নাই। কিন্তু এ ত গেল সূক্ষ্ম দিক্। ইহার স্থূল দিকের আলোচনাটাই বেশী দরকারী। বিশেষজ্ঞ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তির নজির দিয়া প্রায়ই বলা হয়, অবসরকালে ২।৪ ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ চরকা কাটিলে মাসিক আট আনা দশ আনা বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে এই ঢের। অবশ্য গরীব শব্দটা অনাপেক্ষিক বস্তু নয়, একটা তুলনাত্মক শব্দ। Economicsএ marginal necessityর যে উল্লেখ আছে, সে যে দেশের শাস্ত্র, সেই দেশের উপলব্ধির ব্যাপার। আমাদের এ

দেশের গরীব কথাটার মানে আমরা সবাই বুঝি, এ লইয়া তর্ক করি না, কিন্তু এই দৈনিক এক পয়সা দেড় পয়সার আয় বৃদ্ধিতে চাষারা খাইয়া পরিয়া পুরুষ্ট হইয়া কি করিয়া যে ইংরাজ তাড়াইয়া স্বরাজ আনিবে, ইহাই বুঝা কঠিন।

অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুরি, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসরমত দু'মুঠা ঘাস ছিঁড়িলেও তো মাসিক দশ আনা বারো আনা অর্থাৎ দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়। তিনি আরও বলেন, ইহাতে অন্য উপকারও আছে। এ. আই. সি. সির একটা মিটিং ডাকিয়া Franchise করিয়া দিলে লিডারদের তখন ঘাস ছিঁড়িতে পাড়াগাঁয়ে আসিতেই হইবে। কারণ, সহরে ঘাস মিলে না। অতএব এরূপ মেলামেশায় পল্লীসংগঠনের কাজটাও দ্রুত আগাইয়া যাইবে। অন্ততঃ সহরের মধ্যে মোটর হাঁকাইয়া লোক চাপা দিয়া মারার দুষ্কর্মটা কিছু কম হওয়ারই সম্ভাবনা।

আমি বলি, অনিলবরণের প্রস্তাবটিকে "due consideration" দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি হয়ত শুনিয়া বলিবেন, ইহাও utterly childish, কিন্তু আমরা বলিব, কবিদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই,—সুতরাং তাঁহার কথা শোনা চলিবে না। বিশেষতঃ, বার মাসের মধ্যে তের মাস থাকেন যিনি বিলাতে, দেশের আবহাওয়া তিনি জানেন কতটুকু? চরকা-বিশ্বাসী অহিংসকেরা হিংস্র অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, তোমরা চরকা কাটার মত সোজা কাজটাই ধৈর্য্য ধরিয়া করিতে পার না, আর তোমরা করিবে দেশোদ্ধার? ছি ছি, তোমাদের গলায় দড়ি।

শুনিয়া ইহারা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। হয় ত কেহ কেহ ভাবে, হবেও বা। চরকা কাটিতেই যখন পারিলাম না, তখন আমাদের দ্বারা আর কি হইবে? কিন্তু আমি বলি, হতাশ হইবার কারণ নাই। অনিলবরণের কর্ম্ম-পদ্ধতি অন্ততঃ বছরখানেক trial দিয়া দেখা উচিত। কারণ, আরও সহজ। চরকা কিনিতে হইবে না, শিখিতে হইবে না, তুলার চাষ করিতে হইবে না, বাজারের শরণাপন্ন হইতে হইবে না;—কোনও মুস্কিল নাই। আর পদ্মার চর হইলে তো কথাই নাই, ছিঁড়িতেও হইবে না, ধরা মাত্রেই খুশ করিয়া উপড়াইয়া আসিবে। স্বরাজ মুঠার মধ্যে।

কিন্তু অনিলবরণ বলিয়াছেন, আস্থাহীন হইলে চলিবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথায় যত ছেলেমানুষি দেখাক, যুক্তি যত উল্টা কথাই বলুক, তথাপি বিশ্বাস করিতে হইবে।

এক বৎসরে Dominion Status অবশ্যম্ভাবী! হইবেই হইবে। যদি না হয়? সে লোকের অপরাধ, প্রোগ্রামের নয়। এবং তখন অনায়াসে বলা চলিবে, এত সহজ কর্ম্ম-পদ্ধতি যে দেশের লোক নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়া সফল করিতে পারিল না, তাহাদের দিয়া কোনও কালেই কিছুই হইবে না। আসল জিনিষ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। একটার যখন সুবিধা হইল না, তখন আর একটা লওয়া কর্ত্তব্য। এমনি করিয়া চেষ্টা করিতে করিতেই একদিন খাঁটি প্রোগ্রামটি ধরা পড়িবে। পড়িবেই পড়িবে। জয় হোক অনিলবরণের। কত সস্তায় স্বরাজের রাস্তা বাৎলে দিলেন!

নিখিল-ভারত-কাটুনি-সঙ্ঘ খবর দিতেছেন, বিশ লাখ টাকার চরকা কিনিয়া বাইশ লাখ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। উৎসব লাগিয়া গেল, সবাই কহিল—আর চিন্তা নাই, বিদেশী কাপড় দূর

হইল বলিয়া। কলিকাতার বড় কংগ্রেস আসন্নপ্রায়, সুভাষচন্দ্র বলিলেন, খবরদার! কলের তৈরী দিশী একগাছি সূতাও যেন একজিবিশনে না ঢোকে! এ ঢুকলে আর উনি ঢুকিবেন না।

নলিনীরঞ্জন বিষয়ী মানুষ, কত ধানে কত চাল হয় খবর রাখা তাঁর পেশা, কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, সে কি কথা! বিদেশী কাপড় বয়কট করার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। তোমার এই বাইশ লাখ দিয়া ৭০।৮০ ক্রোড়ের ধাক্কা সামলাইবে কেন?

সেইন-গোপ্তা সাহেব বীরদর্পে বলিলেন, আমরা ঐ খদ্দর এক শ টুকরা করিয়া লেঙটী পরি। নলিনীরঞ্জন কহিলেন, সে জানি, কিন্তু এক শ টুকরা কেন, উহার একগাছি করিয়া সূতা ভাগ করিয়া দিলেও যে ভাগে কুলাইবে না।

সুভাষ বলিলেন, বস্ত্র বয়কট পরে হইবে, আপাততঃ মহাত্মাজির বয়কট সহিবে না।

কিরণশঙ্কর কহিলেন, ঠিক, ঠিক! মহাত্মা আসিলেন, লোকমুখে খবর লইয়া দেশে ফিরিয়া certificate পাঠাইয়া দিলেন, 'ফিলিস্ সরকাস' মন্দ জমে নাই!

নেতারা টু শব্দটি করিলেন না, পাছে রাগ করিয়া তিনি স্বরাজের চাবি-কাটিটি আটকাইয়া রাখেন! বাঙলা দেশের যেখানে যত আশ্রম ছিল, তাহার তপস্বীরা বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল,—কেমন? করো একজিবিশন!

আমরা বাইরের লোকেরা ভাবি, complete independence বটে! তাই Dominion Statusএ এদের মন উঠে না। আরও একটা কথা ভাবি, এ ভালই হইয়াছে যে, দেশবন্ধু স্বর্গে

গিয়াছেন। 'ফিলিস্ সরকাসের' বিবরণ Young Indiaর পাতায় তাঁহাকে চোখে দেখিতে হয় নাই।

শুনিয়াছি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে এবার নেহেরু-রিপোর্ট পাশ হইয়াছে। বহুবিধ ছল-চাতুরিপূর্ব্বক সেই আরজি অবশেষে বিলাতী পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে। আশা তো ছিলই না, তবে সে দেশের পার্লামেণ্ট নাকি এবার মেয়েদের হুকুমমত তৈরী; সুতরাং এখন তাহারাই একপ্রকার ভারতের ভাগ্যবিধাতা। প্রবাদ, মেয়েরা দয়াময়ী, এবার তারা যদি এ দেশের দুর্ভাগা পুরুষদের কিছু দয়া করে। আমেন! ইতি—

['বেণু', আশ্বিন ১৩৩৬]

বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ভুল করেছে—এমনি একটা চীৎকার কিছু দিন ধরে শুনচি। এই কোলাহলের মধ্যে সত্য বস্তু আছে কতটুকু, তার বিচার কিন্তু হয় নি।

নিজে আমি কোন দিনই হঠাৎ কোন বিষয়ে ধারণা গড়ে নিতে পারিনে। যারা জোর গলায় প্রচার করে যে, তাদের দাবীই প্রবল, সহজে তাদের কথাও আমি স্বীকার করে নিইনে। তাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই যুক্তিহীন নিন্দা প্রচার আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।

যিনি এই নব-আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েচেন, তাঁকে আমি একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্ম্মী হিসেবে শ্রদ্ধা করি; দেশের রাজনৈতিক সাধনার ইতিহাসে দান তাঁর কম বলেও মনে করিনে।

কিন্তু দেশের প্রতি দুঃখবোধ তাঁর কংগ্রেসের চেয়েও বেশী. এ কথা প্রমাণের জন্য নূতন কোন দল গঠনের প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকাল লড়াই করে এসেচে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। আজ তাকে ছোট প্রমাণ করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগত গৌরব কারও কিছুমাত্র বেড়েচে কি না জানিনে, কিন্তু দেশের গৌরব বুঝি এতটুকুও বাড়ে নি।

দেশসেবা জিনিসটা যত দিন ধর্ম্ম হয়ে না দাঁড়ায়, তত দিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতিদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ্। মহাত্মা জানেন এবং ওয়ার্কীং কমিটিও জানেন যে, ভুল তাঁরা করেন নি। মালব্যজী এবং অ্যানের বিরুদ্ধাচরণও মহাত্মাকে বিচলিত করে নি। সুতরাং তিনি যদি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগই করেন, তার সঙ্গে এ গোলযোগের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েচেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্ব্বলতা অস্বীকার করা চলে না।

একটা কথা আমি জানি যে, বাংলা দেশের মুসলমানরাও 'জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট' চাইতে সুরু করেচেন। তা না হ'লে গলদ কোথায়, তা তাঁরা ভাল করেই জানেন। এ কথা ভুললে চলে না যে, অধিকাংশ ধনী মুসলমানই নায়েব, গোমস্তা, উকিল, ডাক্তার হিসেবে স্বজাতির চেয়ে হিন্দুদের বিশ্বাস করেন বেশী। সঙ্গে সঙ্গে এও আমি বলি যে, প্রত্যেক হিন্দুই মনে প্রাণে ন্যাশন্যালিষ্ট।

ধর্ম্মবিশ্বাসেও তারা কারো হতে ছোট নয়। তাদের বেদ, তাদের উপনিষদ্, বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল। তপস্যার মানেই হ'ল চিন্তা। বহুজনের বহুতর চিন্তার ফলে যে ধর্ম্ম গড়ে উঠেচে, আইন-সভায় গুটিকত আসন কম হবার আশঙ্কায় তাকে সর্ব্বনাশের ভয় দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। ['নাগরিক', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১]

মহাত্মার পদত্যাগ

সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। খবরটা আকস্মিক নয়। কিছুদিন যাবৎ এমনি একটা সম্ভাবনা বাতাসে ভাসিতেছিল, মহাত্মা রাজনীতির প্রবাহ হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া স্বীয় বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিরাট্ কর্ম্মশক্তি ও একাগ্র চিত্ত ভারতের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিবেন। তাহাই হইয়াছে। দেখা গেল, জাতীয় মহাসমিতির সভামণ্ডপে বহু কর্ম্মী, বহু ভক্ত, বহু বন্ধুজনের আবেদন নিবেদন, অনুনয় বিনয় তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। পারার কথাও নয়। বহু বার বহু বিষয়েই প্রমাণিত হইয়াছে, অশ্রুধারার প্রবলতা দিয়া কোন দিন মহাত্মাজিকে বিচলিত করা যায় না। কারণ, তাঁর নিজের যুক্তি ও বুদ্ধির বড় সংসারে আর কিছু আছে, বোধ হয় তিনি ভাবিতেই পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলি না, এ বুদ্ধি সামান্য বা সাধারণ। এ বুদ্ধি অসামান্য, অসাধারণ। অনুরাগিগণের ঢাকিয়া রাখার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ বুদ্ধি তাঁহার কাছে অবশেষে

এ সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে যে, কংগ্রেসে তাঁহার প্রয়োজনীয়তা অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য শেষ হইয়াছে, অথচ বিস্ময় এই যে তাঁহার দুঃসহ প্রভুত্বে যাঁহারা নিজেদের উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত জ্ঞান করিয়াছেন, মহাত্মার চিন্তা ও কার্য্যপদ্ধতির অনুধাবন করিতে পদে পদে যাঁহারা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন, নেপথ্যে অনুযোগ অভিযোগের যাঁহাদের অবধি ছিল না, তাঁহারাও সে কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। বরঞ্চ, নানারূপে তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য যত্ন করিয়া সেই নেতৃত্বেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রাণপণ করিয়াছেন। বোধ করি, শঙ্কা তাঁহাদের এই যে, এত বড় ভারতে নেতৃত্ব করিবার লোক আর তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও এ কথা বলিব যে, যেখানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন অভিমত বারম্বার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহাসমিতিকে পঙ্গুপ্রায় করিয়া আনিয়াছে, সেখানে মহাত্মার, অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌম আধিপত্য কল্যাণকর নয়।

আজ মহাত্মার মত, পথ ও যুক্তির আলোচনা করিব না। চরকায় দেশের অধোগতি প্রতিহত করিতে পারে কি না, অদ্রোহ অসহযোগে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনিতে পারে কি না, আইন অমান্য আন্দোলনের শেষ পরিণাম কি, এ সকল প্রশ্ন আজ থাক। কিন্তু মহাত্মার এ দাবী সত্য বলিয়াই স্বীকার করি যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

এক দিন কংগ্রেস আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিত। বঙ্গ-বিভেদের দিনেও জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গকে তাহার অঙ্গ বলিয়া

ভাবিতে জানিত না, বাঙ্গলার প্রশ্ন ছিল শুধু বাঙ্গালারই, বোম্বাই-অহমদাবাদ বাঙ্গালীকে এক টাকার কাপড় চার টাকায় বিক্রী করিত, কংগ্রেস নিরুপায় বিস্মিত চক্ষে শুধু চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন, অক্ষম জাতীয় মহাসমিতিকে নিজের অদম্য, অকপট বিশ্বাসের জোরে সমগ্রতা আনিয়া দিলেন মহাত্মা, দিলেন শক্তি, সঞ্চারিত করিলেন প্রাণ, তাঁহার এই দানই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিব। উত্তর কালে হয় তো তাঁহার মত ও পথ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শের হয় তো চিহ্নও থাকিবে না, তথাপি, তিনি যাহা দিয়া গেলেন, সমস্ত পরিবর্ত্তনের মাঝেও তাহা অমর হইয়া রহিবে। শৃঙ্খলমুক্ত ভারত ঋণ তাঁহার কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। আজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তিনি বাহিরে আসিয়াছেন মাত্র, কিন্তু ইহাকে ত্যাগ করেন নাই, করিবার উপায় নাই। যে শিশুকে তিনি মানুষ করিয়াছেন, সে আজ বড় হইয়াছে। তাই তাহাকে নিজের কঠিন শাসনপাশ হইতে মহাত্মা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলেন। ইহাতে শোক করিবার কোন কারণ ঘটে নাই,—এই মুক্তিতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে, এই আমার আশা।

[কিশলয়, ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৪।]

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১)

বাঙলার হিন্দু জনগণের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন। এই বিশাল সভা কেবল মাত্র এই নগরের নাগরিকগণের নয়। আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা বাঙলার বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। সকলের বর্ণ হয়তো এক নয়, কিন্তু ভাষা এক সাহিত্য এক, ধর্ম্ম এক, জীবনযাত্রার

গোড়ার কথাটা এক,—যে বিশ্বাস যে নিষ্ঠা আমাদের ইহলোক পরলোক নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানেও আমরা কেউ কারো পর নয়। পর করে দেবার নানা উপায়, নানা কৌশল সত্ত্বেও বলবো, আমরা আজও এক। যুগ-যুগান্ত থেকে যে বন্ধন আমাদের এক করে রেখেছে, সত্যিই আজও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি।

বাঙলার সেই সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভার উদ্যোক্তা, তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি—এই বিপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে।

একটা প্রথা আছে সভাপতির পরিচয় দেওয়া; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিরাট্ নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন বিশেষণ যোগ করা যায়? বিশ্ব-কবি, কবিসার্ব্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষে পূর্ব্বেই আরোপ করে রেখেছে। কিন্তু আমরা—যাঁরা তাঁর শিষ্য-সেবক—নিজেদের মধ্যে শুধু 'কবি' বলেই তাঁর উল্লেখ করি।—বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ। জানি, সভ্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝবার পক্ষে কারও অসুবিধে ঘটবে না। কবির মন ক্লান্ত, দেহ দুর্ব্বল, অবসন্ন। এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাঁকে আহ্বান করে আনা বিপজ্জনক। তবু তাঁকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দুনিয়ার কারও না অবিদিত থাকে এই সভার নেতৃত্বের ভার বহন করলেন কে? কবি স্বীকার করলেন, বললেন, ভালো, তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের মুখ দিয়েই তবে ব্যক্ত হোক।

তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।

ভারত রাজ্য-শাসনের নূতন যন্ত্র বিলাতের মন্ত্রিগণ বহু দিনে

বহু যত্নে প্রস্তুত করেছেন। জাহাজে বোঝাই দেওয়া হয়েছে,—এলো বলে। তার ছোট বড় কত চাকা, কত দণ্ড, কত কলকব্জা, কোন্‌টা কোন্ দিকে ঘোরে কোন্ দিকে ফেরে কোন মুখে এগোয় আমরা কেউ ঠিক জানিনে। এবং মূল্য তার শেষ পর্য্যন্ত যে কি দিতে হবে, সে ধারণাও কারও নেই। যন্ত্র নির্ম্মাণের সময় মাঝে মাঝে শুধু খবর পাওয়া যেত, এদেশ থেকে ওদেশে বহু বুদ্ধিমান্ চালান দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধি দেবার জন্যে। কি বুদ্ধি তাঁরা দিলেন, সে সূক্ষ্মতত্ত্ব আমরা সাধারণ মানুষে বুঝিনে, কেবল এইটুকু বোঝা গিয়েছিল, এক পক্ষ তারস্বরে অনেক চীৎকার করেছিলেন ও নূতন যন্ত্রে তাঁদের কাজ নেই এবং অপর পক্ষ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আলবৎ কাজ আছে,—চেঁচিও না। অতএব কাজ আছে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতেই হ'লো। অনেকের [illegible]ণা, সেটা নাকি মস্তবড় আকমাড়া কলের মতো। তার এক [illegible]ক জমা হবে ছিবড়ে, অন্য দিকে রস। শেষেরটা পাত্রে সঞ্চিত হ[illegible] কোন্ দিকে চালান যাবে, সে প্রশ্ন শুধু বাহুল্য নয়, হয়তো বা [illegible]বৈধ। ভয় আছে। তথাপি প্রশ্ন করা চলে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় [illegible] বিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড়? আর মানুষ হ'লো [illegible]ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যা[illegible] [illegible]য় নি, এই দুর্ভাগ্য দেশে তাই কি হ'লো Special and pec[illegible]r circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trusteeরা ছাড়া?

কিন্তু এ হ'লো Politics, এ আলোচনা করবার ভার নেই আমার উপর। এ বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরাই এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবার যোগ্য পাত্র। আমি নয়।

তবুও পরিশেষে একটা কথা বলে রাখি। কারো কারো ধারণা—আমরা বিলেতে memorial পাঠিয়েছি সুবিচারের আশায়। সে বিশ্বাস আমাদের কারও নেই, আমরা পাঠিয়েছি অন্যায়ের প্রতিবাদ। নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাঙলার হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো সবচেয়ে বেশি। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হলো

চিরদিনের মতো। তথাপি এ কথা সত্য যে, দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ পনেরোটা স্থান বেশি পেয়েছে বলে তাঁদের প্রতি আমাদের ক্রোধ নেই। কিন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা, তাঁদের বলতে চাই,—অন্যায়, অবিচার—এক জনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্য্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।*

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (২)

নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে—এতবড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না। অনেকে হয় ত এই মনে করবেন যে, এই অবিচারের প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই এবং এই মনে করেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তা সত্য নয়; যদি এই অন্যায়কে রোধ করবার ক্ষমতা কারও থাকে, সে আমাদেরই আছে।

নিজের শক্তিমত আমি আজন্মকাল সাহিত্যসেবা করে এসেছি,—যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায়;—এবং এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন হতে চ'লেছে যে, আমার ভয় হয়—হয় ত ১০ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের আর এক যুগ এসে পড়বে;—হয় ত রবীন্দ্রনাথ সে দিন থাকবেন না, আমিও হয় ত ততদিন আর থাকব না। তাই এখন হতে সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটি হীন প্রচেষ্টা চলছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর; কেউ বলছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার

---

* ১৫ জুলাই ১৯৩৬ তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভার উদ্বোধন-বক্তৃতা। [বাতায়ন, ১ শ্রাবণ ১৩৪৩]

কর ; আবার কেউ বা বলছেন, এতগুলি 'উর্দ্দ' কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ,—যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ীর সমস্ত জিনিষ কেটে বেড়ায়, এ-ও সেইরূপ।

তার পর এত বড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হোল, এ তাঁরা জেনেও নীরব হ'য়ে রইলেন—এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে, এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল—একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই ; তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে, এও কি তাঁরা ভাবেন না। এ রকম করে ত আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটা জাতি বাঁচতে পারে না—এটাও ত তাঁদের জন্মভূমি। দেখুন, কেবল দিলেই হয় না,—গ্রহণ করার, বলবার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হোল—একদিন টের পাবেন, এত বড় ভুল আর নেই।

আমি আমার মুসলমান ভায়েদের বলচি, তোমরা সংস্কৃতির উপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো আর ছোট ছেলের মত ধারালো ছুরী হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।

আমার মতে অন্যায় স্বীকার করতে নেই, যথাসাধ্য প্রতিকার করতে হয় ; তাই দিয়েই মানুষ মানুষ হ'য়ে ওঠে। এই যে অন্যায়টা আমাদের উপর হয়েছে, তার প্রতিকার করতেই হবে ; যদি না পারি, তা হলে দশ বৎসর পরে—বাঙ্গালী আজ যা নিয়ে গৌরব করছে—তার আর কিছুই থাকবে না। তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতখানি পারি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো ; কারণ, এই অন্যায় যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে দেশে না হিন্দুর, না মুসলমানের, না কারো কখন মঙ্গল হবে।*

* এলবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির বক্তৃতা। ['বাতায়ন', ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩]

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী
আনন্দচন্দ্র মিত্র

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী
আনন্দচন্দ্র মিত্র

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫২

মূল্য ৬০ ন. প.

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২৫।১।১৯৬৩

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

(১৮৫৪—১৯৩০)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হরিশ্চন্দ্র কলিকাতা বাগবাজারের প্রসিদ্ধ নিয়োগী-বংশে ১২৬১ সালের ভাদ্র মাসে (ইং ১৮৫৪) জন্মগ্রহণ করেন।* তাঁহার পিতার নাম—কৃষ্ণকিশোর। বাগবাজারে রসিক নিয়োগীর ঘাটের কথা অনেকের নিকটই অবিদিত নহে, এই রসিক নিয়োগী ছিলেন কৃষ্ণকিশোরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রসিকের পৌত্র ভুবনমোহন নাট্যজগতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে সুপরিচিত। কৃষ্ণকিশোর সুপণ্ডিত ছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

> "ভুবনের খুল্লপিতামহ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, আর খরচপত্র সম্বন্ধে এত সাবধানী যে, পাড়ার লোক প্রাতঃকালে তাঁর নাম মুখে আনতো না। কিন্তু আমি বরাবর তাঁর নাম করেছি ও করি, কেন না, যে মহাপুরুষ কীটের পরিপুষ্টির জন্য লক্ষাধিক মুদ্রার বই কিনে রেখে যেতে পারেন, সখে একটা দশ হাজার টাকার দূরবীণ কিন্‌তে পারেন, তাঁরে যে কৃপণ বলে, সে একান্ত কৃপার

* শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী পিতার এই জন্ম তারিখ আমাকে জানাইয়াছেন।

পাত্র।"—"ভুবনমোহন নিয়োগী", 'মাসিক বসুমতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

হরিশ্চন্দ্র পিতার কৃতী পুত্র। তিনি পাঠ আরম্ভ করেন—জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে। এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহশিক্ষকের সাহায্যে তিনি বাড়ীতেই লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্যারীমোহন সুরের কন্যা বিনোদকামিনীকে বিবাহ করেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তি স্ফুরিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮২ সালে) তিনি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময় "শ্রীহঃ—" স্বাক্ষরে তাঁহার অনেক কবিতা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী,' যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্য্যদর্শন' ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধবে' প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী কালে হরিশ্চন্দ্রের বহু কবিতা 'জন্মভূমি,' 'সাহিত্য,' 'সাহিত্য-সংহিতা,' 'সাহিত্য-সংবাদ,' 'সঙ্কল্প' প্রভৃতি পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৫ এপ্রিল ১৯৩০ তারিখে, ৭৬ বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার উল্টাডিঙ্গীস্থ বাসভবন—'বিনোদকুঞ্জে' পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থাবলী

হরিশ্চন্দ্র যে-কয়খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল।

১। **দুঃখসঙ্গিনী** (গীতিকাব্য)। ১২৮২ সাল (২০ অক্টোবর ১৮৭৫)। পৃ. ১০৪।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্য-রচনা "ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী" ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও

প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে 'দুঃখসঙ্গিনী' সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> 'সরোজিনী' ও 'প্রতিভা' পড়িতে পড়িতে আমরা 'দুঃখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। 'দুঃখসঙ্গিনী'তে আর্য্য সঙ্গীত নাই, আর্য্য রক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই ; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই।…দুঃখসঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি, তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, সেইখানকার ভাষাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে। এই পুস্তকের মধ্য হইতে আমরা অনেক সুন্দর পংক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে পারিলাম না।

'দুঃখসঙ্গিনী' পুস্তকখানি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ইহার এক খণ্ড বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে আছে।

'বান্ধব' (পৌষ ১২৮২), 'আর্য্যদর্শন' (ফাল্গুন ১২৮৩) ও 'বঙ্গদর্শনে' (ফাল্গুন ১২৮৯) 'দুঃখসঙ্গিনী'র দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচনাগুলিতে পুস্তকের বহুলাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। **ভারতে সুখ** (কবিতা)। ১২৮২ সাল (২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫)। পৃ. ১৬।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ ভারতে আগমন করেন। এই উপলক্ষে 'ভারতে সুখ' রচিত হয়।

১২৮২ সালের পৌষ-সংখ্যা 'আর্য্যদর্শনে' ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বান্ধবে' 'ভারতে সুখ' পুস্তিকার বহুলাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩। বিনোদমালা (গীতিকাব্য)। ১২৮৫ সাল (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮)। পৃ. ২৪৪।

সূচী :—বসন্ত উচ্ছ্বাস, সোহাগ, মলিন কুসুম, পরিত্যক্তা রমণীর প্রতি, নয়নে জল, অনন্ত সুখ, কোন এক রমণীর প্রতি, সেই দিন, কোন একটি রমণীকে কাঁদিতে দেখিয়া, কোন রমণীর প্রতি, কোন এক রমণীর প্রতি, প্রাবৃট্ যামিনী, দুহিতার প্রতি, শারদ পার্ব্বণ, বিগত সুখ, মিনতি, কতকগুলি রমণীকে দেখিয়া, বিচ্ছেদকালে, কেন আজি চারু বেশ, শ্রীমতী—দেবীর প্রতি, সঙ্গীত শ্রবণে, কোমল কুসুম কেন কণ্টক কাননে, নর্ম্মদার প্রতি, কোথা আজি সেই দিন, ভুলিব কেমনে, সম্মিলন, হেরিনু বিষণ্ণময়ী প্রতিমা আবার, দোল-উৎসব, একটি রমণীর প্রতি, সুখ নিশি, পরিত্যক্ত পল্লী।

প্রথম সংস্করণের 'বিনোদমালা'র এক খণ্ড কা[illegible]ার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে। ইহা ১২৮৯ সালের ফাল্গুন-[illegible] 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই ডক্টর সুকুমার [illegible]ন পুস্তকের প্রকাশকাল "১২৮৯ সাল" ধরিয়াছেন!

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ২৫১) প্রকাশিত হয় [illegible]৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে। এই সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" সুরে[illegible] সমাজপতি লেখেন :—"বহুকাল পূর্ব্বে গ্রন্থকারের 'বিনোদমালা' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' নামক দুইখানি গীতিকাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে এতদিন উভয় গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ হয় নাই। এক্ষণে, 'দুঃখসঙ্গিনী' ও 'বিনোদ-মালা'র কতকগুলি কবিতা একত্র নিবদ্ধ ও সজ্জিত হইয়া 'বিনোদমালা' নামে প্রকাশিত হইল। 'বিনোদমালা'র বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নূতন কবিতা সন্নিবিষ্ট ও পূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতাগুলি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে।"

২য় সংস্করণ পুস্তকের সূচী :—উপহার, আক্ষেপ, অমৃতে গরল,

তরু, পূর্ব্বস্মৃতি, সন্ধ্যা, সরস্বতী-পূজা, উচ্ছ্বাস, যামিনীর প্রতি, চারু-শোভা, জন্ম-ভূমি, বসন্ত-উচ্ছ্বাস, পরিত্যক্তা রমণীর প্রতি, বিগত সুখ, সঙ্গীত-শ্রবণে, সম্মিলন, নর্ম্মদার প্রতি, দোল-উৎসব, অকাল বাসনা, শারদোৎসব, ভালবাসার তুলনা, অনন্ত সুখ, সমাধি-দর্শনে, মলিনমুখী, স্থির-সৌদামিনী, পরিত্যক্ত পল্লী, কেন আজি এ মিনতি ?, হাসিও না, প্রার্থনা, সমাপ্তি।

৪। **মালতী-মালা** (গীতিকাব্য)। ১৩০৬ সাল (২৩ আগষ্ট ১৮৯৯) পৃ. ২৬৭।

সূচী :—আবাহন, অতৃপ্ত-বাসনা, প্রেম-পূর্ণিমা, বিষণ্ণ-প্রতিমা, বিদায়, সমাধি-দর্শনে, শারদ-পার্ব্বণ, কামিনী-ফুল, প্রেম-পরিণাম, উৎসর্গ, কালের শাসন, প্রকৃতির প্রতি, রোগ-শয্যা, উষা, অকাল-কুসুম, প্রতিকৃতি, সহোদরার প্রতি, বউ কথা কও পাখী, দামোদরের প্রতি, বীজন-উপহার, আঁখি-জল, অয়স্কান্ত মণি, নিপীড়ন, হিপারেটীর প্রত্যাখ্যান, মাঘী-পূর্ণিমা, কাল-সিন্ধু, বুল্‌-বুল্‌, ভালবাসা, প্রার্থনা, সমাপ্তি।

৫। **সন্ধ্যামণি** (গীতিকাব্য)। ১৩৩৩ সাল (১২ জুলাই ১৯২৬)। পৃ. ৩২৭।

সূচী :—উপহার, আক্ষেপ, সন্ধ্যা, পতিহীনা, বরিষা, ভারতবর্ষ, অশোক-অষ্টমী, তরু, শারদোৎসব, স্মৃতি-অর্ঘ্য, উষা, নিয়তি, পরিত্যক্ত-পল্লী, বউ কথা কও পাখী, হাসিও না, জীবনাঞ্জলি, উন্মাদিনী, বিধুরা, প্রণাম, ক্লিওপেট্রা, অনুতপ্তা, শেষ, চৈত্রসংক্রান্তি, অশ্রুজল, কালসিন্ধু, মাঘী-পূর্ণিমা, অশ্রু-অর্ঘ্য, প্রণতি, সমাপ্তি।

'সন্ধ্যামণি'র প্রায় অর্দ্ধেক কবিতা 'বিনোদমালা' ও 'মালতী-মালা' হইতে গৃহীত।

হরিশ্চন্দ্র কয়েকখানি উপহার-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; সেগুলি—

(ক) **প্রীতি-উপহার**। ইহা "১৩০৬ সালের ৩রা আষাঢ় মেদিনীপুর অন্তর্গত নাড়াজোলে [illegible]জা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খানের কন্যা শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরীর সহিত শ্রীমান্ সুশীল-চন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে রচিত"।

(খ) **স্নেহ-উপহার**। ইহা ২ আষাঢ় ১৩২০ তারিখে কন্যা স্নেহলতার পরিণয়োপলক্ষে রচিত।

(গ) **শারদোৎসব**। ইহা গতপূর্ব্ব ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় কোন রাজ-প্রতিনিধিকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত।

হরিশ্চন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রভাবের যুগে যে কয়জন কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহিত গীতিকাব্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করেন, কবিবর হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী তাঁহাদের অন্যতম। দেশপ্রেমের কবিতা তাঁহার গ্রন্থে নাই, এমন নয়; কিন্তু দেশাত্মবোধ অপেক্ষা ব্যক্তিগত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই তাঁহার রচনায় সমধিক পরিলক্ষিত হয়। গভীরতা নয়, ভাবের আবেশই তাঁহার কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তিনি মূলতঃ প্রেমের কবি। তাঁহার শক্তি নানা বিষয়িণী না হইলেও প্রেমের কবিতায় তাঁহার একটি নিজস্বতা আছে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতে কয়েকটি কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া নিম্নে মুদ্রিত হইল।

বিনোদমালা

জন্মভূমি

১৩

তুমিই কি সেই মম জনম-ভবন—
জননী সমান চিরস্নেহস্বরূপিণী !
তোমারি উৎসঙ্গে কি মা লভেছি জনম ?
তুমি কি নয়নে চির আনন্দদায়িনী ?
খেলেছি কি মা তোমার সুকোমল কোলে
সরল শৈশব কালে নাচিয়া নাচিয়া,
বিকচ অধরপুটে মৃদুল হাসিয়া
শৈশবের মধুময় আনন্দ-হিল্লোলে ?

১৪

কেন আজি জননী গো বসিয়া বিজনে,
অনন্ত মনের দুঃখে করিছ রোদন ?
কেন হেরি ম্রিয়মাণ ম্লান দু'নয়ন ?
কি বিরাগ বল মাতা পশেছে মরমে ?
একদিন ছিলে তুমি রাজরাজেশ্বরী—
মোহিয়া নয়ন মন রূপের ছটায়,
কেন তবে কোন্ দুঃখে ভুবনসুন্দরি !
পড়ে আজি অনাথিনী কাঙ্গালিনী-প্রায় !

১৫

রত্নমণি নিরুপম অঙ্গ-আভরণ,
কি বিষাদে তা'সবারে দিলে বিসর্জ্জন
অনন্ত অতল ভীম জলধির জলে ?
কিম্বা সর্ব্বহর কাল কেড়ে নিল বলে ?
কেন মা তোমায় হেরি এহেন দশায়,
অচল নিষ্প্রভ দুটি কমল-নয়ন,
সুচির বিষাদে মাখা প্রসন্ন বদন,
মলিন বসনখানি ভূতলে লুটায় ?

কেন আজি এ মিনতি ?

১২

এখনও যে আছে বেলা, সন্ধ্যার শ্যামল ছায়া
ঢাকে নাই, দেখ, ফুল্ল-মল্লিকার কম-কায়া ;
দিবসের মণি ভাতি
বিমল আঁচল পাতি,
ধরিতেছে দিবা সতী, পড়েনি পশ্চিমে ঢলে,
তবে কেন তাড়াতাড়ি বল যেতে ঘরে চলে ;

১৩

এখনও সাধের খেলা নহে, দেখ, অবসান ;
বাকি আছে কত খেলা, কত সাধ পূর্ণ প্রাণ ;
সেই খেলা না খেলিয়ে,
অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে,

কেমনে যাইব চলি, মরমে জ্বলিবে জ্বালা,
কেমনে খুলিব পদ, জড়িত শৃঙ্খল মালা!

১৪

পড়ুক দিবস-মণি ঢলিয়া পশ্চিম গায়,
আবরি জগতী-তল আঁধারের প্রতিভায়;
কি ক্ষতি আঁধার নিশি,
মধুরে উজলি দিশি—
বাসন্তী পূর্ণিমা যে গো ঢালিয়া আলোকছায়,
এ নিবিড়-বন-মাঝে হরিবে সে অন্ধকার।

১৫

যাইব না ঘরে আমি, যেও না হৃদয়-রাণি!
বাকি খেলা খেলি, এস, মিনতি জুড়িয়া পাণি;
সে মোহ আকুল মনে,
সেই সুখ সম্ভাষণে,
জুড়িয়া যুগল প্রাণ খেলিব যে পুনরায়;
জলদে পশিলে শশী, আলোকি'ব চপলায়!

সন্ধ্যামণি

কালসিন্ধু

আজি মধ্য-পারাবারে,
তরঙ্গ বিদায় করি,
কালের চপল স্রোতে ভাসে জীবনের তরী।

ত্যজিয়া সে উপকূল,
আসিয়াছি কত দূরে,
দেখিতেছি আজি তাহা হাসিতেছে সুমধুরে।

নিশা-শেষে স্বপ্ন-চিত্র
যথা দুঃখ-সুখ-ময়,
গত চিত্র সেই মত আজি কত বোধ হয়!

সে সমুদ্র-উপকূলে,
সেই বেলা-ভূমে বসি,
দেখিলাম কত ফুল জলে তার পড়ে খসি।

সে অনন্ত জল-স্রোতে,
ক্রমে একে একে করি,
ফেলিলাম কত ফুল ছিঁড়ি বীচি-হার 'পরি।

নীহার-সম্পাত-সিক্ত
রুচির কমলোপম,
দেখিলাম ফুলগুলি নিয়ে গেল তরঙ্গম।

কৃতান্ত সমীর বলে,
কাল সাগরের জলে,
নাহি জানি নিয়ে গেল হায়, কোন্ দূর-স্থলে!

ভাসাইয়া দিনু যাহা,
এ জনমে পুনরায়,
উজানে লহরী ঠেলি কে ফিরাবে বল তায়?

বৎসরে বৎসরে যাহা,
ফেলিয়া দিলাম তুলি,
হে সিন্ধু, তোমার জলে, স্নেহ-মাখা ফুলগুলি।

হে সিন্ধু, উজানে বহি,
চরণে মিনতি করি—
আনিবে কি ফুলগুলি,—দেখিব নয়ন ভরি ?
একবার নিয়ে এস
সে ফুটন্ত ফুলদাম ;
জুড়াইব হেরি তাহা শোক-বিকলিত প্রাণ !
কতগুলি ভাসাইনু,
না ফুটিতে পূর্ণ-দলে,
কত পূর্ণ-স্ফুট-ফুল ফেলিলাম তব জলে !
দেখিতে যে সাধ মনে,
সে অস্ফুট ফুলগুলি,
সেই মত আছে কিম্বা হাসে পূর্ণ-দল খুলি !
হে সিন্ধু, আঘাতে-ঘাতে,
দূরে কিম্বা সন্নিকটে,
কত দ্রব্য ভাসাইয়া আনিতেছ তব তটে ;
সেই ঘাত প্রতিঘাতে,
উজানের স্রোতঃ-জলে
দেখাও বারেক আনি সে ভ্রষ্ট-কমল-দলে !
একবার নিরখিব,
দেখিব না পুনরায়,
করিব বারেক হেরি তিরপিত বাসনায় !
... ...
পোড়াইয়া চিতানলে,
হে সিন্ধু, তোমার জলে—
একে একে ভাসাইয়া দিয়াছি সে ফুল-দলে !

যে ক'টি কুসুম তুলি,
দিনে দিনে ধীরে ধীরে,
ভাসাইনু একে একে তব চল-স্রোতঃ-নীরে,
যে অমূল্য মণিগুলি,
ছিঁড়িয়া এ কণ্ঠহার,
সমর্পিনু তব কোলে রাখিবারে অনিবার ;
সে ফুটন্ত ফুলগুলি,
সেই মণি অতুলন,
জন্মশোধ তব কাছে করিয়াছি সমর্প
চাহি না তোমার কাছে
ফিরাইয়া পুনঃ তায়,
কেবল বারেক আজি নিরখিতে সাধ যায় !

... ...

অম্লান বদনে, সিন্ধু,
এখনি এ কলেবর
ভাসাইব হাসিমুখে তব জলে নিরন্তর।
হায় রে মায়ার বিশ্ব,
ভাসাইতে পারি বটে,
অবশিষ্ট ফুলগুলি রাখি কার সন্নিকটে ?
হে বিধি ! কি মায়াজালে
সৃজিয়াছ এ সংসার,
কে ছিঁড়ে জগতে তব এ হেম-শৃঙ্খল-ভার ?
অবোধ মানব আমি
কাঁদিতেছি হাহাকারে
অবশিষ্ট ফুলগুলি তবু বাসি বারে বারে।

যে যাবার চ'লে গেছে
আসিবে না পুনঃ আর,
অবোধ মানব কালে বারিবে সে আঁখি-ধার ;
ঘুচিবে এ অনাহার,
হবে ক্ষুধা নিবারণ,
সময়ে এ শোক-দৃশ্য হবে পরিবরতন ।
আনন্দ-বিষাদ-ময়
এই বিশ্ব-নিকেতন,
কেমনে রচিল বিধি, কে করিবে নিরূপণ ?
কালের দুরন্ত স্রোত,
কে বল রোধিতে পারে,
জন্মিল অজড় জড় সেই জলে ভাসিবারে ।
কাঁদি আমি এক বার,
কাঁদি আমি শত বার,
সে অনল-দগ্ধ-মুখ দেখিব না জন্মে আর ;
কৃতান্ত আপনি যদি—
ইচ্ছা করে পুনরায়,
পারিবে না সেই মুখ দেখাইতে কভু হায় !
মানবে নিয়তি-ডোরে
বাঁধিয়াছে বিধাতায়,
খুলিবারে সে বন্ধন নাহি তাঁর ক্ষমতায় ;
আপনি বিধাতা যদি
করে পুনঃ আকিঞ্চন,
নাহি সাধ্য খুলিবারে নিয়তির সে বন্ধন ।
নিয়তির সে বন্ধন
কে পারে ছিঁড়িতে হায় ?
প্রত্যেক মানব বদ্ধ সে নিয়তি শৃঙ্খলায় ।

আনন্দচন্দ্র মিত্র

(১৮৫৪—১৯০৩)

পরিচয়

ঢাকা—বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে আনুমানিক ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নবেম্বর (১৩ অগ্রহায়ণ ১২৫৯) আনন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—বঙ্গচন্দ্র মিত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, আর্থিক অভাবের জন্য জমিদার-সরকারে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই কার্য্য মনঃপূত না হওয়ায় আনন্দচন্দ্র দীর্ঘকাল শিক্ষকতা-কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কলিকাতা করপোরেশনের অধীনে ডেপুটি লাইসেন্স অফিসারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। সাধুতা ও যশের সহিত এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

২২ ডিসেম্বর ১৯০৩ (৭ পৌষ ১৩১০) কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থাবলী

আনন্দচন্দ্র সুকবি ছিলেন। পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি-সমাজে তাঁহার একটি নির্দ্দিষ্ট আসন ছিল। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। **মিত্রকাব্য**

১ম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৬ শক (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ৬০।

২য় খণ্ড। মার্চ্চ ১৮৭৭

মিত্রাক্ষরে লিখিত কবিতার সমষ্টি বলিয়া পুস্তকের নাম 'মিত্রকাব্য'। ইহার এক খণ্ডে সম্পূর্ণ পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ [illegible] বঙ্গাব্দে এবং ৩য় সংস্করণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশ, "স্বদেশানুরাগোদ্দীপক, সামাজিক, প্রেমবিষয়ক ও অন্যান্য নানা প্রকারের কবিতা ও গীতগুলি একত্রিত হইয়া মিত্রকাব্য নামে প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের বয়ঃক্রম যখন বিংশতি বর্ষ, ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হইয়াও, মিত্রকাব্য তখনই সাহিত্য-সমাজের যথেষ্ট স্নেহ লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থকারের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মিত্রকাব্যের কলেবর বৃদ্ধি, এবং তৎসঙ্গে সাহিত্য-সমাজেরও স্নেহের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, এবারও মিত্রকাব্য সেই স্নেহ অধিকতররূপে লাভ করিতে পারিবে।"

২। **হেলেনা কাব্য**

১ম খণ্ড।* ১৭৯৮ শক (২৮ এপ্রিল ১৮৭৬)। পৃ. ১১০।
২য় খণ্ড। ১৭৯৯ শক (২৮ এপ্রিল ১৮৭৮)। পৃ. ১০৯।

হোমারের ইলিয়দ অবলম্বনে অমিত্রচ্ছন্দে লিখিত কাব্য।

৩। **কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি?** (নাটিকা)
(৬ মে ১৮৭৮)। পৃ. ২৮।

ইহা "বিষ্ণুশর্ম্মা" রচিত। শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিতে' (পৃ. ২৪৬) লিখিয়াছেন :—"বজ্রযোগিনী-নিবাসী আনন্দচন্দ্র মিত্র, সুকবি বলিয়া সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; তিনি এই সময়ে কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিলেন।"

৪। **রাজকুমারী** অথবা বিক্রমপুরের পুরাবৃত্ত। (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ১৮০১ শক (ইং ১৮৭৯)। পৃ. ১৯৪।

* ১৭৯৯ শকের শেষার্দ্ধে (১ জানুয়ারি ১৮৭৮) ইহার একটি বিদ্যালয়পাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫। **মাতৃধর্ম্ম** (সন্দর্ভ)। ১ জানুয়ারি ১৮৮১। পৃ. ৪৮।

৬। **দুই ভাই** (আশ্চর্য্য উপাখ্যান)। ১ মাঘ ১২৯১ (২২ জানুয়ারি ১৮৮৫)। পৃ. ২৪।

লেখক রামতনু লাহিড়ীর অনুরোধে এজওয়ার্থের মর‍্যাল্ টেল্‌স্-এর আদর্শে নীতিবিষয়ক এই পুস্তকখানি রচনা করেন। ইহাতে সাতটি ক্ষুদ্র হিতোপাখ্যান আছে।

৭। **সঙ্গীতমালা**। (৮ নবেম্বর ১৮৮৫)। পৃ. ৮২।

৮। **ভজহরি** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২ নবেম্বর ১৮৮৬। পৃ. ১৭৯।

৯। **কাজের কথা**। ১ পৌষ ১২৯৫। পৃ. ৩৪।

"মিতাচার, সঞ্চয়, পরদুঃখ-কাতরতা ও আত্মত্যাগ প্রভৃতির উপকারিতা কথোপকথনছলে দৃষ্টান্তসহ বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়াই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।" সভাবাজার দাতব্য সভার জন্য লিখিত।

১০। **ভারতমঙ্গল,** পূর্ব্বখণ্ড, সটীক। ইং ১৮৯৪। পৃ. ৪০০।

"ইংরেজাধিকৃত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনে, প্রাচীন ভারতের ভক্তি, বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে, আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মশীলতার সংযোগ হইয়া, নিঃশব্দে যে, মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, ভারতের ব্রাহ্ম-সমাজ তাহারই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।...বিধাতার কৃপার ফলে, যে মহাপুরুষ ভারতে অভ্যুদিত হইয়া, এই মহাবিপ্লবের অধিনায়করূপে কার্য্য করিয়াছেন, সেই রাজর্ষি রামমোহন...ও এহেন মহাবিপ্লব লইয়া কাব্য লিখিতে উদ্যত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। সামান্য হইয়া কেন আমি এই মহাব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম?..."—ভূমিকা।

১১। **প্রেমানন্দকাব্য**। মাঘ ১৩০৩ (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১২৮।

"আমার রচিত ভক্তি ও বৈরাগ্য-উদ্দীপক গীত ও কবিতাগুলির কতক প্রকাশিত হইয়াছে, কতক প্রকাশিত হয় নাই। যাহা প্রকাশিত

হইয়াছে, তাহাও বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে রহিয়াছে। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঐ শ্রেণীর সমস্ত কবিতা ও গীত একত্র করিয়া প্রেমানন্দ-কাব্য নামে প্রচার করিলাম।"—ভূমিকা।

১২। **পরমার্থ প্রসঙ্গ** (ধর্মনীতি-বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ)। অগ্রহায়ণ ১৩০৬ (৩০ জানুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ১৭৯।

১৩। **ভিক্টোরিয়া গীতিকা**। (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৫২।

১৪। **মাতৃমঙ্গল** (ভজন-কাব্য)। ১৩০৮ সাল (৭ আগষ্ট ১৯০১)। পৃ. ১৫২।

ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম হিসাবে "প্রেমানন্দ" মুদ্রিত আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় আনন্দচন্দ্রের নাম দেওয়া আছে।

পাঠ্য পুস্তক :

আনন্দচন্দ্র অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের যে কয়খানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকালসমেত সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

১। কবিতা কুসুম (ইং ১৮৭১), ২। মিত্রপাঠ (ইং ১৮৭৮), ৩। ব্যবহার দর্শন—উপক্রমণিকা ভাগ (ইং ১৮৭৮), ৪। প্রবন্ধসার—১ম ভাগ (ইং ১৮৮২), ৫। পদ্যসার (১২৯৩ সাল), ৬। গদ্যসার (২০ ডিসেম্বর ১৮৮৬), ৭। পাঠসার (২৮ অক্টোবর ১৮৯০), ৮। সাহিত্যসার (৩০ অক্টোবর ১৮৯০), ৯। কবিতাসার (ইং ১৮৯৩), ১০। পদ্যশিক্ষাসার (ইং ১৮৯৭)।

তাঁহার রচিত অপরাপর পাঠ্য পুস্তকগুলির নাম :—উপাখ্যানসার, গৃহশিক্ষাসার, কাব্যসার, শিশুশিক্ষাসার বাল্য কবিতা, প্রবন্ধমুক্তাবলী, প্রবন্ধকুসুমাঞ্জলি, সমাজচিত্র প্রভৃতি।

সম্পাদিত গ্রন্থ : আনন্দচন্দ্রের সম্পাদনায় পঙ্কজিনী বসুর কবিতা-সংগ্রহ 'স্মৃতিকণা' (১ বৈশাখ ১৩০৮, পৃ. ১১৬) নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রকাশ, আনন্দচন্দ্র মিত্র ১৮৮৭ সনের ১৪ই মে 'নবযুগ' নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মধুসূদন, রঙ্গলাল প্রভৃতির আদর্শে বাংলা দেশে কবি ও কাব্যের প্লাবন আসিয়াছিল। অধিকাংশই পশ্চিম-বঙ্গীয়—পূর্ব্ববঙ্গের যে অল্প কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'মিত্রকাব্য' ও 'হেলেনাকাব্যে'র কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ আনন্দচন্দ্রের কাব্য লইয়া সবিশেষ মাতামাতি করিয়াছিলেন; ছাত্র-সমাজ তাঁহার নীতিমূলক কবিতাগুলি ('পদ্যসার', 'পদ্যশিক্ষাসার', 'কবিতাসার') বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। আজও পর্য্যন্ত তাঁহার অনেকগুলি সামাজিক, জাতীয় ও ব্রহ্মসঙ্গীত, রচয়িতার নাম ভুলিয়া আমরা স্মরণ রাখিয়াছি। আনন্দচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ ছিল ভাবাবেগ—তিনি অনর্গল রাশি রাশি কবিতা লিখিতে পারিতেন; এবং প্রকৃতপক্ষে এই অতিদ্রুততা তাঁহার কাব্যের পক্ষে মারাত্মক দোষও হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার কোনও কবিতাই দানা বাঁধিয়া গাঢ়বদ্ধ হইবার অবকাশ লাভ করে নাই। রাজকৃষ্ণ রায়ের মত তিনিও স্বদেশ-ভারত-পাগল ছিলেন। আধুনিক নায়ক (রামমোহন রায়) লইয়া তাঁহার 'ভারত-মঙ্গল' নামক মহাকাব্য রচনার প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত কাব্যের কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল।

মিত্রকাব্য ঃ

শিবাজীর যুদ্ধযাত্রা

(১)

ছাইল মোগল-সেনা মহারাষ্ট্র দেশ,
মুখে হাস্য নাই কার, চারি দিকে হাহাকার,
মহারাষ্ট্র-সৌভাগ্যের নাই আশালেশ ;
কত শত বীরচূড়া হয়েছে নিশেষ !

(২)

সহস্র অশনিনাদে গরজে কামান,
দশ দিক ধূমময়, "জয় দিল্লীপতি জয় !"
ঐ রব শুনে কাঁদে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ !
দুর্জ্জয় মোগল সেনা প্রলয় সমান !

(৩)

কত দুর্গ ভাঙ্গিয়া করিছে ধূলিসাৎ,
কত শত রাজপুরী ভূমিসাৎ করে [illegible],
শিলাবৃষ্টি সম ঘন করে গোলাপাত,
বহিছে ভারত-বনে ভীম ঝঞ্ঝাবাত !

(৪)

দিবারাত্রি নাহি ভেদ, হইতেছে রণ,
শুধু শব্দ "মার মার !" স্ত্রী পুরুষ একাকার।
নদ নদী বহে শুধু রক্তের প্লাবন ;
মোগলের জয় রবে কম্পিত গগন !

(৫)

বসিয়া শিবির মাঝে মহারাষ্ট্র-পতি,
বেষ্টিত বীরেন্দ্রদলে, নয়নে কৃশানু জ্বলে,
হৃদয়ে শোণিত বহে বিদ্যুতের গতি,
পাষাণ-চাপনে পড়ে মৃগেন্দ্র যেমতি !

(৬)

অভিমানে বক্রগ্রীবা, কম্পিত অধর,
মুখে মাত্র নাই শব্দ, অনুচর সব স্তব্ধ,
কপালেতে স্বেদধারা বহে দর দর,
উৎপাতের পূর্ব্বে যেন আগ্নেয় ভূধর !

(৭)

ধন্য মহারাষ্ট্রবংশ বীরত্বের খনি !
সেই বংশ-অবতংশ, নৃপকুলে রাজহংস,
দেব অংশে জন্ম, নিজে বীরচূড়ামণি,
শত্রুমুখে শুনিতে কি পারে জয়ধ্বনি ?

(৮)

দশনে দশন চাপি কহে বীরবর,—
"চল মহারাষ্ট্র-বাসি ! মোগল কটক নাশি
শত্রুর শোণিতে চল, করিয়ে সাগর,
চল সবে ভাসি গিয়া তাহার উপর ।

(৯)

দেখ রে চাহিয়া সবে এ কি অলক্ষণ !
কোটি বীরধাত্রী যিনি, সে ভারত অনাথিনী,
মোগল-কলঙ্ক তারে করে আচ্ছাদন,
শূন্যবুকে জন্মভূমি করিছে ক্রন্দন !

(১০)

বীরশূন্য ভারত কি হয়েছে এমন ?
জীবনে যে গত আয়ু ! বহে না কি প্রাণবায়ু ?
এমন ক্ষত্রিয় কি হে নাই একজন,
মোগল-শোণিতে করে পদ-প্রক্ষালন ?

(১১)

ক্ষত্রিয়ের নাম শুনে কাঁপিয়াছে যারা,
তৃণসম সে সকলে দলিয়াছ পদতলে,
ভারতের বক্ষে বসে স্পর্দ্ধা করে তারা !
কোন্ পাপে আর্য্যবংশ বলবীর্য্য-হারা ?

(১২)

সামান্য নরের হাতে দেশের দুর্গতি
কেমনে সহিব বল ? ত্বরা করি চল চল,
"কাপুরুষ শৌর্য্যহীন মহারাষ্ট্র জাতি !"
কেমনে শুনিব বল এ ঘোর অখ্যাতি ?

(১৩)

কোন্ ভয়ে ভীত এত ? কি হেতু মলিন
ঐ যে কাঁদিছে দেশ, নাহি কেন দয়া[illegible] !
কোন্ পাপে মহারাষ্ট্র মনুষ্যত্বহীন ?
উঠ উঠ উঠ ওহে বালক প্রবীণ !

(১৪)

চল চল চল সবে যাই রণস্থলে,
ভারতের জয়রবে, জগত কম্পিত হবে,
"মোগলের নাম লুপ্ত করি ধরাতলে,
সিংহ সম পশি চল মোগলের দলে !"

(১৫)

গর্জ্জিয়া উঠিলা যত ক্ষত্রিয়-সন্তান,
'জয় জয় জয়' রবে চলিলা সমরে সবে,
মহাবল, মহাবুদ্ধি, বীর্য্যের আধান ;
উঠিল হুঙ্কারধ্বনি প্রলয়-সমান !

(১৬)

চতুরঙ্গ দলে সবে রণস্থলে ধায় ;
চিত্ত স্থির নহে কার, মুখে শব্দ "মার মার !"
দারা-পুত্র-বন্ধু-মুখে ফিরে নাহি চায়,
দেশার্থে জীবন যাবে, কোন্ ক্ষতি তায় ?

চোকের দেখা

অনেক দিনের পরে প্রিয়,
সে দিন তোমায় দেখেছি-
নয়ন-জলে বক্ষস্থলে
পদচিহ্ন এঁকেছি।
প্রেম-নয়নে মুখের পানে,
সেই যে তুমি চেয়েছিলে,
কোথা হতে নয়ন-পথে
না জানি কি ঢেলে দিলে,

অবসন্ন হলো দেহ,
স্থির হইল নয়ন-তারা,
আপনি আপনি বলেছিলেম
কি যেন পাগলের পারা ;

আত্মহারা হয়ে গেলেম,
অচল হলো পা দুখানি,
প্রাণের মাঝে কি যে হলো,
প্রাণ জানে, আর আমি জ !

উথলিয়া উঠলো হৃদয়
দেখে তোমার বদন-চাঁদ,
আর খানিকটা হলে পরে
ভেঙ্গে যেত বুকের বাঁধ !

দূরে থেকে চোকের দেখা
দেখেই যদি এমনি হয়,
স্পর্শ হলে কি যে হতো,
ভেবেই আমার হচ্ছে ভয় !

কি আর হতো ? পা দুখানি
যদি তোমার বক্ষে পেতেম,
প্রেমভরে শত খণ্ড
হয়ে না হয় ভেঙ্গে যেতেম ।

মাটির দেহ পড়ে থাকতো,
বেরিয়ে যেতো অমর প্রাণ ;
অমর লোকে গিয়ে আমি
গেতেম তোমার প্রেমের গান ।

নিশীথ-চিন্তা

অতি ঘোর অমানিশা, গভীরা রজনী
নীরবে শিয়রে বসি চিন্তা সহচরী ;
দিক্ দশ একাকার, স্তম্ভিতা মেদিনী,
বসিলাম এ সময়ে শয্যা পরিহরি ।

না বাজে কর্ম্মের ঢোল ভবহাটে আর
নাহি উঠে হাস্য আর ক্রন্দনের ঢেউ ;
সুষুপ্তি জীবের করে শ্রান্তির সংহার,
আমি ভিন্ন বুঝি আর নাহি জাগে কেউ ।

কেন জাগি ? স্বভাবের হেন বিপর্য্যয়
কেন করি ? আমিও তো মানব-সন্তান ;
সহস্র সহস্র নর যেই পথে রয়,
ভ্রান্তি বলে কেন তারে করি অভিমান ?

কে বলে মানুষ এই দেহের অধীন ?
কোথা থাকে দেহ আর কোথায় চেতনা
ভাবের সাগরে মন হইলে বিলীন ?
পাসরি সংসার, আরো পাসরি আপনা ।

চলেছে দক্ষিণ মুখে অচল-নন্দিনী,
তুলিয়া মধুর কিবা কল কল রব,
সাগরসঙ্গম আশে হয়ে পাগলিনী,
প্রস্তর-বিটপি-লতা ভাসাইয়া সব ।

অসংখ্য অসংখ্য জীব ঐ পথে ধায়,
অল্পমাত্র কিন্তু তার হয় অগ্রসর ;
ভ্রমবশে কেহ শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায়,
কেহ বা বসিয়া রচে কল্পনার ঘর !

কিন্তু যারা বহু শ্রমে বহু দূর গত,
অবিরত তাঁহাদের সহাস্য বদন ;
চলেছেন বলীয়ান বিজয়ীর মত,
"মাভৈ ! মাভৈ !" রবে কাঁপায়ে ভুবন !

বিবিধ সঙ্গীত

(১)

(সমাজের নীচতা ও কপটতা লক্ষ্য করিয়া)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

অবাক্ কল্লে জুয়াচোরে ! গেল সোনার বাঙলা ছারে খারে।
ভাল মানুষ হতভাগ্য, খিন্ন হয়ে অন্নে-মরে ;
(আবার) সোনার দরে রাং বিকোচ্ছে কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে।
কেহ ফলায় হিন্দুয়ানি ম্লেচ্ছের অধিক কার্য্য করে ;
(আবার) মাথায় রাখে হজমি টিকি, কেবল ফাঁকি দিবার তরে।
কেহ হলো রাজনীতিজ্ঞ, দুই একটা বক্তৃতা ক'রে ;
(আবার) কেহ হলো দেশের বন্ধু, গালি দিয়ে ইংরেজেরে।

কেহ হলো ভক্ত সাধু অকথ্য ভণ্ডামি করে ;
(ওদের) স্বার্থ বটে পরমার্থ, অর্থ পেলে সকলি করে।
আশ্চর্য্য এক দলাদলি, ক্ষুদ্র সাহিত্যের বাজারে ;
(তাতেই) কেহ হলো কবি-শ্রেষ্ঠ অবিকল তর্জ্জমা করে।
কেহ করে বিদ্যা প্রকাশ দেশ ছেড়ে দেশদেশান্তরে
(আবার) উপাধি হয়েছে ব্যাধি, কত অবিদ্বানের তরে।
কেহ হলো সাহেব সুবো রীতিমত সেলাম করে ;
(আবার) কেহ হলো রাজা নবাব, বড় বড় থানার জোরে !
আসল কথা স্বার্থসিদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি ঘরে ঘরে ;
(যখন) সময় হবে, সব বেরবে, এ সময় ত থাকবে না রে।

(২)

কবির সুর

আজব সহর কলকাতা !
(এ সব) দেখে শুনে এ দুর্দ্দিনে বন্ধু মা তারা, যাই কোথা ?
মিলে যত ভণ্ড ষণ্ড দেশটা করলে লণ্ডভণ্ড ;
ধর্ম্মকর্ম্ম ধোঁকার টাটি, (যত) বদমায়েসির ফাঁদ পাতা !
টিকির নীচে ছাটা দাড়ি, (রূপের বালাই লয়ে মরি !)
মদের মুখে "হরি হরি" ধন্য কলির সভ্যতা !
ছাপার কাগজ যায় না পড়া, সতী, সাধুর নিন্দা ভরা ;
আঁটকুড়ির বেটাদের এমনি বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা !
সভাস্থলে মাতামাতি, ভাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতি ;
জলে মরি, শুনতে নারি ব্যবসাদারী বক্তৃতা।

তুচ্ছ কথায় দলাদলি, তুচ্ছ কথায় গালাগালি ;
"ভারত মাতার" পুত্রগুলির এমনিধারা একতা !
দায় হয়েছে মামলা করা, অপরাধী যায় না ধরা ;
বি এ, এম এ, মিথ্যা সাক্ষী উচ্চশিক্ষার খায় মাথা !
বারাঙ্গনা মদে মত্ত, সেই শোনাচ্ছে ধর্ম্মতত্ত্ব ;
ছেলেপিলের খেলে মাথা, বলিহারি মূর্খতা !
ভাল মানুষ আছে যারা, দেখে শুনে জ্যান্তে মরা,
ডাকলে ভয়ে দেয় না সাড়া, কারে কই দুঃখের কথা !
না জানি কি কপাল দোষে, হতভাগ্য বঙ্গদেশে
পশুর বেশে অসুর সৃষ্টি কল্লে দারুণ বিধাতা !
দেশ হয়েছে আস্ত নরক ! এক দিনেতে এসে মড়ক,
গো-বসন্তে উজোড় করলে, তবে যায় মনের ব্যথা !!

হেলেনা কাব্য

চলিল মানস রথ দেব-মন্ত্র-বলে
মহাবেগে, মহাবাতে অন্তরীক্ষ দলি
ধায় যথা কাদম্বিনী স্বন্ স্বন্ স্বনে !
কত রাজ্য, উপরাজ্য, কান্তার, সাগর,
অরণ্যানী অগণিত রহিল পশ্চাতে ;
স্থাবর জঙ্গম কত নাহি তার লেখা।
সম্মুখে সুন্দর শৈল, শোভে শিরোপরে
তুহিন-স্তবক-রাশি থরে থরে থরে ;

রজত-কিরীট যথা কৌমুদী-প্রবাহে
ঝলসিত, সুরঞ্জিত বিচিত্র বরণে।
কল্পনারে সম্বোধিয়া কহিলা স্বপন,
"সারথি, সম্বর গতি মুহূর্ত্তের তরে
হেথায়।" বসিলা রথ অচল-শেখরে।
কটিতটে উপত্যকা ধরিয়াছে গিরি,
শিরে শুভ্র জটাভার ; গিরিশ যেমন
পরিহিত বাঘাম্বর চিকণ চিত্রিত।
শত শত প্রস্রবণ বহে তার তলে
স্বচ্ছ শুভ্র, কামিনীর কণ্ঠতলে যথা
গজমতি-হার-মালা ; শোভে কূলে কূলে
প্রস্ফুট প্রসূনদল, তারাদল যথা
ছায়াপথে ; ফলভরে হেলিয়াছে তরু
ইতস্ততঃ ; মঞ্জু কুঞ্জে ভ্রমিছে ভ্রমরা ;
নব দূর্ব্বাদল-মাঝে মৃগশিশু সহ
মৃগরাজ করে কেলি মনঃকুতূহলে ;
ময়ূরময়ূরী নাচে তরু তলে তলে ;
উল্লাসে গাইছে শাখে ভৃঙ্গরাজ-প্রিয়া
পঞ্চ স্বরে ; পঞ্চমেতে কোকিল কুহরে!

* * *

সম্মুখে বিষাদময় ত্রিদশ-আলয়,
নিবিড় তিমিরাশ্রয়, বিগতমাধুরী!
অবরুদ্ধ সিংহদ্বার, বাজে না তোরণে
তূরী ভেরী, বীরগাথা অবিরাম আর
উঠে না আকাশে ; এবে নীরব সকলি!

নাচে না নর্ত্তকীবৃন্দ নূপুর-নিক্কণে
ঘরে ঘরে, ইন্দ্রালয়ে নাচয়ে যেমতি
অপ্সরা অম্বর পূরি মধুর সঙ্গীতে !
সুপ্ত নাগরিক সব, কেহ বা কাঁদিছে
হাহাকারে পতি-পুত্র সহোদর-শোকে !
নাহি সে প্রদীপ-মালা নগর যুড়িয়া ;
দুঃখের তামসী ঘোর ! থাকিয়া থাকিয়া
বায়স, পেচক, গৃধ্র গভীর চীৎকারে !
স্বর্ণময় রাজপুরী, সর্ব্ব অঙ্গ এবে
বিষাদ-কালিমা-মাখা; অলক্ষিতে তাহে
অলক্ষী গাইছে গীত করুণার স্বরে।
কাঁদিছে ত্রিদশ-ধাম নীরবে নির্জ্জনে
মাধবের শোকে আহা মধুবন যথা !
অন্ধকার অন্তঃপুর, পশিলেন তাহে
ইন্দুমুখী ; বৃন্দা দূতী পশিলা যেমতি
ব্রজের নিকুঞ্জবনে বিশাখার সহ
মৃতপ্রায় ব্রজধামে শত বর্ষ পরে
মথুরানাথের শোকে ! হায় রে এ পথে
পশিলেন একদিন উদ্বাহ-বাসরে
রাজবধু গীতবাদ্য-প্রমোদ উৎসবে,
পশে যথা মধুমাসে মক্ষিদল সহ
চক্ররাণী নবচক্রে ! বিধি বক্র এবে ;
নাহি সে আনন্দময় গুণ্ গুণ্ ধ্বনি,
সুবিমল পরিমল আকস্মিক ঝড়ে ;
কালের কুটিল গতি এ বিচিত্র ভবে !

কুবের-আলয় জিনি প্রাসাদের পুরী
শোভাময় ; শত সৌধ রতনে শোভিত
অন্তঃপুরে, যেন শত শতদল-শোভা
বিমল সরসী-জলে ! বিগতমাধুরী
এবে সব ; বক্ষে তাহে সহস্র যুবতী
বিধবা, কেশর যথা কুঞ্চিত বিষাদে !

ভারতমঙ্গল

পূর্ব্বাভাস

বিষাদে জাহ্নবী-তীরে কাঙ্গালিনী-বেশে
ভ্রমিছেন বঙ্গলক্ষ্মী, নির্ব্বাসিতা যথা
রঘুকুল-রাজলক্ষ্মী রাঘব-বিরাগে
ত্রেতায় ; পবিত্র মুখে নেত্রবারিধারা
বহিছে, শিশিরধারা সরোরুহে যথা !
সায়ংকৃত্য সাঙ্গ করি, বিষণ্ণ বদনে
বৃক্ষমূলে বসি যবে চাহিলা আকাশে
বঙ্গলক্ষ্মী, অকস্মাৎ ব্যোমবর্ত্ম মাঝে
ছুটিল কিরণ-রেখা, সুধাংশু বিহনে
বিমল-চন্দ্রিমালোক ছাইল গগনে ।
নবজলধর-কান্তি অপূর্ব্বমূরতি
দেবী এক, ছায়ারূপে অন্তরীক্ষে থাকি,
চাহিতে লক্ষ্মীর চক্ষে, বক্ষ মাঝে তাঁর
আশার তরঙ্গমালা উঠিল নাচিয়া,
শান্তি-সমীরণ স্নিগ্ধ বহিল নিশ্বাসে ।

অপূর্ব্ব আনন্দাবেশে হইলা বিবশা
লক্ষ্মী অতি ; দেবী তারে লাগিলা কহিতে,
"শোন বঙ্গে, মম সঙ্গে পূর্ব্বপরিচয়
নাহি তব ; তব তরে সতত আমার
সম স্নেহ, এ জগতে সকলেরি তরে।
ঐশী কৃপা নাম ধরি, এ ব্রহ্মাণ্ড রাখি
বক্ষস্থলে, পক্ষতলে, শাবকে যেমতি
বিহঙ্গ, জনম মম জগতের হিতে ;
অলক্ষিতে রহি সাথে, নাহি দেখে কেহ
আমায়, পতঙ্গ যথা অচঞ্চল বাতে।
পরম সৌভাগ্য তার, বিধির বিধ
যারে আমি দিই দেখা, শুনাই শ্রবণে
সুমঙ্গলবাণী কিম্বা ; সার্থক জীবন
আজি তব, প্রণিপাত কর ভক্তিভরে
বিশ্ববিধাতার পদে ; সম্পদের সখা
বিপদে কাণ্ডারী সদা সিদ্ধিদাতা তিনি।
ঘুচিবে তোমার দুঃখ, সৌভাগ্যের র
উদিবে অচিরে তব অদৃষ্ট-আকাশে।
বিন্ধ্যাচলাশ্রমে তব ভারতজননী
করিলা তপস্যা ঘোর ; ভক্তিমতী তুমি
মাতৃ প্রতি, ধর্ম্মশীলা আপনি সুভগে ;
মাতৃ-তপস্যায় আর তব নিষ্ঠাফলে,
সুশোভিবে তব অঙ্কে দেবের দুর্লভ
রত্ন এক ; বিচিত্র দেবের লীলা সম
করিবে মানবলীলা মানব-মণ্ডলে।

কোটি কোটি পুত্র কন্যা অজ্ঞান-আঁধারে
মগ্ন তব, ভগ্নপদ দাসত্ব-নিগড়ে
রাজশক্তি, ধর্ম্ম আর সমাজ, সকলি
ধরিয়া রাক্ষসবেশ দংশিছে নিয়ত
তোমার সন্তানগণে ; জ্বলন্ত অনলে
দহিছে অবলা বালা ; বিনা অপরাধে
বধিছে দুর্ব্বল শিশু নরবলি-ছলে !
সতীত্ব, সাধুতা, শৌর্য্যবীর্য্য আদি যত
লুপ্ত সব ; অত্যাচার, অবিচার পাপে
অন্ধকার বঙ্গভূমি প্রেতভূমি সম !
জনমিয়া মহাবীর, মহাপরাক্রমে
ঘুচাবে তোমার দুঃখ ; হইবে উজ্জ্বল
শুভগে, তোমার মুখ, ভাগ্যশীলা তুমি।
অবজ্ঞেয় বঙ্গবাসী অবনীতে এবে,
হইবে জগৎপূজ্য শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞানে
একদিন ; শুভদিনে উদ্ধারিবে তারা
পরাক্রমে পুণ্যভূমি জননী ভারতে
করিবে জগৎ জয়, দেবত্ব লভিয়া
বঙ্গবাসী ; জয়নাদে কাঁপিবে মেদিনী।
"প্রচারিয়া সত্যধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি যোগে,
প্রকৃত জীবন দান পতিত মানবে
করিবে সে মহাবীর ; উড়িবে অচিরে
শান্তির পতাকা শুভ্র অবনীমণ্ডলে।

ঘুচিবে নারীর ক্লেশ, অন্ধকার প্রায়
সমাজের ; রাজশক্তি হবে পরিণত
সুপবিত্র [illegible]ভাবে সমগ্র জগতে।

প্রেমানন্দ-কাব্য

দয়াঘন

দয়াঘন, পরকাশো হৃদয়-আকাশে।
হেরি তব মাধুরী, পাপ-সন্তাপ-শোক
পাসরিব তব সহবাসে।

নিদাঘে দারুণ দাহে, তৃষিত তাপিত অতি
চাতকী তো মরে না পিয়াসে ;
তোমার কৃপায় জীব অনন্ত জীবন লভে,
জীবন ধরি হে এই আশে।

সংশয়-তিমিরে প্রভু, চরণ চলে না যবে,
তোমা হতে জ্যোতি পরকাশে ;
তোমার পবিত্র-জ্যোতি পথ দেখাইয়া জীবে
লয়ে যায় অমৃত-নিবাসে।

হেরি তব নব বেশ, অরূপ রূপের ছটা
শিখিসম তনুমন হাসে ;
শান্তিসমীরণ সহ তব বারি বরষণে,
আনন্দ-সাগর-নীরে ভাসে॥

তোমার অমৃতকণা, শত ইন্দ্রধনু-শোভা
বিরচয়ে সাধুর মানসে ;
তোমার শাসন-বাণী, অশনি-নির্ঘোষ,
পাষণ্ড কাঁপয়ে শুনি ত্রাসে।

তোমার করুণা-বারি জীবনসম্বল যার,
যে জন তোমারে ভালবাসে ;
শোক তাপ ঘুচে তার, শত বাধা দুর্নিবার
পার হয় সেই অনায়াসে।

বিরহ-নিদাঘ-জ্বালা বিদূরিত কর প্রভু,
সাজাও প্রকৃতি নব বেশে ;
পুণ্যের প্রসূনরাশি, জীবনকাননে মম
ফুটাইয়া, মাতাও সুবাসে।

অপার করুণাকর, দয়াময় তুমি নাথ,
পূরাও পূরাও অভিলাষে ;
প্রেমানন্দ করযোড়ে মাগে বরাভয় দান,
চরণে রাখহ এই দাসে।

মাতৃরূপ

মা আমার স্নেহময়ি করুণারূপিণি,
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার ?
স্নেহের মুরতিরূপে রয়েছ জননি,
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত অপার !

"মা" কথা মধুর কিবা আরামদায়িনী।
রোগশয্যা'পরে কিম্বা দূর পরবাসে
উদ্দেশে "মা" বলে আমি ডাকি গো যখনি,
শান্তি-সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে।

দয়াময়ী দেবী তুমি, হৃদয়-শোণিতে,
জীবিত রেখেছ মোরে শৈশব-সময়ে;
এমন নিঃস্বার্থ দয়া আছে কি জগতে?
শোধিতে কি পারি ঋণ প্রাণ-বিনিময়ে?

হইলে পীড়িত এই ভঙ্গুর শরীর,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত
রয়েছ মা, ঝরিয়াছে কত অশ্রুনীর
শ্রাবণের ধারা সম হায় অবিরত!

তব স্নেহময় অঙ্কে বসেছি যখন
বাল্যকালে, শত রাজ্য ঠেলিয়াছি পায়;
স্নেহভরে তুমি মা গো চুম্বিলে বদন,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লাভ গণিয়াছি তায়।

বিদ্যাশিক্ষা-হেতু যবে দূর-পরবাসে
পাঠাইলে পরহস্তে করিয়া অর্পণ,
দেহমাত্র ছিল তব আপন আবাসে,
অভাগার সঙ্গে সঙ্গে ছিল প্রাণমন।

বয়োবৃদ্ধি হলো যত ততই জননি,
বুঝিলাম তোমা সম নাই আর কেহ
রোগে শোকে ইহলোকে আরামদায়িনী
এমন মধুর আর নহে কারো স্নেহ।

যেই দিন অভাগার হয়েছে সন্তান,
বুঝিয়াছি স্নেহ তব কত সুগভীর ;
বলিহারি বিধাতার অপূর্ব্ব সন্ধান,
কোরকের বৃন্ত সম প্রাণ জননীর !

মহাবীর কিংবা মহাবিজ্ঞ যদি হই,
ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য আদি ভাগ্যে যদি ঘটে,
থাকিব, থাকিব আমি জানি স্নেহময়ি,
স্নেহের পুতুল সম তোমার নিকটে।

লোকমুখে শুনি মম সুযশের বাণী
করতলে পাও যেন পূর্ণিমার চাঁদ ;
পশিলে শ্রবণে মম নিন্দা কিংবা গ্লানি,
শত শেল বিঁধে হৃদে, ঘটে পরমাদ !

এমন স্নেহের শোধ কে বা দিতে পারে ?
রত্নসিংহাসনে পদ করিয়ে স্থাপন,
দিবানিশি পূজে যদি শত উপচারে,
যোগ্য প্রতিদান সেও নহে কদাচন।

কি বলিব দয়াময়ি জীবনদায়িনি,
শত সুরধুনী সম স্নেহবারি তব ;
অদ্যাপি জীবিত আছ, বহু ভাগ্য মানি,
"মা" ডাক আমার কাছে স্বর্গের বৈভব।

অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গৃহেতে আমার
আছ মা গো, নিত্য রত মঙ্গল-সাধনে ;
পুণ্যতীর্থ-সম ঐ চরণ তোমার,
পরশে পবিত্র করে অধম সন্তানে।

প্রেমময়ী বিশ্বমাতা জগতজননী,
প্রতিনিধি তার তুমি জগতমাঝারে,
নিঃস্বার্থ পবিত্র স্নেহে দিবস-যামিনী
তাঁর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতেছ আমারে।

তব স্নেহে পরিব্যক্ত করুণা তাঁহার,
গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ,
(জ্ঞানহীন অন্ধ আমি, কি বলিব আর ?)
তেমতি তোমাতে মা গো, তাঁহার প্রকাশ

এস মা নিকটে এস, প্রণমি ও পদে
সার্থক মানবজন্ম হোক অভাগার,
তোমারে স্মরিতে মা গো সম্পদে বিপদে
ভগবৎ-ভক্তি যেন উথলে আমার।

সঙ্গীত রচনাতেও আনন্দচন্দ্র সুপটু ছিলেন। 'পথিক' ভণিতায় তাঁহার অনেকগুলি গান আছে। তাঁহার রচিত কতকগুলি গান নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী' ও দুর্গাদাস লাহিড়ী-সঙ্কলিত 'বাঙ্গালীর গান' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এখানে তাঁহার রচিত তিনটি সুপ্রচলিত গান উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি :—

(১)

'কত দিন দহিবে'—সুর।

লুম ঝিঁঝিট—পোস্ত।

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা।
বিষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা।
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতি ;
তথাপি যুবতী হ'য়ে পেটে অন্ন নাই দু বেলা।
বিবাহ কি তাও জানি নে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে, পরের হাতে সঁপে দিয়ে ;
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা।
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা ;
কারে ক'ব এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে ;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা।

(২)

বেহাগ—একতালা।

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।
জয় সত্য-সনাতন, জয় জগত-কারণ ;
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি—জয়।
অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়।
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি-ধামে ;
"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" কি ভয় কি ভয় ?
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ ;
অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয় ॥

(৩)

কাজ নাই আমার গৃহবাসে
আমি সব খোয়ালেম ঘরে বসে।
মাতা আমার মহামায়া, পিতা আছেন নিরুদ্দেশে ;
(ঘরে) কুচিন্তা কুটিলা জায়া, খেটে মরি তারি বশে।
যা হবার তা হয়ে গেছে, শোন্ রে ও মন সর্ব্বনেশে,
এখন বৈরাগ্য-বিভূতি মেখে, গুরু বলে চল্ বিদেশে।
প্রেমানন্দের ভাবনা কি রে, চল্ যাই একবার ভক্তির দেশে ;
যদি প্রেমের ঘাটে ডুবতে পারিস্, মনের মানুষ মিলবে শেষে।